অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

আল্লাহর অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সংলাপ

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত

অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

আল্লাহর অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সংলাপ

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত

সম্পাদনা
ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)
আতিকুর রহমান

শারঈ সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

ইনসাইট জোন
পা ব লি কে শ ন স

অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

ISBN: 978-984-35-7205-9

প্রথম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী ২০২৫
প্রথম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

পরিবেশকঃ সন্দীপন প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

প্রচ্ছদঃ সিলমুন আইটি

Abishwaser Bhanga Dewal; By Sazzatul Mowla Shanto,
Published by Insight Zone Publications.
First Edittion in 2025.

ইনসাইট জোন
পা ব লি কে শ ন স
www.pub.insightzonebd.com
Email: pub@insightzonebd.com
https://www.facebook.com/insightzonepublications

মূল্যঃ ২০০ [দুইশত টাকা মাত্র]

নাস্তিক্যবাদ পরিচিতি

স্রষ্টাবিহীন জীবন

যুক্তিবিদ্যা

মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব

স্রষ্টার অস্তিত্ব

নির্ভরশীলতার যুক্তি

স্রষ্টার প্রকৃতি

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কিছু বিভ্রান্তির নিরসন

স্রষ্টা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদ

অভিমত

মানুষ কেন নাস্তিক হয়? যুক্তির অভাবে? মোটেও না। বরং তার Intentionality'র কারণে। সোজা বাংলায় যেদিকে নিয়ত করে, যার যেদিকে ঝোঁক প্রবণতা, সে সেদিকে যুক্তি খুঁজে পায়। যুক্তি মানে সত্য নয়। বরং যুক্তি হলো সত্যের বাহন। যুক্তি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, যেভাবে গাড়ি আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। যুক্তিকে আপনি যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যুক্তিবিদ্যাতে 'সত্য যুক্তি' কিংবা 'মিথ্যা যুক্তি' বলে কিছু নাই। আছে 'বৈধ যুক্তি' এবং 'অবৈধ যুক্তি'। আপনার মন-মানসিকতা তথা ইনটেনশনালিটি নির্ণয় করবে, কোন ধরনের যুক্তি আপনার ভাল লাগবে কিংবা লাগবে না। সত্য বা সত্যতা আর যুক্তির এই দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যুক্তি খাড়া করি। যুক্তির কাঠামোর নিরিখে সত্যকে 'নির্ণয়' করি। 'নির্ণীত সত্য' হতে পারে আসলেই সত্য, কিংবা কল্পনামাত্র। সত্য থাকে অন্তরালে। তাকে খুঁজে নিতে হয় শক্তিশালী যুক্তি আর সুস্থ মননের সাহায্যে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসের কাজ কী? গাড়ির উদাহরণ দিয়ে বলা যায়। স্টেশনে পৌঁছে আপনি গাড়ি থেকে নেমে গন্তব্যে পৌঁছান। কথার কথা, স্টেশন থেকে নেমে বাসা বা অফিসে পৌঁছানোর অংশটুকু হলো বিশ্বাস। বিশ্বাস আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। You have to believe to live, no matter what you believe.

জ্ঞানবিদ্যার দৃষ্টিতে, জ্ঞান হলো যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস। সকল বিশ্বাসই জ্ঞান নয়। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই বিশ্বাস, তবে তা হতে হবে সত্য ও যাচাইকৃত বা যাচাইযোগ্য। নাস্তিক্যবাদের যারা পক্ষে তারা জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় সত্যতা তথা objectivity 'র পাশাপাশি বিশ্বাস তথা subjectivity যে সমগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে। 'চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে' কথাটা বললাম ভদ্রতার খাতিরে। আমার আশঙ্কা, তাদের একটা বিরাট অংশ সমকালীন জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞানও রাখে না। তারা মানে নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানবাদীরা ধর্মের মতো দর্শনকেও খুব ভয় পায়। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার সূত্রকে মার্ক্সের নামে চালিয়ে দেয়ার মতো তারা জ্ঞানচর্চার নামে জালিয়াতি করে।

নাস্তিক্যবাদী বুজরুকি আপনি সবচেয়ে বেশি দেখবেন নব্য-নাস্তিক্যবাদীদের লেখাজোঁকা ও কর্মকাণ্ডে। যারা শুধু নাস্তিকতাকে সঠিক মনে করে তারা হলেন ক্লাসিক্যাল এথিইস্ট। এথিইস্টদের মধ্যে যার মনে করেন, ধর্মকে উচ্ছেদ করে যে কোনোভাবেই বিজ্ঞানবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারা হলেন নিউ এথিইস্ট। এই নিউ এথিইস্টদের দৌরাত্ম্য খুব বেশি। এরা খুব নায়িভ এবং অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে।

নব্যনাস্তিক্যবাদীদের দৌরাত্ম্য কমানো আর কনফিউজড লোকজনকে আলোর পথে আসার জন্য সহযোগিতা করার জন্য কিছু তরুণ কাজ করছে। চমৎকার সব বই লিখছে। নাস্তিকতাকে খণ্ডন করে বাংলা ভাষায় এত মৌলিক গ্রন্থ আগে ছিল অকল্পনীয়। তরুণ লেখক সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত'র বই 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' আমি পড়েছি। এর মূল কাঠামো শক্তিশালী। যুক্তিগুলো শানিত। যারা সত্যকে খুঁজে নিতে চায় তাদের জন্য এটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। পড়তে পারেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
mozammelhq.com

অভিমত

'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি ধর্ম, যুক্তি এবং অস্তিত্বের দর্শনের উপর একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক কাজ। লেখক সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত তার বইয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও যুক্তিকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়বাদ নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন, যা পাঠকদের গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। বইটি সরল ভাষায় জটিল তাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করে, যা নতুন ও অভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য। যুক্তিবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের যৌক্তিক ভিত্তি নিয়ে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে, সেগুলো গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি বিশেষত পাঠকদের আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সামগ্রিকভাবে, 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' এমন একটি গ্রন্থ যা একাডেমিক এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধান উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

ডা. মাহমুদ হাসান

এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)

সম্পাদকের কলম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অস্তিত্বের উৎস সন্ধানে প্রাচীনকাল হতেই মানুষ চিন্তিত এবং বিস্মিত। জ্ঞান অন্বেষণে মানুষ বহু শতাব্দী ধরেই কাজ করে যাচ্ছে। এর নজির আমরা দেখতে পাই প্রাক সক্রেটিয়ান দার্শনিকদের মাঝে এবং গ্রিক দর্শন চর্চায়। মানব ইতিহাসে ঈশ্বরের ধারণা, দর্শন ও বিজ্ঞান এক গভীর এবং চিরন্তন আলোচনার বিষয়। যুগে যুগে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যুক্তি খুঁজেছে, এবং তার পরিধি ও প্রভাব নিয়ে তর্ক করেছে। সেই আদি যুগ থেকেই মানব মনের কিছু মৌলিক প্রশ্ন বিদ্যমান। যেমন, জগৎ আসলে কী? কোথেকে এলো? সবই কি কেবল শূন্য থেকেই এসেছে? 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' গ্রন্থটি সেই চিরন্তন আলোচনার একটি অনন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করার প্রয়াস।

বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার নিদারুণ মিশেলে প্রতিটি অধ্যায় পরিণত হয়েছে বিস্তীর্ণ এক জ্ঞানভাণ্ডারে। যা পাঠককে নিয়ে যাবে ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের আলোচনার গভীরতায়। জগৎ কি অসীম? ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁর 'প্রকৃত' গুণ, ধর্মের ভিত্তিতে কোনটি সঠিক এই সকল উত্তরের জন্য এক গভীর জ্ঞানের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন লেখক, সত্যতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যুক্তি এবং বিশ্লেষণের আলোকে। প্রমাণ করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সন্ধান দিয়েছেন প্রকৃত ঈশ্বরের। এই বই শুধু জ্ঞানপিপাসুদের জন্য নয়; এটি তাদের জন্যও, যারা নিজেকে জানার, সত্যের সন্ধান করার, এবং জগতের উর্ধ্বে এক অসীম সত্তাকে জানার চেষ্টায় লিপ্ত।

দর্শনের অনুরাগী এবং উন্মুক্ত গবেষক হিসেবে, আমি লেখকের বইটিতে নিত্যনতুন পরিভাষার বাইরে গিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। সম্মানিত পাঠকগণ উক্ত বইটি থেকে গভীর কিছু পরিভাষা এবং বিষয়ের সাথে পরিচিত হবেন, এবং অস্তিত্বের উৎসের হাজার বছরের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর লাভ করবেন কোনো সন্দেহ ছাড়াই।

একজন সম্পাদক হিসেবে, আমার দায়িত্ব ছিল লেখাগুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা এবং পাঠকের কাছে বিষয়গুলোকে সহজ কিন্তু গভীরতায় সমৃদ্ধ করে তোলা। আল্লাহর রহমতে, সর্বাত্মক চেষ্টায় বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ লেখকের প্রতি, যিনি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দান করুক।

আশা করছি, পাঠকগণ এই বইটি থেকে নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস বা সংশয়ের জায়গা থেকে নতুন আলোচনার জন্ম দেবেন। আমি লেখকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি এবং এটিও আশা করছি তাঁর পরিশ্রমের এই বইটি পাঠকদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং ভবিষ্যতের গবেষণায় বিস্তর প্রভাব ফেলবে, ইনশা আল্লাহ।

আতিকুর রহমান (আসিফ মেহেদি)
Independent Researcher
https://orcid.org/0009-0008-8408-880

সম্পাদকের কলম

নাস্তিক্যবাদ একটি দার্শনিক ও মতাদর্শগত ধারা, যা সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এটি মূলত বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বস্তুবাদ, এবং কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার কারণে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। নাস্তিক্যবাদীরা দাবি করে যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই এবং মহাবিশ্ব ও জীবনের উৎপত্তি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

তবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। মহাবিশ্বের সূচনা, নৈতিকতার ভিত্তি, এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাস্তিক্যবাদের জবাব প্রায়ই অসম্পূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ। অন্যদিকে, দর্শন এবং যুক্তি দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা মানব ইতিহাসে বহু প্রাচীন। এটি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানেও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক দর্শনে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহিদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত'র 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। বইতে নাস্তিক্যবাদের পক্ষের যুক্তিগুলোকে পালটা যুক্তি ও রেফারেন্সের আলোকে রীতিমতো ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাস্তিকতার ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাগুলো উপস্থাপন, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয়, ও এই বিষয়ে বেশকিছু প্রশ্নের সুরাহা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে নাস্তিক্যবাদ বিষয়ক অনেকগুলো পুস্তক লিখা হয়েছে। তবে 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বাকি সবগুলো থেকে ব্যতিক্রম এই কারণে যে এখানে বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের গভীর থেকে গভীরতম আলোচনা বেশ সহজ ও সাবলীল ভাষায় করে সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন লেখক। বইটি, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিদের অবিশ্বাসের অন্ধকার জগৎ থেকে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে যাবে বলে আশাকরি, ইনশাআল্লাহ। বিশ্বাসীদের যুক্তির মলাটে আরেকটি অনবদ্য সংযোজন হয়ে উঠুক 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল'।

নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য ওহী-ই একমাত্র দলিল। তবে দর্শন একটি মাধ্যম হতে পারে যারা দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন তাদের জন্য। তবে সর্বসাধারণের জন্য ওহী-ই একমাত্র প্রমাণ। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক পন্থা আলোচনা করব, যেগুলো নাস্তিক্যবাদের যুক্তি মোকাবিলা করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. কারণ ও কার্য তত্ত্ব (Cosmological Argument)

নাস্তিক্যবাদ সাধারণত দাবি করে যে মহাবিশ্ব কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। তবে কারণ ও কার্য তত্ত্ব অনুযায়ী:

- প্রতিটি ঘটনাই কোনো কারণের ফল।
- মহাবিশ্ব যদি একটি ঘটনা হয়, তবে এরও একটি কারণ থাকা উচিত।
- এই কারণটি মহাবিশ্বের বাইরে এবং নিজে অকারণ হতে হবে। এই সত্তাই ঈশ্বর।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

কুরআন বলেছে, "তারা কি সৃষ্টি হয়েছে কোনো কারণ ছাড়া, নাকি তারা নিজেরাই

সৃষ্টি করেছে?" (সূরা আত-তূর: ৩৫)।

২. নকশা তত্ত্ব (Teleological Argument)

মহাবিশ্বের অসাধারণ জটিলতা ও নকশা বোঝায় যে এটি একটি বুদ্ধিমত্তার ফল। উদাহরণস্বরূপ: মহাবিশ্বের সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতা (fine-tuning)। মানুষের চোখের জটিল গঠন। ডিএনএ-র অবিশ্বাস্য কোডিং সিস্টেম। এসবই প্রমাণ করে যে এটি কাকতালীয় হতে পারে না।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই সেই সত্তা, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা সাজদাহ: ৭)

৩. নৈতিক তত্ত্ব (Moral Argument)

নাস্তিক্যবাদে সাধারণত নৈতিকতার কোনো সর্বজনীন ভিত্তি থাকে না। যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে 'ভাল' বা 'খারাপ' কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? নৈতিকতার অস্তিত্বই বোঝায় যে একটি চূড়ান্ত নৈতিক সত্তা (ঈশ্বর) আছেন।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণঃ

"তিনিই তোমাদের মধ্যে কারা উত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা মুলক: ২)

৪. সুবুদ্ধি তত্ত্ব (Argument from Reason)

নাস্তিক্যবাদ যদি সত্য হয় এবং মানুষ শুধু মাত্র একগুচ্ছ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল হয়, তবে আমাদের যুক্তি ও চিন্তা প্রক্রিয়া কেন বিশ্বাসযোগ্য হবে? ঈশ্বর বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তি নিশ্চিত করে। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা কি চিন্তা করে না?" (সূরা আর-রূম: ৮)

৫. ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical Argument)

ইতিহাসে বহু নবী ও পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ও শিক্ষা এই দাবির শক্তিশালী প্রমাণ নাস্তিক্যবাদের যুক্তি খণ্ডনে দর্শনের বিভিন্ন শাখা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শুধু যুক্তি দিয়েই নয়, তাওহিদের (ঈশ্বরের একত্ব) গভীরতা হৃদয়ে গ্রহণ করাই প্রকৃত সমাধান।

ব্রাদার রাহুল হোসেন [রুহুল আমিন]
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ, লেখক ও আলোচক
ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ

শারঈ সম্পাদকের কলম

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ। শান্ত ভাইয়ের 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি পুরো পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। অকপটে বলি, বাংলাভাষায় এমন গভীর, সুসজ্জিত ও মনোমুগ্ধকর বই আমি এর আগে পড়িনি। যারা দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তাদের জন্য এ বইটি এক অনন্য রত্ন, যা চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং জ্ঞানের পথকে আলোকিত করবে। আশা করি, এই বইটি আমাদের জন্য উপকারী হবে এবং জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, কাজেই বইটিতে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি যাতে কোনো ত্রুটি থেকে না যায়। যদি আপনার নজরে কোনো ভুল আসে, তবে তা জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। পরিশেষে, এই প্রার্থনা করি–আল্লাহ শান্ত ভাইয়ের এই সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই মহৎ কাজে যুক্ত সকলের নাজাতের কারণ করে দিন। আমিন!

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

আলিম । সম্পাদক । শিক্ষক

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হলো 'নাস্তিক্যবাদ'। আমাদের দেশে এই শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের সূত্র ধরে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র; 'নাস্তিক্যবাদ' কিংবা 'শাহবাগ'–এই শব্দগুলো আমার কাছে একেবারেই অচেনা ছিল। তবে ২০১৮ সালের দিকে, ফেসবুকের মাধ্যমে নাস্তিকদের কিছু গ্রুপে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে। সেখানে আমি প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করি, এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং মানবজাতির মুক্তির দূত, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে নাস্তিকদের অবমাননাকর বক্তব্য ও কটূক্তি।

সেই সময় থেকেই আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে–নাস্তিক্যবাদ কী, তা জানার। এমন কী মতবাদ এটি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবমাননা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি নাস্তিক্যবাদ নিয়ে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। নানা ধরনের বই, ব্লগ এবং ভিডিও ঘেঁটে তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

অধ্যয়নের করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের নাস্তিকরা মূলত অপবিজ্ঞান এবং মানবীয় বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। তারা বিজ্ঞানের মায়াজালে এমনভাবে আটকে যায় যেন বিজ্ঞানই স্রষ্টার বিকল্প! তাদের বক্তব্যের মধ্যে একধরনের অদ্ভুত ফ্যান্টাসি লক্ষ্য করেছি, যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মকে মুছে ফেলা। অথচ ধর্ম, স্রষ্টার অস্তিত্ব, আত্মা, নৈতিকতা–এসব প্রশ্ন বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও তারা বিজ্ঞান দিয়ে এসবের সমাধান দিতে চায়। বিষয়টি যেন সাহিত্যের স্বাদ খুঁজতে গণিত বইয়ের পাতা উল্টানোর মতো!

দুঃখজনকভাবে, বঙ্গীয় নাস্তিকদের মধ্যে দর্শনের গভীরতা কিংবা সততার অভাব প্রবল। দর্শন এবং বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা ও অজ্ঞতাই যেন তাদের মূল হাতিয়ার। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদেরই প্রিয় দর্শন এবং বিজ্ঞান দিয়েই নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাগুলো সহজে উন্মোচন করা সম্ভব।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে কেউ তাদের চিন্তা ও আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নাস্তিকরা ধর্মবিদ্বেষী প্রচুর কনটেন্ট তৈরি এবং প্রচার করতে থাকে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণ-তরুণী, যারা ধর্ম সম্পর্কে তেমন পড়াশোনা করেনি তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ব্লগ, ইউটিউব ও ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলোতে তারা ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, মুসলিম তরুণদের হৃদয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষাক্ত বীজ বপন করা হয়েছে। এমনকি ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের সন্তানরাও আজ ধর্মদ্রোহিতার পথে পা বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে, নাস্তিক্যবাদের বিষবাষ্প প্রতিরোধ করার জন্য, নাস্তিকতার অন্ধকার কূপে আলোর মশাল জ্বালাতে, অনেক দ্বীনি ভাই এগিয়ে আসেন। ব্লগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিকদের মিথ্যাচারের জবাব দিতে শুরু করেন। তবে নাস্তিকতার প্রচারণা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী কলম। এমন কলম, যা মুসলিম তরুণ-তরুণীদের অন্তরে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে সক্ষম। সে কলম রচনা করবে বিশ্বাসীর প্রাণের সুর। আর সেই সুর তৈরি করা দু-একজনের পক্ষে হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা ভিত্তি, অসংলগ্নতা এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলো উন্মোচন করার জন্য আমিও লিখালিখি শুরু করি। একপর্যায়ে, সেই চিন্তাগুলোকে সুসংহত আকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। তারই ফলস্বরূপ রচিত হয়েছে 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি। এতে আমি নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি, অসংলগ্নতা এবং অপবিজ্ঞানের দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সবশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমার মতো নগণ্য একজন মানুষকে দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করিয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই, ব্রাদার রাহুল ভাই, আতিকুর রহমান ভাই, এবং 'ইনসাইট জোন' টিমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সদস্যকে, যাঁরা পরামর্শ, তথ্য ও সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

মানবীয় কাজে ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। তাই পাঠকবৃন্দের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে–যদি বইটিতে কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি খুঁজে পান, দয়া করে সরাসরি আমাকে অথবা প্রকাশনীকে জানাবেন। আর যদি বইটি উপকারী বলে মনে করেন, তবে নিজে পড়ুন এবং অন্যদেরও পড়তে উৎসাহিত করুন। আশা করি, 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি নাস্তিকতার অন্ধকার গলিতে নিমজ্জিত তরুণদের অন্তরের অনুর্বর মাটিতে ঈমানের সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত
https://www.facebook.com/sazzatulmowla/
sazzatulmowla@gmail.com

অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

নাস্তিকতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

নাস্তিক্যবাদ এমন এক দর্শন, যা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এ মতবাদ অনুযায়ী, জড় জগৎই একমাত্র বাস্তবতা; এর আড়ালে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্ব কেবল জড় ও জড় শক্তির খেলামাত্র, এবং এতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এ মতবাদ দাবি করে, এ জগৎ যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় এবং এর পরিচালনার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রয়োজন নেই।

Stanford Encyclopedia of Philosophy এর মতে, নাস্তিকতা হল একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, বিশেষত একজন নাস্তিক হওয়ার অবস্থা হলো, যেখানে একজন নাস্তিককে এমন একজন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যে আস্তিক নয় (একজন আস্তিককে এমন একজন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে) এটা নিম্নলিখিত এই সংজ্ঞা তৈরি করে, নাস্তিকতা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এমন বিশ্বাসের অভাবের মানসিক অবস্থা।[১]

Merriam Webster dictionary এর মতে, নাস্তিকতা হলো বিশ্বাসের অভাব বা দেবতা বা কোনো দেবতার অস্তিত্বে দৃঢ় অবিশ্বাস / স্রষ্টা বা দেবতারদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব অথবা দৃঢ় অবিশ্বাস।[২]

Cambridge dictionary মতে, নাস্তিকতা হচ্ছে স্রষ্টা বা দেবতার প্রতি অবিশ্বাসের ঘটনা, বা কোনো স্রষ্টা বা দেবতা নেই এমন বিশ্বাস।[৩]

মোনাস ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক ও অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন অফ ফিলোসফির সিইও গ্রাহাম ওপি তার লিখিত *'ATHEISM AND AGNOSTICISM'* বইতে নাস্তিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,"যে বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে নাস্তিক এবং আজ্ঞেয়বাদী করে তোলে - তাদের (নাস্তিকদের) কোনো স্রষ্টা নেই এমন দাবির প্রতি মনোভাব। নাস্তিকরা বিশ্বাস করে তাদের কোনো স্রষ্টা নেই। তাই উপযুক্ত পরিস্থিতিতে নাস্তিকরা নিশ্চিত করে যে তাদের কোনো স্রষ্টা নেই।"[৪]

বিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্স তার লিখিত 'The God Delusion' গ্রন্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে বলেন, "দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অর্থে নাস্তিক হলো এমন কেউ, যে বিশ্বাস করে প্রকৃতি, ভৌত জগৎ, পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের পিছনে কোনো অতি- প্রাকৃতিক সৃজনশীল বুদ্ধিমান সত্তা লুকিয়ে নেই যিনি চুপিসারে অবস্থান করছেন। কোনো আত্মা নেই যেটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, নেই কোনো অলৌকিক কিছু। আছে কেবল জাগতিক ঘটনাবলি, যা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি।"[৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নাস্তিকতার মূল অর্থ হলো কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা অথবা সেই অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করা। কিন্তু প্রশ্ন

---

[১] Atheism and Agnosticism (stanford.edu)
[২] Atheism Definition & Meaning - Merriam-Webster
[৩] ATHEISM | meaning, definition in Cambridge English Dictionary
[৪] Graham Oppy; ATHEISM AND AGNOSTICISM; Page; 4-5 (Cambridge University Press)
[৫] Richard Dawkins; The God Delusion; P-14

থেকে যায়, এই অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতির পেছনে কি তাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট যুক্তি বা অকাট্য প্রমাণ রয়েছে? নাকি তারা কেবল অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে এক প্রকারের অন্ধ অস্বীকৃতিতে অনুরক্ত?

নাস্তিকদের প্রতি একটি ন্যায্য প্রত্যাশা হলো–তাদের দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করা। কারণ, কোনো সত্তা বা ধারণাকে অস্বীকার করার দাবি কেবল মাত্র অনুভূতির ভিত্তিতে স্থির থাকলে তা যুক্তির জগতে স্থায়ী অবস্থান তৈরি করতে পারে না। অন্যদিকে, যদি তারা দাবি করে যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আস্তিকদের উপস্থাপিত যুক্তি তাদের কাছে বোধগম্য নয়, বা আস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তবে এ অবস্থানকে আর নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বরং এটি 'সংশয়বাদী' অবস্থান, যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মনে এক ধরনের দ্বিধা বা সংশয় বিরাজ করে।

এই সংশয়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে একধরনের অপেক্ষাকৃত নমনীয় অবস্থানে রয়েছেন। কারণ, যদি তাদের সামনে এমন অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা যায়, যা তাদের যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়, তবে তারা স্রষ্টা বা অতিপ্রাকৃতিক কোনো সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতেও প্রস্তুত হতে পারেন। তাই, এ অবস্থানকে নাস্তিক্যবাদ থেকে পৃথক একটি অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত।

কেউ কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেনি বলে সেটির অস্তিত্ব নেই ধরে নেওয়া, কিংবা কেউ কোনো কিছুর অস্তিত্ব ভুল প্রমাণ করতে পারেনি বলে সেটি সত্য বলে ধরে নেওয়া–এ দুটি অবস্থানই এক ধরনের যৌক্তিক ভ্রান্তি। যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় একে বলা হয় Argument from ignorance বা অজ্ঞতাজনিত কুযুক্তি। এই ধরনের কুযুক্তি তখনই ঘটে যখন একটি ধারণা বা প্রস্তাবকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় কেবল এ কারণে যে, সেটি এখনও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি; অথবা, সেটিকে মিথ্যা বলে মেনে নেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, সেটি এখনও সত্য প্রমাণিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বলতে পারে, 'ক' মিথ্যা, কারণ এর সত্যতার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আবার কেউ বলতে পারে, 'ক' সত্য, কারণ একে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়নি। উভয় বক্তব্যেই যুক্তির অভাব স্পষ্ট। কারণ, প্রমাণের অভাব কোনো বিষয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা বা সত্য প্রমাণ করে না।

এই কুযুক্তি আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পেতে পারে। আস্তিকরা বলতে পারেন, স্রষ্টার অস্তিত্ব মিথ্যা নয়, কারণ আজ পর্যন্ত কেউ সেটি ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেনি। অপরদিকে, নাস্তিকরা যুক্তি দিতে পারেন, স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্য নয়, কারণ এখনও কেউ সেটি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেনি। উভয় পক্ষের এই অবস্থানই যুক্তির মানদণ্ডে ত্রুটিপূর্ণ এবং আদর্শিক তর্কে অগ্রহণযোগ্য। কারণ, কোনো দাবির সত্যতা বা মিথ্যাতা নির্ণয়ের জন্য প্রমাণের অভাব যথেষ্ট নয়। যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও তর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করতে হলে অবশ্যই একটি ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে যথাযথ প্রমাণ এবং নির্ভুল যুক্তি উপস্থাপন করা আবশ্যক। প্রমাণের অনুপস্থিতি কোনো বিষয়কে চূড়ান্তভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সুতরাং, যুক্তির জগতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রমাণ এবং বিশ্লেষণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

অর্থাৎ, যদি কোনো আস্তিক এই যুক্তি দেন যে, যেহেতু নাস্তিকরা প্রমাণ করতে পারেনি যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, অথবা যদি কোনো নাস্তিক বলেন, যেহেতু আস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেনি, তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, তবে উভয়ই এক ধরনের অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করছেন। যদি আস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো উপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে, কিংবা কোনো যুক্তি-প্রমাণই উপস্থাপন করতে না পারে, তবে স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকার করা এক প্রকার অজ্ঞতামূলক ভুল ধারণা হবে। অন্যদিকে, যদি নাস্তিকরা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তবে তা অন্ধবিশ্বাসেরই একটি রূপ। সুতরাং, যুক্তি এবং প্রমাণ ছাড়া কোনো মতামত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, এবং এটি তর্কের মূল কাঠামো ও দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

কিছু নাস্তিক হয়ত যুক্তি দিতে পারেন যে, তারা 'প্রমাণের অভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করেন'। তাদের মতে, আস্তিকরা যখন স্রষ্টার অস্তিত্বের দাবি করেন, তখন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের দায়িত্ব (Burden of proof) আস্তিকদের উপর। প্রমাণের বোঝা কার উপর তা নিয়ে 'স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কিছু বিভ্রান্তির নিরসন' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে, 'প্রমাণের অভাবে অবিশ্বাস'–এই ধারণাটির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এটি একধরনের যুক্তিহীন অবস্থান। কারণ, নাস্তিকতার ক্ষেত্রে, যদি কোনো নাস্তিক দাবি করেন, তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষের দাবিকে কেবল প্রমাণের অভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এই দাবিটিতে একজন নাস্তিক স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষের দাবিকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে কেবল মাত্র প্রমাণের অভাবে। তবে এটি যুক্তির ভুল প্রয়োগ। কারণ, কোনো কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আমাদের প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক নয়। যা কিছু অস্তিত্বশীল, তার স্বপক্ষে আমরা প্রমাণ না পেলেও তা অস্তিত্বশীলই থাকবে। বিষয়টি এমন নয় যে আমরা প্রমাণ পেলাম তার অমনি করে কোন কিছু অস্তিত্বে চলে এসেছে। আমরা কোন কিছুর প্রমাণ পাওয়ার জন্য হলেও প্রমাণিত হওয়ার আগেই তাকে অস্তিত্বশীল হতে হবে। কাজেই, প্রমাণের অভাবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করা অজ্ঞতা ভ্রান্তি যুক্তির শামিল। সত্যের অনুসন্ধানে প্রমাণের অভাব কখনোই কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না।

এছাড়া, 'প্রমাণের অভাবে অবিশ্বাস বা অস্বীকার' কথাটির ব্যাখ্যা হলো, প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে তারা পরিপূর্ণ অবগত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু যেহেতু মহাবিশ্বের মাত্র ৪/৫ শতাংশ বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা সম্ভব, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রমাণের বিশদ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা মানুষের জন্য একরকম অসম্ভব কাজ। যখন কেউ 'প্রমাণের অভাবে অবিশ্বাস বা অস্বীকার' করে, তখন সে অদৃশ্যভাবে দাবি করে যে, 'প্রমাণের অভাব রয়েছে'। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দাবি করে যে তাদের একটি পোষা বিড়াল আছে কিন্তু এই দাবিকে সমর্থন করার জন্য কোনো প্রমাণ তারা প্রদান করেনি। তাই আপনি উত্তর দিয়েছেন যে, "প্রমাণের অভাবে আমি আপনার দাবিকে (তাদের একটি পোষা বিড়াল আছে) প্রত্যাখ্যান করি"। এখানে আপনি দাবি করছেন যে পোষা বিড়ালের অস্তিত্বের 'প্রমাণের অপ্রতুলতা বা অভাব' রয়েছে। যদি কেউ বলে যে তাদের একটি পোষা বিড়াল রয়েছে, কিন্তু সেই দাবির সমর্থনে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেনি, তখন আপনি সেই দাবিটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করতে

পারেন। তবে, আপনি যদি এই দাবির পক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রমাণের উপস্থাপন ও পর্যালোচনা না করেন এবং শুধু প্রমাণের অভাবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে বিড়ালের অস্তিত্ব নেই, তাহলে সেটা একটি শুদ্ধ যুক্তির ভিত্তিতে আসে না।

প্রমাণের অপ্রতুলতা বলতে বোঝানো হয় যে, আপনি সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থা বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে 'প্রমাণের অপ্রতুলতা' আছে। তাই আপনার উচিত কোন কোন সম্ভাব্য প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আপনি এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পোষা বিড়ালের অস্তিত্ব নেই, তা ব্যাখ্যা করা। আপনার উচিত এই 'প্রমাণের অপ্রতুলতা' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা, যেমন কী ধরনের প্রমাণের অভাব রয়েছে, কোথায় কোথায় আপনি প্রমাণ খুঁজেছেন, এবং কেন আপনি নিশ্চিত হয়েছেন যে বিড়ালটির অস্তিত্ব নেই। যদি আপনি এমনটি না করেন, তাহলে 'প্রমাণের অপ্রতুলতা'-এর ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এক ধরনের যৌক্তিক ত্রুটি সৃষ্টি করে। কোনো কিছু সম্পর্কে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করার জন্য 'প্রমাণের অপ্রতুলতা' একমাত্র ভিত্তি গ্রহণ করা যথার্থ নয়।

একইভাবে, নাস্তিকরা যখন বলে 'আমরা প্রমাণের অভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করি' তখন তাদের কর্তব্য হবে, সম্ভাব্য সব ধরনের প্রমাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা। ধরুন, ইয়ামিন নামের এক ভদ্রলোক বললেন, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যে যুক্তি আস্তিকরা উপস্থাপন করে, তা আমার কাছে বোধগম্য মনে হয়নি"। এর মানে, যদি আপনি ইয়ামিনকে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আরও সুস্পষ্ট যুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে সম্ভবত তিনি তা গ্রহণ করবেন। এখানে, ইয়ামিন স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো নিশ্চিত অবস্থান গ্রহণ করেননি। সুতরাং, তাকে নাস্তিক বলা যাবে না, বরং তার অবস্থা সংশয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অন্যদিকে, এলেক্স নামের এক ভদ্রলোক বললেন, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আস্তিকরা যে দাবি করেন, তা আমি অস্বীকার করেছি, কারণ আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাইনি"। কিন্তু এই অস্বীকারের পর, মিস্টার এলেক্সের অবস্থান কী হবে? তিনি কি মনে করেন যে, যদি তাকে আরও ভালো কোন যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হয়, তবে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন? নাকি তার অবস্থান হলো, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণগুলো আমি অস্বীকার করলাম এবং এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে স্রষ্টা বা অতিপ্রাকৃতিক সত্তা আসলে অস্তিত্বহীন?

মিস্টার এলেক্সের অবস্থান যদি দ্বিতীয়টি হয়ে থাকে, তাহলে তার অবস্থান সত্যিই নাস্তিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে, তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে, কোন যুক্তি বা প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বলতে আদতে কিছু নেই"। তাকে বিশদ বিশ্লেষণ করতে হবে, কোন ধরনের প্রমাণের অভাবের কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, 'স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই'।

একজন যৌক্তিক মানুষ মাত্রই মিস্টার এলেক্সের কাছে জানতে চাওয়া উচিত স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কি প্রমাণ তার কাছে রয়েছে! যদি তার কাছে কোনো যুক্তি প্রমাণ থাকে তাহলে তা শুনা উচিত এবং তার দেওয়া যুক্তিতে যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে তাহলে তাকে সে বিষয়ে অবগত করা প্রয়োজন এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের যুক্তিগুলো তার কাছে মেলে ধরতে হবে।

কিছু নাস্তিক তাদের অবস্থানকে সমর্থন করতে যুক্তি দেয়, "আমরা স্রষ্টাকে স্বচক্ষে দেখিনি, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না।" তবে, এই দাবিটি আসলে একটি অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তি। ইতোমধ্যে এই ভ্রান্তি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আসলে, আমাদের দেখার উপরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না, এবং আমাদের সমস্ত জ্ঞান কেবল মাত্র দেখার উপর ভিত্তি করে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে, আপনার পূর্ব পুরুষদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু, আপনি কি কখনো তাদের স্বচক্ষে দেখেছেন? তবুও কেন আপনি তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? কারণ, আপনার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, আপনার পূর্ব পুরুষদের অস্তিত্ব ছিল। যদি তারা না থাকতেন, তবে আপনিও অস্তিত্বে আসতেন না। এটি বুঝতে আমাদের স্বচক্ষে দেখা প্রয়োজন হয় না। সাধারণ যুক্তি ও বোধবুদ্ধি থেকেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি।

একইভাবে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এই মহাবিশ্ব এবং এর অন্তর্গত সব কিছুর অস্তিত্বের জন্য শুরু রয়েছে। আর অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার জন্য একটি কারণ (Cause) থাকা আবশ্যক। আমাদের সাধারণ বোধ-বিবেচনা, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বলে যে, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনেও একটি কারণ (Cause) রয়েছে। সুতরাং, "আমরা স্রষ্টাকে স্বচক্ষে দেখিনি, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না"–এই দাবি কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। বরং এটি একটি অপরিপক্ব এবং অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য।

কিছু নাস্তিক নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করতে যুক্তি দেয় যে, ধর্মগ্রন্থগুলোতে ভুল তথ্য, সাংঘর্ষিক বক্তব্য, কিংবা অবৈজ্ঞানিক ধারণা রয়েছে। কিন্তু এই যুক্তি মূলত একটি ফলস ডাইকোটমি ফ্যালাসি (False Dichotomy Fallacy)। এই কুযুক্তি তখনই ঘটে যখন কোনো পরিস্থিতিকে কেবল দুটি বিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়, আর তৃতীয় কোনো সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'হয় তুমি ভালো ছাত্র, নইলে তুমি ব্যর্থ।' এখানে পূর্ব অনুমান করা হয়েছে যে একজন ছাত্র হয় ভালো হবে, নতুবা ব্যর্থ হবে। অথচ বাস্তবে, একজন ছাত্র ভালো না হলেও সফল হতে পারে। সুতরাং, এই ধারণাটি একটি কুযুক্তি।

একইভাবে, 'ধর্মগ্রন্থগুলো ভুল, তাই নাস্তিকতা সঠিক'–এই দাবিটিও একটি ফলস ডাইকোটমি ফ্যালাসি। এতে ধরে নেওয়া হয় যে, ধর্মগ্রন্থ ভুল প্রমাণিত হলে নাস্তিকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক হয়ে যাবে। অথচ, এমনটা মোটেই নয়। ধর্মগ্রন্থের সঠিকতা বা ভুল নিয়ে আলোচনা করলেও তা থেকে নাস্তিকতার সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ হয় না। নাস্তিকতাকে সঠিক প্রমাণ করতে হলে স্বতন্ত্রভাবে এই দাবির স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। তাই 'ধর্মগ্রন্থ ভুল, তাই নাস্তিকতা সঠিক' –এই অবস্থান যুক্তির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং এমন কুযুক্তির মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা গ্রহণযোগ্য নয়।

কোনো মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার নিজস্ব শক্তিশালী যুক্তি প্রয়োজন; বিপরীত মতবাদের ভুল হওয়া কখনো তার সঠিকতার মানদণ্ড নিহিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষক ক্লাসের দশজন ছাত্রকে একটি অঙ্ক করতে দিলেন। প্রথম পাঁচজনের অঙ্ক ভুল হলো। এখন, প্রথম পাঁচজনের অঙ্ক ভুল হওয়া কি বাকি পাঁচজনের অঙ্ক সঠিক হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায়? একেবারেই

না। আমাদের সাধারণ বোধ-বিবেচনা বলে, বাকি পাঁচজনের অঙ্ক সঠিক হবে কি-না তা নির্ভর করে তারা সঠিক নিয়মে অঙ্ক করেছে কি-না তার উপর।

একইভাবে, নাস্তিকদের উচিত তাদের অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য এমন যুক্তি উপস্থাপন করা, যা সরাসরি নাস্তিকতার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে। কোনো ধর্ম বা মতবাদের ত্রুটি দেখিয়ে নাস্তিকতার সত্যতা দাবি করা একটি নন সিক্যুইটার ফ্যালাসিও বটে (non sequitur fallacy)।

নন সিক্যুইটার ফ্যালাসি তখনই ঘটে, যখন উপস্থাপিত প্রেমিস ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো যুক্তিসংগত সম্পর্ক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আমি নতুন জুতা কিনেছি, তাই আমি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করব। এটি একটি নন সিক্যুইটার ফ্যালাসি। কারণ, পরিক্ষায় ভালো ফলাফল করার সাথে নতুন জুতা কেনার কোনো সম্পর্ক নেই। নিচের যুক্তিটি লক্ষ্য করুন,

- যদি ধর্মগ্রন্থ ভুল হয় তবে নাস্তিকতা সত্য হবে।
- ধর্মগ্রন্থ ভুল।
- তাই নাস্তিকতা সঠিক।

এখানে উপস্থাপিত প্রেমিস ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো যুক্তিসংগত সম্পর্ক নেই। কারণ, কোনো ধর্মের ভুল প্রমাণিত হওয়া মানেই নাস্তিকতার সঠিকতা নিশ্চিত করে না। নাস্তিকতাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, এমন স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী যুক্তি দিতে হবে যা সরাসরি নাস্তিকতাকে সমর্থন করে এবং তার বৈধতা প্রমাণ করে। অন্য কোনো মতবাদের ত্রুটি দেখিয়ে নাস্তিকতার সঠিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায়, নাস্তিক্যবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তবে, এ পর্যন্ত নাস্তিক্যবাদ তার এ অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য যথাযথ এবং নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের পেশ করা যুক্তিগুলোর মধ্যে যেমন, ' 'স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পায়নি,' বা 'ধর্মগ্রন্থগুলো ভুল,' এগুলো আসলে যুক্তিবিচ্যুতি বা কুযুক্তির উদাহরণ। এ ধরনের যুক্তি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং, এই দাবিকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন সুস্পষ্ট, যৌক্তিক, এবং নির্ভুল প্রমাণ যা সরাসরি নাস্তিক্যবাদের অবস্থানকে বৈধতা প্রদান করে। স্রষ্টার অস্তিত্বের মতো গভীর ও জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন কুযুক্তি দিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বোধগম্য নয় এবং তা যথার্থ যুক্তিবাদী চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নাস্তিকতা কি সহজাত?

সহজাত বিশ্বাস (Intuitive Belief) বলতে বুঝায়, মানুষের ভেতরে জন্মগত ধারণা। অর্থাৎ, এ ধরনের বিশ্বাসগুলো কেউ আমাদের শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বরং, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত চিন্তাভাবনা এবং বোধ বিবেচনা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুঝে নেওয়া হয়। সহজভাবে বলা যায়, এটি এমন একটি বিশ্বাস বা জ্ঞান যা কোনো বাহ্যিক প্রমাণ বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে শেখানো হয় না, বরং তা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত থাকে। যা কিছু আমরা স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করি। যে জ্ঞান বা ধারণা প্রমাণ বা ব্যাখ্যার বাইরে স্বতঃসিদ্ধ (self-evident) হয়, তা সহজাত বা সহজাত বিশ্বাসের অংশ। এর মানে, এর সঠিকতা এতটাই স্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট যে এটি নির্দিষ্ট প্রমাণের বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করে না। এটি প্রমাণ নিরপেক্ষ।[৬] দার্শনিক হামজা জর্জিস এর মতে, সর্বজনীন এবং জন্মগত বিষয়গুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্য।[৭]

যে জীবনকে আমরা বাস্তব মনে করে প্রতিদিনের দিনপঞ্জি রচনা করি–ধূলিধূসরিত ইট-পাথরের যান্ত্রিক শহর কিংবা সাদামাটা, সহজ-সরল, নিখাদ গ্রামীণ জীবনে–সেই জীবন কি শুধুই একটি স্বপ্ন, নাকি তার আসলেই বাস্তব কোনো অস্তিত্ব রয়েছে? আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে, আপনার জীবনটি কোনো স্বপ্নের মতো ব্যাপার নয়? কিংবা যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ কী?

দর্শন সম্পর্কে যাদের টুকটাক পড়াশোনা রয়েছে তারা হয়ত চট করেই বলে উঠবে, এর উত্তর দার্শনিক রেনে দেকার্ত অনেক আগেই দিয়েছে। দেকার্তের সেই বিখ্যাত উক্তি, "I think, therefor I am" অর্থাৎ, "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।"

দেকার্তের দার্শনিক পদ্ধতি ছিল সংশয়ের পদ্ধতি। তিনি সার্বজনীন সত্য জ্ঞান আবিষ্কারের জন্য সব কিছুই সংশয় করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, যেহেতু তিনি সংশয় করছেন, সেহেতু তাঁর অস্তিত্ব থাকতে হবে। কারণ যিনি সংশয় করছেন, তিনি তো অবশ্যই অস্তিত্বশীল। যদি তার অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে কে এই সংশয় করছে? এভাবেই দেকার্ত তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন। তবে, দেকার্তের এই বক্তব্যের নিশ্চয়তা কী? কেউ যদি আপত্তি করে বলেন, এমনও তো হতে পারে, আপনি কেবল দূরের কোনো অজানা গ্রহের একটি পাত্রে ভেসে বেড়ানো নিছক এক মস্তিষ্ক, এবং সেখান থেকে কলকাঠি নাড়িয়ে আপনার হৃদয়ে অনুভূতিগুলো তৈরি করছে কোনো এলিয়েন! আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি এমন কোনো অজানা গ্রহের পাত্রে ভেসে থাকা মস্তিষ্ক নন?

নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বরং, আমাদের এই মহাজগত যে বাস্তবে অস্তিত্বশীল এহেন বিশ্বাসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা স্বজ্ঞাত (Intuitive) মনে করি। এর জন্য আমরা কোনো যুক্তি বা প্রমাণ খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করি না; এটি এমন এক বিশ্বাস যা আমরা কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করি। দর্শনের ভাষায়, এই ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় অভিজ্ঞতাপূর্ব

---

[৬] https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-evident
[৭] Hamza Tzortzis;The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; Chapter: 4

জ্ঞান" (a priori knowledge). এই ধরনের বিশ্বাসকে Self-evident truth বলেও অবহিত করা হয়।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত দার্শনিক (নাস্তিক) প্রফেসর ডেভিড শালমার্স বলেন, "আপনি প্রমাণ পাবেন না যে আমরা সিমুলেশনে নেই, কারণ আমরা যে কোনও প্রমাণ পাই তাও সিমুলেটেড হতে পারে।"[৮]

স্রষ্টার অস্তিত্ব, বহির্জগতের অস্তিত্ব, আমাদের চিন্তাজগতের অস্তিত্ব, আমাদের যুক্তির বৈধতা, এই বিষয়গুলো স্বতঃসিদ্ধ। আধুনিক দর্শনের জনক রেনে দেকার্তের এর মতে সকল জ্ঞানই এ সমস্ত ধারণা থেকে গাণিতিক অবরোহ (Through Mathematical Deduction) পদ্ধতিতে লাভ করা যায় এবং এই ধারণাগুলো স্বতঃসিদ্ধ।[৯]

দেকার্ত বলেন, আমাদের অভিজ্ঞাতা থেকে প্রাপ্ত যে কোনো জ্ঞানকেই সন্দেহ করা যায়। ২+২=৪, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দু'সমকোণ এসব ধারণার বিপরীত ভাবাই যায় না। এই জ্ঞানগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, সহজাত। এছাড়াও, অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানকে সন্দেহ করা যায় বা মতানৈক্য দেখা যায়। কেননা, অভিজ্ঞতায় অর্জন করা জ্ঞান একেক ব্যক্তির কাছে একেক রকম। স্থান কাল পরিবর্তনের সাথে এই জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এমন কিছু 'চিন্তার মৌলিক নিয়ম' (Fundamental Laws of Thought) আমাদের মধ্যে রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ নয় বরং অভিজ্ঞতাপূর্ব (Apriori). সহজাত ধারণা সম্পর্কে দেকার্ত বলেন, "সহজাত ধারণা অনিবার্য। কারণ, সহজাত ধারণা ব্যতীত মানুষের জ্ঞান জগৎ অকল্পনীয় হয়ে পড়ে"।[১০]

যদি কেউ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো অস্বীকার করে, তখন যুক্তিপ্রবণ মানুষ হিসেবে আপনার উচিত তাকে পালটা প্রশ্ন করা; "তুমি এই বিষয়গুলো অস্বীকার করতে চাইছো, তবে এর বিপক্ষে তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? " ধরুন, কেউ যদি দাবি করে যে, আমাদের এই মহাবিশ্বের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, যা কিছু ঘটছে তা শুধুই একটি স্বপ্ন বা মস্তিষ্কের বিভ্রম–অথবা যদি সে বলে, '২ + ২ = ৫!' তখন আপনি কি নিজেকে এ ধরনের অমূলক দাবির বিরুদ্ধে ২ + ২ = ৪, আপনার অস্তিত্ব, কিংবা মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার প্রয়াসে নিয়োজিত করবেন? নাকি আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন, "তুমি কেন দাবি করছো যে এগুলো বাস্তবে নেই? তোমার কাছে এর বিপক্ষে কী কোনো যুক্তি বা প্রমাণ আছে?"

একজন যুক্তিপ্রবণ মানুষ হিসেবে অবশ্যই তাকে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে হবে। কারণ, আমাদের অস্তিত্ব, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব, এবং ২ + ২ = ৪, এগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করি। যে কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সত্যতা নিয়ে কেউ যখন চ্যালেঞ্জ তোলে, তখন তার প্রমাণের দায়িত্ব সেই চ্যালেঞ্জকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

মুক্তমনা নাস্তিকরা প্রায়শই দাবি করে, ধর্ম কিংবা সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের উৎস হলো সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার বা সংস্কৃতি। তাদের মতে, সৃষ্টিকর্তা বা কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই; এগুলো কেবল মানুষের

---

[৮] https://www.scientificamerican.com/article/are-we-living-in-a-computer-simulation/
[৯] দর্শনের সমস্যাবলি; পৃষ্ঠা নং- ৫৭
[১০] সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠা

কল্পনার ফসল। তারা যুক্তি দেয়, পরিবার, সমাজ, এবং রাষ্ট্র ছোটবেলা থেকেই আমাদের উপর এই বিশ্বাসগুলো চাপিয়ে দেয়, ফলে আমরা এগুলো সত্য বলে মেনে নেয়। তাদের এমন দাবির পেছনে একটি দর্শন কাজ করে–নাস্তিক্যবাদের মতে, মানুষের জ্ঞান কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তারা মনে করে, মানুষের ভেতরে যদি কোনো সহজাত জ্ঞান বা অতিপ্রাকৃতিক উৎস থেকে আসা কোনো অন্তর্নিহিত জ্ঞান থাকত, তবে তা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে নিশ্চিত করত। কিন্তু সত্য এটাই যে, নাস্তিকতা কখনো সহজাত বা অন্তর্নিহিত কোনো বিশ্বাস নয়। বরং ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থার অনুভূতিই মানুষের সহজাত। এই সহজাত জ্ঞানের শক্তিতেই নাস্তিক্যবাদের মতো অর্জিত এবং যুক্তিহীন ধারণাগুলোকে অপসারণ করা সম্ভব। সহজাত সত্যের আলোতেই নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি ভেঙে পড়ে এবং তা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান পায়।

কিন্তু, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ ও সহজাত প্রমাণ করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সামনে উঠে আসে। যেমনঃ

- কেন নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বের জন্য প্রমাণ দাবি করে?
- স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্য কি আদৌ কোনো প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে?
- প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা আসলে কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং তা কি মানবীয় বোধ-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করলেই আমরা বুঝতে পারব, স্রষ্টার অস্তিত্ব আসলে এমন একটি বাস্তবতা, যা যুক্তি-প্রমাণের বাইরেও মানুষের হৃদয় ও চেতনার গভীরতর অংশে সহজাতভাবে বিরাজমান। নাস্তিকরা মূলত 'বার্ডেন অফ প্রুফ' এর উপর ভিত্তি করে দাবি করে থাকে যে 'দাবি যার প্রমাণ তার'। তাই নাস্তিকদের যুক্তি হলো, স্রষ্টার অস্তিত্বের দাবি যেহেতু আস্তিকরা করেন, সেহেতু এই দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্বও তাদের। আপাতদৃষ্টিতে, নাস্তিকদের এই বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ধরুন কোনো বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন যে তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা মানুষকে আকাশে ওড়াতে সক্ষম। স্বাভাবিকভাবেই, তার দাবি বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার জন্য তার উচিত সেই যন্ত্রটি উপস্থাপন করা বা তার কার্যকারিতা প্রদর্শন করা। কিন্তু যদি তিনি বলেন, "আপনি প্রমাণ করুন যে এমন কোনো যন্ত্র আমি বানাইনি," তাহলে সেই দাবি যুক্তি এবং প্রমাণের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ প্রমাণের দায় তার উপর, যিনি দাবি করেছেন।

ঠিক একইভাবে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে আস্তিকদের দাবি করলে, সেই দাবিকে সমর্থন করার জন্য প্রমাণ দেওয়ার দায়ও আস্তিকদের। কিন্তু এখানে নাস্তিকরা আরও একটি যুক্তি সামনে আনেনঃ কেউ যদি দাবি করেন যে স্রষ্টা নেই, তাহলে সেই দাবিও একইভাবে প্রমাণ করতে হবে।

সুতরাং, 'দাবি যার, প্রমাণের বোঝাও তার,' এই নীতির আলোকে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে প্রমাণ চাওয়া কোনোভাবেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন দাবিকারীর উপর প্রমাণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়? এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, কোনো দাবিকে তখনই 'জ্ঞান' হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যখন তার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য ন্যায্যতা উপস্থাপন করা হয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে

আলোচনা করলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে দাবি তোলেন আস্তিকরা, তাই এই দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণের দায়িত্বও তাদের কাঁধে। যতক্ষণ তারা ন্যায্য ও নির্ভরযোগ্য যুক্তি উপস্থাপন করতে না পারবেন, ততক্ষণ তাদের দাবি জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে না। তিনটি মূল স্তম্ভে এই যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে:

১. স্রষ্টায় বিশ্বাস তখনই ন্যায্য বা নিশ্চিত হতে পারে, যখন তার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থিত হয়।

২. যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসের পক্ষে কোনো ভালো যুক্তি না থাকে,

৩. তবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে ন্যায্য বা নিশ্চিত বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এভাবে বার্ডেন অফ প্রুফ (প্রমাণের বোঝা) আস্তিকদের কাঁধেই থাকে এবং এটি একটি যুক্তিসংগত প্রত্যাশা।

এই বিতর্কের সূচনাতেই আমি আস্তিক ও নাস্তিক উভয়ের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। এমন কি কোনো জ্ঞান নেই, যা আমরা কোনো যুক্তি বা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করি? আমাদের সমস্ত বিশ্বাস কি কেবল যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়? আমরা কি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে প্রতিটি ধারণাই যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে? আসুন, কিছু সাধারণ উদাহরণ বিবেচনা করি।

আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে বিশ্বাস করি যে অন্য মানুষ আমাদের মতোই সচেতন, তারা নিছক যান্ত্রিক রোবট নয়। আবার, বাহ্যিক জগতের অস্তিত্বের বিষয়টিও আমরা এমনভাবে গ্রহণ করি, যেন এটি প্রশ্নাতীত সত্য। কেউই সচরাচর ভাবে না যে আমরা একটি ম্যাট্রিক্স সিমুলেশনের মধ্যে বাস করছি কিংবা নিছক স্বপ্ন দেখছি। এমনকি দূরের কোনো অজানা গ্রহে একটি পাত্রের মধ্যে ভেসে থাকা একটি মস্তিষ্ক হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টিও আমরা সহজে স্বীকার করি না। বরং, আমাদের অধিকাংশের কাছেই বাহ্যিক জগতের বাস্তবতা অতি স্বাভাবিক ও স্পষ্ট।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আমাদের যৌক্তিক চিন্তাশক্তির প্রক্রিয়াগুলি মহাবিশ্ব সম্পর্কে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। আমরা যদি আমাদের যৌক্তিক অনুষদগুলোকে ভ্রান্ত বলে ধরে নিই, তাহলে কোনো ধরনের সন্দেহ প্রকাশের সঠিকতা নিয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো না। কেননা, যৌক্তিক প্রক্রিয়া যদি ভ্রান্ত হয়, তবে সেটির মাধ্যমেই কি করে আমরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করবো? সুতরাং, আমাদের যৌক্তিক অনুষদগুলোকে অবিভ্রান্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে করাই একমাত্র সমাধান।

এবার আসুন, অতীতের প্রসঙ্গে কথা বলি। ধরুন, আপনার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হঠাৎ বললো যে আমাদের অতীত, অর্থাৎ গতকাল কী ঘটেছিল কিংবা স্কুলজীবনে কী করেছি, সেসব কিছুই কখনো বাস্তবে ঘটেনি। বরং, সেগুলো আমাদের মস্তিষ্কের একটি বিভ্রম মাত্র। তখন যদি সে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি অতীতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করো?" – আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে অতীতের ঘটনাগুলো আসলেই বাস্তবে ঘটেছিল? সম্ভবত, কোনো যুক্তি দিয়েই তা প্রমাণ করা যাবে না। তবুও, আমরা বিশ্বাস করি যে অতীত বাস্তব এবং সেসব স্মৃতি আমাদের জীবনের অংশ। এরপর আসি গাণিতিক সত্যের বিষয়ে। $২ + ৩ = ৫$ এই সমীকরণে আমাদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এর পক্ষে কোনো যুক্তি দেওয়া যায় কি? আমরা এটি স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করি।

এখন, আস্তিকদের দাবি নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্তিকদের যে প্রস্তাবনা, তা জ্ঞান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এর পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করা না হয়' – এ ধরনের বক্তব্য নাস্তিকদের থেকে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু উপরে উল্লিখিত বিশ্বাসের প্রকারগুলো, যেমন বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব, অতীতের বাস্তবতা, যৌক্তিক প্রক্রিয়ার অবিভ্রান্ততা এবং গাণিতিক সত্যতা – এগুলোর পক্ষে কি সত্যিই কোনো প্রমাণ আছে? আমরা কি যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এসব বিশ্বাস গ্রহণ করি? অবশ্যই না। কারণ এগুলো এমন বিশ্বাস, যা যুক্তি ছাড়াই গ্রহণ করতে হয়। এগুলোকে বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বা স্ব-প্রমাণিত বিশ্বাস। স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসগুলো কোনো প্রকার যুক্তি ছাড়াই আমাদের জ্ঞানের অংশ হয়ে যায়। এ কারণে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে এসব বিষয়ে আমাদের ধারণা যথার্থ। তাই, এমন বিশ্বাসগুলোকেও জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যদিও এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।

অন্যদিকে, নাস্তিকরা দাবি করেন যে কোনো প্রস্তাব তখনই জ্ঞানে পরিণত হবে, যখন সেটি ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, যদি কোনো প্রস্তাব ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাস হয়, তবে সেটিকে সত্য বলে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, শুধুমাত্র ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাস হওয়াই কি কোনো প্রস্তাবকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের 'জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ' সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ

জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে কোন প্রস্তাবকে তখনই জ্ঞান দাবি করা যেতে পারে যখন সেই প্রস্তাবটি বিশ্বাসের জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ন্যায্যতা থাকে, অন্য কথায়, জ্ঞান হল ন্যায়সংগত-সত্য-বিশ্বাস (Justified Truth Belief)।[১১] জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কোনো প্রস্তাবকে তখনই জ্ঞান বলা যায়, যখন তা তিনটি শর্ত পূরণ করে:

১. বিশ্বাসঃ প্রস্তাবটি বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

২. সত্যঃ প্রস্তাবটি অবশ্যই সত্য হতে হবে।

৩. ন্যায়সংগততা: প্রস্তাবটি ন্যায়সংগত হওয়া জরুরি।

উদাহরণ হিসেবে, "করিম একজন ভালো ছেলে" এই প্রস্তাবটি ধরা যাক। যদি মিস্টার রহিম বিশ্বাস করেন যে করিম একজন ভালো ছেলে এবং তার এই বিশ্বাস যথাযথ প্রমাণের মাধ্যমে ন্যায়সংগত হয়, তবে এটি জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হবে। এখন অন্য একটি উদাহরণ ধরা যাক: আপনি বিশ্বাস করেন যে ইউরোপের সকল হাতির রং গোলাপি। কিন্তু, এই বিশ্বাস কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট? না, কারণ আপনার বিশ্বাসটি সত্য নয়। জ্ঞান হওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিশ্বাস করলেই হবে না, সেটি সত্যও হতে হবে।

জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ আমাদের এটাই বলে যে ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাসের অভাব থাকলে কোনো প্রস্তাব জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। তবে প্রশ্ন থেকে যায় – কেবল সত্য হলেই কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

---

[১১] James Ladzman; understanding philosophy of science; Page: 6

একমাত্র সত্যই কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

জ্ঞানের প্রচলিত ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কোনো প্রস্তাব জ্ঞান হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে—বিশ্বাস, সত্য এবং ন্যায্যতা। তবে এই ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণকে চ্যালেঞ্জ করে এডমন্ড গেটিয়ার ১৯৬৩ সালে একটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র রচনা করেন। তিনি দেখান, ন্যায্যতা, সত্য এবং বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রস্তাব সবসময় জ্ঞান হয় না।

দৃশ্যপট ১: একটি ভুল বিশ্বাস ও তার ফলাফল। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে হিলারি ক্লিনটন বিজয়ী হবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন। যাদের বিশ্বাস ছিল হিলারি জয়ী হবেন, তাদের এই বিশ্বাস জ্ঞান নয়, কারণ তা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং যথাযথ ন্যায্যতার অভাব ছিল। এর বিপরীতে, কিছু মানুষ প্রস্তাব করেছিল হিলারি পরাজিত হবেন, যা সত্য প্রমাণিত হলেও তা জ্ঞান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেন? কারণ তাদের বিশ্বাসটি স্রেফ কাকতালীয়ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বাসের পক্ষে তাদের কোনো উপযুক্ত ন্যায্যতা ছিল না।

দৃশ্যপট ২: একটি ন্যায্যতাপূর্ণ বিশ্বাস। এখন কল্পনা করুন, আপনি জানালার বাইরে বৃষ্টি হতে দেখছেন এবং এ কারণে আপনি বিশ্বাস করছেন যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে আপনার বিশ্বাস শুধু সত্যই নয়, এর পক্ষে ন্যায্যতাও রয়েছে। আপনার ন্যায্যতা এই যে জানালার বাহিরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাস জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে, কারণ এতে সত্য, বিশ্বাস এবং ন্যায্যতা একত্রে বিদ্যমান।

ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাসই কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

'ন্যায়সংগত-সত্য-বিশ্বাস' জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 'Gettier Problem' দ্বারা এটি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। গেটিয়ার সমস্যা, জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে, বর্ণনামূলক[১২] জ্ঞান বোঝার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী দার্শনিক সমস্যা। আমেরিকান দার্শনিক এডমন্ড গেটিয়ার জ্ঞানের দীর্ঘকাল ধরে থাকা 'ন্যায়সঙ্গত-সত্য-বিশ্বাস' (JTB) অ্যাকাউন্টকে চ্যালেঞ্জ করে। ন্যায়সঙ্গত-সত্য-বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কোনো দাবি তিনটি শর্ত (ন্যায্যতা, সত্য এবং বিশ্বাস) পূরণ করতে পারে তবে সেই দাবিকে জ্ঞান বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে গেটিয়ার 'ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ নলেজ?' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্রে দুটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ন্যায্যতা, সত্য এবং বিশ্বাস থাকার পরেও একটি দাবি মিথ্যা হতে পারে।[১৩] এইভাবে গেটিয়ার দাবি করেছেন যে, JTB অ্যাকাউন্টটি জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্তগুলি পূরণ করে না। অতএব, গেটিয়ার যুক্তি দিয়েছিলেন, আমরা 'জ্ঞান' বলতে কী বুঝি তা সঠিকভাবে বুঝার জন্য একটি ভিন্ন ধারণাগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। (JTB) অ্যাকাউন্ট এর বিপক্ষে গেটিয়ারের পালটা উদাহরণ নিম্নরূপ।

ধরা যাক, স্মিথ এবং জোন্স একটি চাকুরির জন্য আবেদন করেছেন। স্মিথের কাছে শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যে, (D) জোন্স হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কাজ পাবেন,

---

[১২] জ্ঞানতত্ত্বে বর্ণনামূলক জ্ঞান হলো এমন তথ্যে যা বর্ণনামূলক বাক্য ব্যবহার করে প্রকাশ করা যেতে পারে। একে তাত্ত্বিক জ্ঞান, ঘোষণামূলক জ্ঞান বা প্রস্তাবিত জ্ঞান-ও বলা হয়।

[১৩] https://academic.oup.com/analysis/article-abstract/23/6/121/109949

এবং জোন্সের পকেটে দশটি মুদ্রা রয়েছে। (E) যার পকেটে দশটি মুদ্রা থাকবে তিনিই নির্বাচিত হবেন। স্মিথের প্রমাণটি হলো, হয়ত কোম্পানির প্রেসিডেন্ট তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, জোনস শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হবেন এবং স্মিথ দশ মিনিট আগে জোন্সের পকেটে দশটি মুদ্রা দেখছিলো। তাই স্মিথের বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রস্তাব (D) & (E) সত্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্মিথ নিজেই চাকরিটি পেলেন, যদিও তার অজান্তে তার নিজের পকেটেও দশটি মুদ্রা ছিল। এক্ষেত্রে, প্রস্তাব (E) সত্য, কিন্তু (D) মিথ্যা।

আমাদের এই উদাহরণে প্রস্তাব (E) সত্য। স্মিথ বিশ্বাস করে যে (E) সত্য। স্মিথের বিশ্বাস (E) ন্যায়সংগত। এখানে ন্যায়সঙ্গত-সত্য-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে স্মিথের বিশ্বাস হলো, জোন্স চাকুরিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

একইভাবে এটাও সুস্পষ্ট যে, স্মিথের নিজের পকেটে থাকা কয়েনের ভিত্তিতেও (E) সত্য তা স্মিথ জানেন না। সে জোন্সের পকেটে থাকা কয়েনের গণনার উপর ভিত্তি করে জানে (E) সত্য, এবং এর উপর ভিত্তি করে স্মিথ মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করেন যে জোন্স চাকুরির জন্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু সত্য হলো জোন্স নয়, স্মিথ নিজেই নির্বাচিত হয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'ন্যায়সঙ্গত-সত্য-বিশ্বাস' থাকার পরেও স্মিথের বিশ্বাসটি মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

সুতরাং, 'Gatter Problem' এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে JTB (সত্য-বিশ্বাসের সাথে মিলিত ন্যায্যতা) জ্ঞানের শর্ত প্রণয়নের একটি পর্যাপ্ত উপায় নয়। অনেকভাবে 'Gatter Problem' এর সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই 'proper functionalism' নামক থিসিস দাঁড় করানো হয় যার মাধ্যমে 'Gatter Problem' এর সমস্যা সমাধান করা। এই বিষয়ে জানতে হলে আমাদের 'ওয়ারেন্ট' (Warrant) সম্পর্কে জানতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি ন্যায্যতা জ্ঞানের শর্ত প্রণয়ন করতে ব্যর্থ। অতএব, আমরা ন্যায্যতা ব্যতীত অন্য একটি ধারণা সম্পর্কে কথা বলবো যা জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট এবং এটিকে আমরা 'ওয়ারেন্ট' হিসাবে উল্লেখ করি। তবে এর মানে এই না যে ন্যায্যতাকে আমরা একেবারেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি।

'ওয়ারেন্ট' বলতে বুঝানো হয় সেই বিশেষ সম্পত্তি যা সত্য বিশ্বাসকে জ্ঞানে পরিণত করে বা নিশ্চিত প্রমাণিত করে। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ওয়ারেন্ট হলো, যা জ্ঞান এবং নিছক সত্য বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করে। আমরা দেখেছি কেবল ন্যায্যতা আমাদের সত্য বিশ্বাসকে জ্ঞানে পরিণত করা বা নিশ্চিত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু 'ওয়ারেন্ট' আমাদের সত্য বিশ্বাস এবং জ্ঞানে পরিণত হওয়ার মধ্যে যে 'ফাঁক' (Gap) থাকে তা পূরণ করে। তাই ওয়ারেন্ট হল সত্যিকারের বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মধ্যে 'শূন্যতা পূরণকারী' (gap filler), এবং ওয়ারেন্টের মাধ্যমে আমাদের সত্য বিশ্বাস নিশ্চিতভাবে জ্ঞানে পরিণত হয়।যেমন,

S বিশ্বাস করে P অস্তিত্বশীল।

S এর বিশ্বাস (P অস্তিত্বশীল) ওয়ারেন্টেড বা নিশ্চিত।

সুতরাং, P অস্তিত্বশীল।

একটি বিশ্বাস তখনই 'ওয়ারেন্ট' হবে যদি এবং কেবল যদি:

1. It is produced by cognitive faculties functioning properly. (এটি জ্ঞানীয় অনুষদের দ্বারা উৎপাদিত হয় যা সঠিকভাবে কাজ করে)

অর্থাৎ, আপনার জ্ঞানীয় অনুষদ–যেমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কিংবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়–যথাযথভাবে কাজ করতে হবে। এগুলো যদি যথাযথভাবে কাজ না করে, তবে আপনার অর্জিত তথ্য বা বিশ্বাস প্রকৃত সত্য হিসেবে গণ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ, বিভ্রম বা ডিলিউশনের মতো মানসিক অবস্থার কারণে যদি আপনি কোনো কিছু অনুভব করেন বা প্রত্যক্ষ করেন, তাহলে সেই অভিজ্ঞতা জ্ঞান বা সত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে না।তাই, জ্ঞানীয় অনুষদের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

2. In a cognitive environment sufficiently similar to that for which the faculties were designed. (একটি জ্ঞানীয় পরিবেশে যার জন্য অনুষদগুলি ডিজাইন করা হয়েছিল তার অনুরূপ।)

আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদগুলো কার্যকর হতে হলে সেগুলোকে এমন একটি পরিবেশে কাজ করতে হবে, যা তাদের নকশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, একটি গাড়ির ক্ষেত্রে ধরুন–গাড়ির চারটি চাকা, ইঞ্জিন, এবং জ্বালানি তেলের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান সবই সঠিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি সেই গাড়িটিকে সাগরে চালানোর চেষ্টা করেন, তবে তা ব্যর্থ হবে। কারণ, গাড়ি স্থলপথে চলাচলের জন্য তৈরি, সাগরে নয়।

ঠিক একইভাবে, আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদগুলো যেমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, ইত্যাদি এমন পরিবেশেই কার্যকর হবে যা তাদের উদ্দেশ্য বা নকশার সাথে খাপ খায়। যদি এই পরিবেশ অনুপযুক্ত হয়, তবে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না।

3. Design plan aimed at the production of true beliefs. (জ্ঞানীয় অনুষদের পরিকল্পিত নকশার লক্ষ্য হবে সত্য বিশ্বাস উৎপাদন করা)

আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদ এবং পরিবেশের একটি পরিকল্পিত নকশা থাকতে হবে যার লক্ষ্য হবে সত্য বিশ্বাস অর্জন করা, অবশ্যই মিথ্যা বিশ্বাস অর্জন করা নয়। আপনার জ্ঞানীয় অনুষদগুলো কীভাবে কাজ করবে তার অবশ্যই একটা নকশা রয়েছে। একজন আস্তিকের জন্য অবশ্যই ডিজাইনটি স্রষ্টা করেছে এবং একজন নাস্তিকের জন্য তা প্রকৃতি করেছে।

4. Beliefs successfully being true. (বিশ্বাসটি সফলভাবে সত্য হবে)

আমাদের বিশ্বাসটিকে সফলভাবে সত্যে পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।

আমাদের বিশ্বাসে যদি উল্লিখিত ওয়ারেন্ট থাকে তাহলে বিশ্বাসটি অবশ্যই জ্ঞানে পরিণত হবে। কোনো কিছু ওয়ারেন্টেড হতে হলে আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদ সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। ধরুন, আপনি একটি বাগানে কাঠবিড়ালি দেখতে পাচ্ছেন। যদি এই দেখাটা বিভ্রম থেকে সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ আপনার জ্ঞানীয় অনুষদ সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে বাগানে কাঠবিড়ালি থাকার সত্যতা সত্ত্বেও

আপনার এই বিশ্বাস জ্ঞানে পরিণত হবে না। কারণ বিভ্রম প্রমাণ করে যে, আপনার জ্ঞানীয় অনুষদ যথাযথ ছিল না। সুতরাং, আপনার বিশ্বাস তখনই জ্ঞানে পরিণত হবে যখন একটা সত্য বিশ্বাসের সাথে ন্যায্যতা এবং ওয়ারেন্ট একই সাথে থাকবে। যখনই একটি বিশ্বাস একই সাথে 'সত্য বিশ্বাসের সাথে ন্যায্যতা এবং ওয়ারেন্ট' থাকবে তখনই বিশ্বাসটি জ্ঞানে 'সঠিক কার্যকারণবাদ' (proper functionalism) হিসেবে বিবেচিত হবে।

স্রষ্টা; সঠিক মৌলিক বিশ্বাস বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য

আমরা বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস ধারণ করি। কিছু বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, আবার কিছু বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক। যেমন, কলিং বেলের আওয়াজ শুনে 'কলিং বেল বেজেছে' এই বিশ্বাসটি হয় মৌলিক, যা সরাসরি ইন্দ্রিয় অনুভূতির ফল। এর উপর ভিত্তি করে 'বাইরে কেউ এসেছে' - এই বিশ্বাসটি আসে। যে বিশ্বাস অন্য কোনো বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, তা মৌলিক বিশ্বাস। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান (A কখনো Not A হবে না, অথবা A একই সাথে A এবং B হবে না।), স্মৃতি (গত মাসে আমরা চট্টগ্রামে ভ্রমণ করেছিলাম), - এসব মৌলিক বিশ্বাসের উৎস। আমরা প্রমাণ করতে চাই যে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসও মানব মনের এমনই একটি মৌলিক বিশ্বাস, শুধু মৌলিক নয়, বরং ওয়ারেন্টেড (warranted) এবং সঠিক।

আমরা এখানে 'সঠিক কার্যকারণবাদ' এবং 'মৌলিক বিশ্বাস' সম্পর্কে জেনেছি। আমাদের এই বাস্তব জগতের অস্তিত্ব, আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদ অভ্রান্ত, অতীতের অস্তিত্ব, ইত্যাদি বিশ্বাসগুলো যেমন মানব মনের মৌলিক বিশ্বাস তেমনি স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসটিও মৌলিক বিশ্বাস। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী কীভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসটি মৌলিক বিশ্বাসে পরিণত হয় তার একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মডেল তৈরি করা যাক।

- প্রেমিস-১ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের এমন কিছু জ্ঞানীয় অনুষদ দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারবো এবং সত্য সম্পর্কে ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারবো।
- প্রেমিস-২ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটা মানুষকে আল্লাহর প্রকৃতির (ফিতরা) উপর সৃষ্টি করেছেন যা আল্লাহকে চিনতে, জানতে, এবং তার উপাসনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।
- প্রেমিস-৩ঃ মানুষের সত্য বিশ্বাস অর্জনের জন্য ফিতরা অন্যান্য জ্ঞানীয় অনুষদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করে। যেমন, মন/হৃদয় (ক্বালব)। ফিতরা এবং জ্ঞানীয় অনুষদের এই সংযুক্তির মাধ্যমেই দুনিয়ার মধ্যে থাকা স্রষ্টার নিদর্শন সমূহ দেখে আমরা আল্লাহ'তাআলা সম্পর্কে সচেতন হয়।
- প্রেমিস-৪ঃ সুতরাং, ক্বালব এবং ফিতরার সম্বলিত জ্ঞান এবং স্রষ্টার নিদর্শন সমূহ দেখে আমরা কোনো প্রকার যুক্তির সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ ত'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।[১৪]

---

[১৪] https://www.sapienceinstitute.org/who-shoulders-the-burden-of-proof-reformed-epistemology-and-properly-basic-islamic-belief/

জ্ঞানতত্ত্বের এই মডেলটি (ইবনে তাইমিয়ার সংস্কারকৃত জ্ঞানতত্ত্ব) 'সঠিক কার্যকারণবাদ' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১৫]

এই আয়াত অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহ কোনো প্রকার পূর্ব জ্ঞান ছাড়াই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এবং মানুষকে কিছু জ্ঞানীয় অনুষদ দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার উপাসনা করবে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির (ফিতরা) উপর সৃষ্টি করেছেন যা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কে জানতে ও তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে প্ররোচিত করে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করার বিষয়টি সহজাত বিশ্বাসকেই নির্দেশ করে। ইসলামে সহজাত বিশ্বাসের নাম 'ফিতরা'। এই শব্দটি এসেছে 'ফাতারা' থেকে। ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে ফিতরা হলো মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস বা জন্মগত বিশ্বাস। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ফিতরা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কাজেই দ্বীনের প্রতি তোমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ কর একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন, আল্লাহর সৃষ্টি কার্যে কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[১৬]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবি মুহাম্মদ (সাঃ) এর থেকে নির্ভরযোগ্য একটি হাদিস রয়েছে এই ব্যাপারে। তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন; প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবূ হুরায়রা তিলাওয়াত করলেনঃ (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ) (যার অর্থ) "আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন" "- (সূরা রুমঃ ৩০)।[১৭]

এই আয়াত এবং হাদিসগুলো এটাই ইঙ্গিত প্রধান করে যে, সমস্ত মানুষ একটা প্রাকৃতিক অবস্থা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। আর প্রকৃতিই হলো ফিতরা বা সহজাত জ্ঞান। ইসলামি থিওলজিতে ফিতরাত নিয়ে স্কলারগণদের মধ্যে তিন রকমের মত পাওয়া যায়। ১. নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ২. দ্বৈত দৃষ্টিকোণ ৩. ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ। ফিতরাতের 'ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ' ইসলামিক থিওলজিতে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা এই মত নিয়েছে। ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়ুম, আল-গাজ্জালী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম নববী, ইসমাঈল আল ফারুকী, সৈয়দ নকীব আল-আত্তাস, এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইবনে হাজম সহ এমন অনেক প্রখ্যাত স্কলার এই মত গ্রহণ করেছেন।[১৮]

---

[১৫] সূরা আন-নাহল; ১৬:৭৮

[১৬] সূরা আর-রুম; ৩০-৩০

[১৭] সহীহ বুখারি; হাদিস নং-১৩৫৯

[১৮] The Rationality of Believing in God; Asadullah Ali al-Andalusi. Page: 8

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) ফিতরাত সম্পর্কে বলেন, "যে মানুষ আল্লাহকে চেনেনা, যে তাকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব প্রকৃতির (ফিতরাত) দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী।.....যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয় মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করে তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম"।[১৯]

ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক ইমাম গাযালি ফিতরা সম্পর্কে বলছেন, "ফিতরাহ হল একটি মাধ্যম যা মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে। আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানের বিষয়টি এমন যে এটা থাকে প্রত্যেক মানুষের চেতনার গভীরে"।[২০]

এছাড়া, বিখ্যাত মনীষী ইবনু তাইমিয়্যা ফিতরা সম্পর্কে বলেছেন, "সহজাত স্বভাবকে বা ফিতরাকে এমন কিছু হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ঈশ্বও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন যা ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত জ্ঞান ধারণ করে: "...একজন নিখুঁত স্রষ্টার অস্তিত্ব ফিতরা থেকে জানা যায়, এবং এই জ্ঞান অন্তর্নিহিত, প্রয়োজনীয় এবং সুস্পষ্ট"।[২১] তিনি আরো বলেন, "একজন সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি সকল মানুষের অন্তরে গাঁথা আছে, এটা তাদের সৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত থেকে"।[২২]

ইবনে তাইমিয়া মনে করেন, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এমন দীর্ঘ ও জটিল দর্শনগত পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে তিনি একটি বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ' (ইস্তিদলাল বিল-আয়াত)। যার পরিণামকে তিনি 'তাৎক্ষণিক' বলে মনে করেন এটি একটি ফিতরাতের জ্ঞান যেখানে নিদর্শনসমূহ একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। নিদর্শন (আয়াত) ধারণাটি ইবনে তাইমিয়ার মতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে ফিতরার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "নিদর্শনসমূহ (আয়াত) দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক। এটি কুরআনের পথ এবং তাঁর বান্দাদের ফিতরার অন্তর্ভুক্ত "। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই একপ্রকার নিদর্শন এবং সরাসরি স্রষ্টার প্রমাণ"।[২৩]

আমরা দেখতে পাই যে ইবনে তাইমিয়ার মতে, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানে পৌঁছানোর প্রকৃত পদ্ধতি হলো নিদর্শনের (signs) প্রতি মনোযোগ দেওয়া, যা তাঁর অস্তিত্ব এবং সুনির্দিষ্ট গুণাবলিকে নির্দেশ করে। এই নিদর্শনগুলো হতে পারে তিনি যা উল্লেখ করেছেন 'আয়াত আল-আনফুস' (নিজেদের মধ্যে থাকা নিদর্শন)[২৪] অথবা 'আয়াত আল-আফাক' (দিগন্ত ও মহাবিশ্বের মধ্যে থাকা নিদর্শন)। পরিষ্কারভাবে, ইবনে তাইমিয়ার মতে, এই জ্ঞান ফিতরাতের অংশ; যা একটি সঠিক ও প্রাকৃতিক

---

[১৯] সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী; ইসলাম পরিচিত, পৃষ্ঠা নং-৮

[২০] Hamza Tzortzis;The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; Page: 69

[২১] Hamza Tzortzis; The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; Page: 69

[২২] Hamza Tzortzis; The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; Page: 64

[২৩] Ibn Taymiyya on theistic signs and knowledge of God. Page: 3

[২৪] আয়াত আল-আনফুস হলো সেই সমস্ত উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা যা একজন ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করে এবং তা আল্লাহর সৃষ্টিশীলতার ও তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

জ্ঞানের (Cognition) ফল। তাই এই জ্ঞানকে মনে করা হয় সঠিক বোধগম্যতার ভিত্তিতে একজন মানুষের হৃদয়/মন (Qalb) এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা সঠিক জ্ঞান। যা (হৃদয়/মন) সমস্ত বোধগম্যতা বা জ্ঞানের কেন্দ্র এবং ফিতরার আসন। ফিতরা সমস্ত ক্ষমতাকে তাদের প্রকৃত পথে পরিচালিত করে। এ কারণে আল্লাহর নিদর্শন উপলব্ধির মাধ্যমে, "যখন ফিতরা অক্ষত থাকে, তখন হৃদয়/মন আল্লাহকে জানে, তাঁকে ভালোবাসে এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করে"।[২৫]

ইবনে তাইমিয়া মানুষের বেশ কিছু জ্ঞানীয় অনুষদকে স্বীকার করেছেন। যেমন, ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অনুষদ, যুক্তি (আকল), এবং হৃদয়/মন (ক্বালব), ইত্যাদি। তবে তিনি ফিতরাকে অন্যান্য জ্ঞানীয় অনুষদের মতো স্বাধীন কোনো জ্ঞানীয় অনুষদ বলে মনে করেন না। ইবনে তাইমিয়ার মতে ফিতরা হৃদয়/মন (ক্বালব) এর মধ্যে অবস্থান করে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রাকৃতিক স্বভাবকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যা সত্যতা বুঝতে ও তা জানার জন্য প্রস্তুত। যদি এই হৃদয়ের ভেতরে সত্যকে জানার এই প্রবণতা না থাকত, তবে না তর্ক-বিতর্ক সম্ভব হতো, না প্রমাণ উপস্থাপন, ভাষা বা আলোচনা।"

তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ শারীরিক দেহকে খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণের জন্য উপযোগী করেছেন, এবং যদি এটি না থাকত, তবে দেহগুলোকে পুষ্টি জোগানো ও লালনপালন করা সম্ভব হতো না। ঠিক তেমনি, শারীরিক দেহে যেমন উপযুক্ত পুষ্টি ও অপুষ্টিকে পার্থক্য করার ক্ষমতা রয়েছে, তেমনই হৃদয়ের মধ্যে সত্য মিথ্যাকে পার্থক্য করার একটি ক্ষমতা রয়েছে। হৃদয়ে অবস্থানকারী সেই ক্ষমতা হলো ফিতরা। এখন প্রশ্ন আসতে পারে হৃদয়/মন (ক্বালব) এর সাথে ফিতরার সম্পর্ক কি? নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।

হৃদয়/মন (ক্বালব) ⟶ ফিতরা ⟶ আস্তিক মৌলিক বিশ্বাস

উপরের চিত্রটি দেখায় যে হৃদয় এবং ফিতরার মধ্যে জ্ঞানগত সম্পর্ক কীভাবে একটি মৌলিক পদ্ধতিতে আস্তিক বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটায়। ইবনে তাইমিয়া বলেন, "যদি এটি [ক্বলব] কে যে অবস্থায় তৈরি করা হয়েছিল সেখানে রেখে দেওয়া হয়, কোনো স্মরণ শূন্য এবং কোনো চিন্তামুক্ত থাকে, তাহলে তা অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান গ্রহণ করবে এবং স্পষ্ট সত্য দেখবে যাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে এটি তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে।" তিনি আরও বলেন, "হৃদয় নিজেই সত্য (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না। যখন কিছুই এতে স্থাপন করা হয় না, এটি কেবল সেই জিনিসটিই গ্রহণ করে যার জন্য (আল্লাহকে জানা) এটি সৃষ্টি করা হয়েছে।" এর তাৎপর্য হলো হৃদয়/মন (ক্বালব) এর সঠিক কার্যকারণের মাধ্যমেই একজন মানুষ আল্লাহকে জানতে পারে। তিনি আরো বলেন, "যখন ফিতরা অক্ষত রাখা হয়, তখন হৃদয় ঈশ্বরকে জানে, তাঁকে ভালোবাসে এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করে"।[২৬]

সুতরাং, হৃদয়/মন (ক্বালব) এর সঠিক কার্যকারণের মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অবগত হতে পারি। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতিকে যদি দূষিত না করা হয় তবেই মানুষ সহজাতভাবে

---

[২৫] Ibn Taymiyya on theistic signs and knowledge of God. Page: 4
[২৬] An Islamic Account of Reformed Epistemology. Page: 13

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার উপাসনা করবে। আমরা ইতোমধ্যে একটি হাদিস দেখেছি যেখানে রাসুল (সাঃ) সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে নির্দিষ্ট ফিতরার উপর সৃষ্টি করেছেন তা যদি অক্ষত থাকে বা দূষিত না হয় তবে ফিতরা সঠিকভাবে কাজ করবে। এভাবে যখন ফিতরা সঠিকভাবে কাজ করে তখন হৃদয়/মন (ক্বলব) মৌলিক উপায়ে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে। অতএব, কৃলবের উপর ফিতরার স্বাভাবিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে জানতে সক্ষম হয়। তাই ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন, "একজন স্রষ্টার প্রমাণ এবং তাঁর পূর্ণতা হলো সহজাত এবং অনিবার্য যার ফিতরা অক্ষত থাকে তার জন্য"।[২৭]

আমাদের ফিতরার মধ্যে বা হৃদয়/মন (ক্বলব) এর মধ্যে স্রষ্টার প্রতি যে মৌলিক বিশ্বাস তৈরি হয় তা আসে স্রষ্টার দেওয়া নিদর্শন থেকে। অর্থাৎ, দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যত নিদর্শন রয়েছে তা দেখে তাৎক্ষণিক আমাদের মনের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলো একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকেই নির্দেশ করে। এটাই হলো ফিতরা বা আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন এক ফিতরাতে উপর সৃষ্টি করেছেন যে ফিতরা তার নিদর্শন সমূহ দেখে সহজাতভাবেই তার সম্পর্কে অনুধাবন করে নেয়, তার সম্পর্কে জানতে পারে, তার উপাসনা করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই ইবনে তাইমিয়া দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, "নিদর্শনের (আয়াত) মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা আবশ্যিক। এটি কুরআনের পথ, এবং তাঁর বান্দাদের ফিতরায় অন্তর্নিহিত। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই একপ্রকার নিদর্শন এবং সরাসরি স্রষ্টার প্রমাণ"।[২৮]

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে 'নিদর্শন' এর কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন নিজেই একটি নিদর্শন দ্বারা গঠিত: কুরআনের প্রতিটি আয়াত এক একটি নিদর্শন। যেমন, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদাত কর"।[২৯]

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন"।[৩০]

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে"।[৩১]

সুতরাং, ফিতরা যখন দূষণ মুক্ত, অক্ষত, বা ফিতরার যে স্বাভাবিক অবস্থা তার উপরে মিথ্যার ছাপ না পরে (যেমনটা রাসুল (সাঃ) বলেছে, প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে

---

[২৭] An Islamic Account of Reformed Epistemology. Page: 13-14

[২৮] Ibn Taymiyya on theistic signs and knowledge of God. Page: 3

[২৯] সূরা হা-মিম-আস-সাজদাহ; ৪১:৩৭

[30] সূরা আলে ইমরান; ৩:১৯০

[৩১] সূরা আল জাসিয়া; ৪৫:৩

ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে।) তাহলে ফিতরা আমাদের জ্ঞানীয় অন্যান্য অনুষদগুলোর সাথে মিলিত হয়ে স্রষ্টার দেওয়া নিদর্শন থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে একটি মৌলিক বিশ্বাস তৈরি করে।

'সঠিক কার্যকারণবাদ' এর সাথে ইবনে তাইমিয়ার জ্ঞানতত্ত্বের মডেলটির সামঞ্জস্য হওয়ার বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা উচিত। ইবনে তাইমিয়া বলেন, "সঠিকভাবে কাজ করা ফিতরার উপর ভিত্তি করে মানুষ সত্যের জ্ঞান এবং তার নিশ্চিতকরণ, এবং মিথ্যার স্বীকৃতি এবং তার প্রত্যাখ্যান করে"।[৩২] অন্য জায়গায় ইবনে তাইমিয়া আরো বলেছেন যে, "যখন সত্য কারো মনে প্রবেশ করে, তখন ফিতরা স্বাভাবিকভাবেই তা গ্রহণ করে... কিন্তু যখন এটি মিথ্যা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়"।[৩৩]

সুতরাং, সঠিকভাবে কাজ করা ফিতরার সাথে আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদের সংযোগ রয়েছে যা আমাদের বিশ্বাসকে ওয়ারেন্ট রাখার নিশ্চয়তা নেয়। আমরা 'সঠিক কার্যকারণবাদ' নিয়ে আলোচনায় দেখিয়েছি যে, আমাদের স্মৃতি-ভিত্তিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা অন্যান্য জ্ঞানীয় অনুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলো তখনই জ্ঞানে পরিণত হবে যখন সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করা জ্ঞানীয় অনুষদ থেকে উৎপাদিত হবে, একটি জ্ঞানীয় পরিবেশে যার জন্য অনুষদগুলি ডিজাইন করা হয়েছিল তার অনুরূপ, জ্ঞানীয় অনুষদের পরিকল্পিত নকশার লক্ষ্য হবে সত্য বিশ্বাস উৎপাদন করা, বিশ্বাসটি সফলভাবে সত্য হবে। একইভাবে তাইমিয়ান-ইসলামিক জ্ঞানতত্ত্বের মডেল অনুযায়ী, দুনিয়াতে বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে স্রষ্টারপ্রতি মৌলিক বিশ্বাস উদ্ভূত হয়, যা ফিতরার সাথে মিলিত হয়ে কলবের সঠিক কার্যের ফলে উদ্ভূত হয়, এবং যা উপযুক্ত পরিবেশে সফলভাবে সত্য জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা পরিকল্পিত বা ডিজাইনকৃত।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার (Design Plan) ভিত্তিতে। এর লক্ষ্য হলো সত্য জ্ঞান অর্জন করা। এই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যা সত্য জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম। আর তা হলো ফিতরা। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অসংখ্য নিদর্শন দিয়েছেন। ফিতরা যখন দূষণ মুক্ত, অক্ষত, বা ফিতরার যে স্বাভাবিক অবস্থা তার উপরে মিথ্যার ছাপ না পরে , তাহলে আল্লাহর দেওয়া নিদর্শন সমূহ দেখে আমাদের ফিতরা আমাদের জ্ঞানীয় অন্যান্য অনুষদগুলোর সাথে মিলিত হয়ে স্রষ্টার দেওয়া নিদর্শন থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে একটি মৌলিক বিশ্বাস তৈরি করে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, ফিতরাকে যে লক্ষ্যে ডিজাইন করা হয়েছে (সত্য জ্ঞান অর্জন) সেই অনুরূপ পরিবেশ (নিদর্শন) রয়েছে।

একইভাবে 'সঠিক কার্যকারণবাদ' অনুযায়ী সত্য জ্ঞান পাওয়া জন্য আমাদের জ্ঞানীয় অনুষদগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। একটি জ্ঞানীয় পরিবেশে যার জন্য অনুষদগুলি ডিজাইন করা হয়েছিল তার অনুরূপ হতে হবে। জ্ঞানীয় অনুষদের পরিকল্পিত নকশার লক্ষ্য হবে সত্য বিশ্বাস উৎপাদন করা। এরপর বিশ্বাসটি সফলভাবে সত্য হবে। এভাবেই, আমাদের ইসলামিক জ্ঞানতাত্ত্বিক মডেল প্রদর্শন করতে পারে যে, কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সঠিক কার্যকারিতা অনুসারে একটি

[৩২] Ibn Taymiyya, Taqī al-Dīn. al-Intiṣār li-ahl al-athar (naqḍ al-mantiq). (Mecca: Dār 'ālam al-Fawā'id, 2014), 49.
[৩৩] Ibid. 49.

মৌলিক সত্য বিশ্বাস। সুতরাং, স্রষ্টার বিশ্বাস মানব মনের মৌলিক বা সহজাত বিশ্বাস যা 'সঠিক কার্যকারণবাদ' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে স্রষ্টার বিশ্বাসটি ওয়ারেন্টেড। মৌলিক বা সহজাত বিশ্বাসগুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা নিশ্চিত বিশ্বাস। স্বতঃসিদ্ধ বা মানবমনের মৌলিক, সহজাত বিশ্বাসগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যও কোনো ধরনের প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, কোনো প্রমাণ বা যুক্তিরউপর নির্ভর করতে হয় না। এগুলো প্রমাণ নিরপেক্ষ যা স্বাধীনভাবে জ্ঞানে পরিণত হয়।

সহজাত বিশ্বাসের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

একদল শিশুকে জনমানবহীন মরুদ্বীপে ফেলে দেওয়া হলে তারা কি স্রষ্টার ধারণা পোষণ করবে? কগনেটিভ বিজ্ঞানীদের মতে, শিশুরা জন্মগতভাবেই স্রষ্টার ধারণা নিয়ে আসে। তারা সহজাতভাবেই প্রকৃতিতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পায়। শিশুরা জগতের অস্তিত্বের পেছনে এক সৃষ্টিশীল শক্তির ধারণা গড়ে তোলে। তাই স্রষ্টার ধারণা শুধুই পারিবারিক, সামাজিক, কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফল নয়। বরং এটি মানব মনের গভীরে নিহিত একটি মৌলিক সত্য। কাজেই নাস্তিকদের দাবি-যে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস কেবল পারিপার্শ্বিক শিক্ষার ফল-একেবারেই ভিত্তিহীন।

University of Oxford এর Center for Anthropology and mind বিভাগের সিনিয়র রিসার্চার Dr. Justin Barrett দীর্ঘ ১০ বছর শিশুদের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার উপর '*Born Believers: The Science of Children's Religious Belief*' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। বইটিতে তিনি ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি, কগনিটিভ এনথ্রোপলোজি এবং কগনিটিভ সায়েন্স অব রিলিজিয়ন সহ বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একত্রে করে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন শিশুরা জন্ম থেকেই স্বভাবজাত ধর্মে বিশ্বাসী। বইতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, কীভাবে মানুষের মধ্যে স্বভাবতই ঐশ্বরিক শক্তির বিশ্বাস গড়ে উঠে। শিশুরা শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে যিনি বুদ্ধিমান এজেন্ট এবং এমন শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক যা সূর্যকে আলোকিত করে এবং রাতের পতন ঘটায়।[৩৪] এছাড়াও বিবিসি রেডিওতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তার গবেষণা সম্পর্কে Dr. Justin Barrett বলেন, "আপনি যদি কিছুসংখ্যক শিশুকে কোনো দ্বীপে রেখে আসেন আর তারা নিজেরাই বেড়ে উঠে আমি মনে করি তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করবে"।[৩৫]

একইভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী Dr. Olivera Petrovich পিয়ার রিভিউ জার্নালে তার গবেষণার ফলাফলে জানান, "কিছুধর্মীয় বিশ্বাস যে সার্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (যেমন, কোনো অতিপ্রাকতিক সত্তাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে মৌলিক বিশ্বাস), এর পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়ে বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকেই বেশি বেরিয়ে আসছে বলেপ্রতীয়মান হচ্ছে"।[৩৬] এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ান একটি নিউজ জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়, Dr. Olivera Petrovich বলেন, "স্রষ্টার বিশ্বাস শেখানো হয় না কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়"।[৩৭]

---

[৩৪] Dr. Justine L Barrett, Born Believers: The Science of ChildrenÕs Religious Belief; Chapter 6: Natural Religion.
[৩৫] http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_7745000/7745514.stm
[৩৬] DOISerbia - Key psychological issues in the studz of religion - Petrović, Olivera (nb.rs)
[৩৭] Infants 'have natural belief in God' (smh.com.au)

প্রফেসর রবার্ট ম্যাকাওলি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তার প্রকাশিত, "Why Religion is Natural and Science in not" গ্রন্থে Dr. Olivera Petrovich এর সুরে কথা বলেছেন।[৩৮]

ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষক পল ব্লুম জার্নাল অব ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্স-এ প্রকাশিত এক পেপারে জানান, "বিগত বছরগুলোতে পরিচালিত কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানাচ্ছে কিছু সার্বজনীন ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়েই শিশুরা জন্মায়, যেমন; ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব, পরকালের বিশ্বাস, ইত্যাদি"।[৩৯]

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাস্তিক) গবেষক ডেবোরাহ কেলেমেন *'শিশুরা কি সহজাতভাবে আস্তিক?'* এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রের করেছেন। এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "সম্প্রতি মননগত গবেষণায় দেখা যায় যে, ৫ বছরের দিকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে প্রাকৃতিক বস্তুগুলো মানব সৃষ্ট নয়। ৬-১০ বছর বয়সী শিশুরা প্রকৃতির মাঝে একটা মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। এসব গবেষণা থেকে শিশুদের ব্যাখ্যামূলক মনোভাবকে সহজাত আস্তিক্যবাদ হিসেবে বলা যেতে পারে"।[৪০] এছাড়াও ডেবোরাহ কেলেমেন বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত জানান যে, "অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় ধর্মীয় বিশ্বাস বাহ্যিক, সামাজিক উৎস থেকে নয় বরং, প্রাথমিকভাবে মানুষের ভেতর থেকেই উৎপত্তি হয়। এ বিশ্বাস মানব মনের মৌলিক উপকরণ"।[৪১]

এলিনা জার্নেফেল্ট, কেটলিন এফ. ক্যানফিল্ড এবং ডেবোরাহ কেলেমেন সম্প্রতি একটি গবেষণা করেছে, "*অবিশ্বাসীদের বিভক্ত চিন্তাধারা; বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিধার্মিক প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির ব্যাপারে সহজ বিশ্বাস*" এই শিরোনামে। এই গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবেই দেখার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে মানুষের। গবেষণার ফলাফলটি দেওয়া হয় তিনটি সমীক্ষার মাধ্যমে। প্রথম সমীক্ষাটি করা হয় ৩৫২ জন প্রাপ্ত বয়স্ক উত্তর-আমেরিকানদের ওপর। দ্বিতীয় সমীক্ষাটি করা হয় ১৯৪৮ জন উত্তর আমেরিকানদের উপর। এবং তৃতীয় সমীক্ষাটি করা হয় ১৫১ জন ফিনল্যান্ডের বসবাসরত মানুষের মধ্যে। সমীক্ষায় ধার্মিক এবং অধার্মিক দু-ধরণের লোকই অংশগ্রহণ করেছিলো। তাদেরকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ১২০টি ছবি দেখানো হয়েছিল। এবং তাদের কাজ ছিল, ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে তা কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করেছে কিনা তা নির্ধারণ করা। তাদের কাউকে ঝটপট উত্তর দিতে বলা হয়েছিল এবং কাউকে কিছুক্ষণ ভাবার সময় দেওয়া হয়েছিল। কিবোর্ডের মাধ্যমে হ্যাঁ অথবা না ফলাফল দিতে হতো তাদের। প্রত্যেকটি সমীক্ষা থেকেই প্রাপ্ত ফলাফল এই যে, 'নাস্তিকরাও সৃষ্টির মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায়'। এই গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবে দেখার একটা সহজাত প্রবণতা বা জন্মগত বিশ্বাস আমাদের মাঝে রয়েছে।[৪২]

---

[৩৮] Why Religion Is Natural and Science Is Not; ROBERT N. McCAULEY; Oxford University Press.
[৩৯] Paul bloom religion is natural journal of developmental science 10:1 p 147-151
[৪০] Are Children "Intuitive Theists?" Reasoning about Purpose and Design in Nature.
[৪১] Patrick Mcnamara Ph.D, Wesley J. Wildman (etd.), Science and the World's Religious; Vol. 02 (Persons and Groups), P.206,209 (Publisher ABC-CLIO, July 19,2012)
[৪২] The Divided mind of a disbeliever: Intuitive beliefs about nature as purposefully

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন নাগাসাওয়া তার বইতে উল্লেখ করেছেন, "সম্প্রতি কগনেটিভ সায়েন্স অব রিলিজিওন ফিল্ডের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা সহজাতভাবে প্রকৃতিতে উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধিমত্তা দেখতে পায়।" সেখানে আরো উল্লেখ করা হয়, মনোবিজ্ঞানী ডোবোরাহ কেলেমেন আমেরিকায় কিছু বিদ্যালয়ের শিশুদের উপর গবেষণা করে জানায় যে, "শিশুরা সহজাতভাবেই টেলিওলজিক্যাল পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক বস্তুর সমূকে ব্যাখ্যা করে"।[৪৩]

সেক্যুলার গবেষক এন্ড্রু নিউবার্গের মতে, "আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে মানুষের জন্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ খুবই সহজ একটি ব্যাপার, গবেষণার ফল নিঃসন্দেহে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে"।[৪৪]

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রজার ট্রিগ এর মতে, "ধর্মকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী কারণ ধর্মবিশ্বাস মানবমনে গ্রথিত বলেই প্রতীয়মান হয়"।[৪৫]

নাস্তিক মনোবিজ্ঞানী প্যাসকেল বয়ার Nature জার্নালে প্রকাশিত পেপারে উল্লেখ করেছেন, "নাস্তিকতা হলো আমাদের সহজাত চেতনার (Natural Cognitive disposition) বিরুদ্ধে"।[৪৬]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানব মনের সহজাত ও মৌলিক বিশ্বাস। মৌলিক বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো স্বতঃসিদ্ধ এবং ওয়ারেন্টেড। এগুলোর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বাহ্যিক প্রমাণ বা যুক্তি প্রয়োজন হয় না। যেহেতু মৌলিক বিশ্বাসগুলো স্বপ্রমাণিত, সেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্বও প্রমাণ-নিরপেক্ষ এবং স্বতঃসিদ্ধ। অন্যদিকে, নাস্তিকতা কোনো সহজাত বা মৌলিক অবস্থান নয়; বরং এটি একটি অর্জিত এবং কৃত্রিম ধারণা।

প্রাথমিকভাবে যেহেতু একজন স্রষ্টার মৌলিক ধারণার বিষয়টি সত্য, কাজেই সহজাত এবং মৌলিক বিশ্বাসকে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে চ্যালেঞ্জকারীকে প্রমাণের ভার বহন করতে হয়। তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিকদের প্রতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো: কী প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই?

যে কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে চ্যালেঞ্জকারীকে যথাযথ যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। সহজাত ও মৌলিক সত্যের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের জন্য এটি একটি ন্যূনতম শর্ত। সুতরাং, নাস্তিকদের পক্ষ থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারের যুক্তি এবং প্রমাণ আবশ্যক।

---

[৪৩] The Existence of God. A Philosophical Introduction; Page 57-58

[৪৪] Elizabeth king. I'm an atheist. So why can't I shake God? The Washington post, February 4, 2016

[৪৫] Tim Ross. Belief in God is part of human nature-Oxford studz. The Telegraph, 12may2011

[৪৬] Pascal Boyer. Bound to Believe? Nature, Vol. 455, P-1038

অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

বিজ্ঞান এবং নাস্তিকতা কী সামঞ্জস্যপূর্ণ?

নাস্তিকতার প্রচার-প্রসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নাস্তিকরা প্রায়ই দাবি করেন যে, বিজ্ঞানই মানুষকে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে। তবে এ দাবি নিজেই বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা দুটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। নাস্তিকতা মানে আল্লাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। দর্শনের ভাষায় এই মতবাদকে বলা হয় 'দার্শনিক প্রকৃতিবাদ' (Philosophical Naturalism). দার্শনিক প্রকৃতিবাদের মতে, জগতে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা কেবল ভৌতিক বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলোর পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত কারণ নেই। এই দর্শন তিনটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. কোনো অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক শক্তি নেই। ২. মহাবিশ্বের সকল কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ও নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ৩. মৃত্যুর পরে কোনো পরকাল বা পুনর্জীবনের ধারণা নেই।

দার্শনিক প্রকৃতিবাদীরা সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক দাবি এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাকে সরাসরি অস্বীকার করেন। বিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্স তার লিখিত 'The God Delusion' গ্রন্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে বলেন, "দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অর্থে নাস্তিক হলো এমন কেউ, যে বিশ্বাস করে প্রকৃতি, ভৌত জগৎ, পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের পিছনে কোনো অতিপ্রাকৃতিক সৃজনশীল বুদ্ধিমান সত্তা লুকিয়ে নেই যিনি চুপিসারে অবস্থান করছেন। কোনো আত্মা নেই যেটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, নেই কোনো অলৌকিক কিছু। আছে কেবল জাগতিক ঘটনাবলি, যা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি"।[৪৭]

এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদ বা নাস্তিকতার ভিত্তি হলো অন্ধবিশ্বাস। কারণ, নাস্তিকরা অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, পরকালের অস্তিত্ব, অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে। কিন্তু তারা তাদের এই অবস্থানের পক্ষে সঠিক কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। নাস্তিক দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্স অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পাবলিক ডায়ালগে স্বীকার করেছেন যে, স্রষ্টা নেই এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।[৪৮]

বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক আইজ্যাক অ্যাসিমভ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি বছরের পর বছর নাস্তিক ছিলাম, কিন্তু কোনো প্রকারে আমি অনুভব করেছি যে, নিজেকে নাস্তিক বলা বুদ্ধিগতভাবে অসম্মানজনক কারণ এটা এমন জ্ঞানঅনুমান করে (স্রষ্টার অনস্তিত্ব) যা সে জানেনা।.....আবেগের দিক থেকে আমি নাস্তিক। স্রষ্টা যে নেই, এই ব্যাপারে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই"।[৪৯]

অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নাস্তিক পদার্থবিদ লরেন্স ক্রউস বলেন, "আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই।[৫০]

---

[৪৭] Richard Dawkins, The God Delusion; P-14

[৪৮] Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist - YouTube

[৪৯] Issac Asimov on science and the Bible. Isaac Asimov Science and the Bible (Sullivan-county.com)

[৫০] Lawrence M. Krauss - I can't prove that God doesn't exist... (brainyquote.com)

অন্যদিকে, বিজ্ঞান হলো ভৌত জগতের গঠন এবং আচরণের যত্ন সহকারে অধ্যয়ন, বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, এবং এই ক্রিয়াকলাপের ফলাফলগুলি বর্ণনা করার জন্য তত্ত্বগুলির বিকাশ।[৫১] যাকে দর্শনের ভাষায় বলা হয় পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ (Methodological Naturalism).

পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ বা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি স্রষ্টার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে না। বরং, এই মতবাদ অলৌকিক সত্তা বা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। এটি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক জগৎ ও তার নিয়ম-নীতির বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ। এটি কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত আছে কি না সে বিষয়ে নীরব থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ অনুসন্ধানেই নিয়োজিত। অন্যদিকে, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ (নাস্তিকতা) সরাসরি দাবি করে যে, স্রষ্টা বা কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নেই। এটি জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে প্রাকৃতিক কারণ এবং উপাদান দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চায় এবং কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে। সুতরাং, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ (নাস্তিকতা) এবং পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ (বিজ্ঞান) দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা। একটি সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। অপরটি স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে যায় না এবং এই বিষয়ে নীরব থাকে।

বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার, আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স- বিজ্ঞান কি এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, "বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। এটা প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানে এটি সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান অতিপ্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনা। স্রষ্টা আছে নাকি নেই- এই প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান নিরপেক্ষ"।[৫২]

ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এক গ্রন্থে বিজ্ঞান দার্শনিক গাউচ বলেন, "দুঃখজনক হলেও সত্য, পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে মাঝে মধ্যে অস্তিত্বগত প্রকৃতিবাদের (দার্শনিক প্রকৃতিবাদ) সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। তাই কেউ যদি এমন ধারণায় অটল থাকে যে, বিজ্ঞান পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ মেনে চলে এবং বিজ্ঞান নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করে, তবে তাকে এমন প্রবল উৎসাহ পূর্ণ কথার জন্য বেশি নাম্বার দেওয়া হলেও যুক্তির খাতায় তার নাম্বার হবে কম"।[৫৩]

বিবর্তনবীদ কার্ল উওস এর মতে, "মানুষ বলে নাস্তিকতা নাকি বিজ্ঞান নির্ভর। একথা আমি পছন্দ করি না। কারণ, বাস্তবতা তা নয়। বরং নাস্তিকতার উপমা হলো-বিজ্ঞানের উপর ভিনগ্রহের প্রাণীদের আক্রমণ করার মতো"।[৫৪]

সুতরাং, অ্যাকাডেমিক অনুধাবন অনুযায়ী, বিজ্ঞান কখনোই কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করে না কিংবা পরকালের অস্তিত্বে আস্থা রাখে না—এমন কথা সম্পূর্ণ অমূলক। বিজ্ঞান এসব বিষয়ে নীরব থাকে এবং কেবলমাত্র প্রাকৃতিক জগৎ ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়েই কাজ করে। অন্যদিকে, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ সরাসরি অতিপ্রাকৃত স্রষ্টার অস্তিত্ব, অলৌকিক সত্তা, এবং পরকালের ধারণাকে অস্বীকার করে। এ কারণে বিজ্ঞানের সঙ্গে নাস্তিকতার কোনো প্রকৃত সংযোগ নেই।

---

[৫১] SCIENCE | English meaning - Cambridge Dictionary
[৫২] Teaching About Evolution and the Nature of Science. Page;58
[৫৩] Hugh G. Gauch, Scientific Method in brief; P.98 (Cambridge University Press, Sep 6,2012)
[৫৪] Evolution Scientist Carl Woese Dies: "The most important Evolution scientist of 20th century"

বিজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে বা বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ–এই ধরনের ধারণার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, নাস্তিকতার সঙ্গে বিজ্ঞান নয়, বরং আবেগ, আধ্যাত্মিকতা, এবং মনস্তত্ত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নাস্তিকতা একটি দার্শনিক অবস্থান যা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু বিজ্ঞান এ বিষয়ে কোনো পক্ষপাতমূলক অবস্থান নেয় না।

অধিকাংশ দার্শনিক নাস্তিক হলে কী নাস্তিকতা সত্য হবে?

নাস্তিকদের যুক্তি প্রণালিতে প্রায়ই এমন এক ধরনের কুযুক্তি দেখা যায়, যেখানে নাস্তিকতাকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে 'অধিকাংশ দার্শনিকের ঐকমত্য' অথবা 'অধিকাংশ দার্শনিক নাস্তিক ' এই ধরনের বক্তব্য ব্যবহার করা হয়। তাদের যুক্তিটি মূলত নিম্নরূপ:

P1: যদি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে দার্শনিকদের ঐকমত্য থাকে, অথবা অধিকাংশ দার্শনিক যদি নাস্তিক হয়, তাহলে নাস্তিকতা সত্য।

P2: নাস্তিক্যবাদের পক্ষে অধিকাংশ দার্শনিকদের ঐকমত্য রয়েছে।

C: সুতরাং, নাস্তিকতা সত্য।

এই যুক্তিটি আসলে একটি ক্লাসিক্যাল যৌক্তিক ভ্রান্তি, যা 'জনপ্রিয়তার ভ্রান্তি' (Appeal to appeal to popularity fallacy) নামে পরিচিত। কোনো কিছুর সত্যতা, বৈধতা, বা যৌক্তিকতার ভিত্তি হিসেবে যদি ন্যায্যতা বা প্রমাণের পরিবর্তে জনপ্রিয়তাকে উপস্থাপন করা হয় তবে এই কুযুক্তিটি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ধূমপান স্বাস্থ্যসম্মত কারণ অধিকাংশ মানুষ ধূমপান করে।

কিছু নাস্তিক যুক্তি দিতে পারেন যে, তারা নাস্তিকতাকে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নয়, বরং অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক বলে দাবি করেন। কিন্তু এমন দাবির মাধ্যমেও নাস্তিক্যবাদের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, অভিজ্ঞদের মতামতের উপর নির্ভর করে কোনো প্রস্তাবকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা একটি কুযুক্তি, যা 'অভিজ্ঞতাগত অধিকার ভ্রান্তি' (Appeal to Authority) নামে পরিচিত। কোনো দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করার পরিবর্তে যদি বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করে দাবিটির সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তবে এই কু-যুক্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ; আইনস্টাইন বলেছেন, তাই এটি অবশ্যই সত্য।

আইনস্টাইন একজন মহান বিজ্ঞানী হলেও, তার প্রতিটি বক্তব্য সত্য হতে হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই এ ধরনের যুক্তি প্রমাণবিহীন এবং ন্যায্যতার অভাবে যুক্তির দিক থেকে ভঙ্গুর।

তদ্রূপ, নাস্তিকদের দাবিতে যদি বলা হয়, 'অধিকাংশ দার্শনিক নাস্তিক এবং তাদের নাস্তিকতার পক্ষে ঐকমত্য রয়েছে; সুতরাং, নাস্তিকতা যৌক্তিক,' তবে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি অবৈধ যুক্তি। সত্য কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় না। বরং সত্যের ভিত্তি হলো বাস্তব প্রমাণ, যৌক্তিক ন্যায্যতা, এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। সুতরাং, বিশেষজ্ঞদের মতামতকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে নাস্তিক্যবাদের সত্যতা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি এক ধরনের কুযুক্তি এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

এই আলোচনাতে আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সত্য আসলে কী? আমার দৃষ্টিতে, সত্য হলো যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এই বইটি পড়েন, তবে সেটি একটি অমোচনীয় সত্য। এটি কখনোই পরিবর্তন হবে না। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একত্রে বলে, আপনি বইটি পড়েননি, তবুও বাস্তবতা সেই অভিজ্ঞতাকে মিথ্যা করে তুলতে পারবে না। সত্য কখনোই

পরিবর্তনশীল নয়, এটি কারো ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভর করে না। যা কিছু সত্য, তা সর্বদাই চিরন্তন।

গাণিতিক সত্যের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন, ২+২=৪ এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একসাথে দাবি করে, ২+২=৫, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটি ৪-ই থাকবে। এই ধরনের সত্য কখনোই স্থান, কাল, বা পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তাহলে যদি আমরা ধরে নিই, অধিকাংশ দার্শনিক দাবি করেন যে নাস্তিকতা সত্য, অথবা ভবিষ্যতে যদি এমন সময় আসে যখন অধিকাংশ দার্শনিক আস্তিকতার পক্ষে রায় দেন, তাহলে কি সত্য পরিবর্তিত হবে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এক সময় নাস্তিকতা শব্দটি আদৌ ছিল না, তখন কি আস্তিকতাই একমাত্র সত্য ছিল?

সত্য কখনো পরিবর্তনশীল নয়। এটি অতীতেও অপরিবর্তিত ছিল, বর্তমানে তা একই রয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও তা একই থাকবে। যেমন, একটি বৃত্ত সবসময় গোলাকার থাকবে, ২+২=৪, এটি যেমন আজকের দিনের সত্য, তেমনই এটি অতীতেও সত্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকবে। কোনো কালে গিয়ে একটি বৃত্ত ত্রিভুজ হবে না বা ছিল না, সবসময়ই গোলাকার। কোনো কালে গিয়ে ২+২=৫ হয়ে যাবেনা বা কোনো কালেই ৫ ছিল না।

বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সত্য নির্ধারণ করার যে প্রচেষ্টা নাস্তিকরা করে থাকে, তা একটি ভ্রান্তি। 'যেহেতু অধিকাংশ দার্শনিক নাস্তিক, তাই নাস্তিকতা যৌক্তিক'–এমন যুক্তি সত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সত্যের মূল্যায়নে জনমত বা বিশেষজ্ঞের মতামত নয়, বরং প্রয়োজন অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ, বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য, এবং নির্ভুল যৌক্তিকতা।

অধিকাংশ দার্শনিক কী আসলেই নাস্তিক?

২০১৪ সালের ডেভিড বার্গেট এবং ডেভিড শালমার্স 'দার্শনিকরা কি বিশ্বাস করেন?' এই শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। উক্ত গবেষণায় দর্শনের বিভিন্ন শাখার দার্শনিকগণের সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে তারা জানায়, ধর্মের দর্শন (Philosophy of Religion) ফিল্ডে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে ৭৯.১৩ শতাংশ দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এবং ২০.৮৭ শতাংশ দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। অন্যদিকে, দর্শনের অন্যান্য শাখায় বিশেষজ্ঞ দার্শনিকদের মধ্যে ৮৬.৭৮ শতাংশ দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন। এবং ১৩.২২ শতাংশ দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এই গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, একজন দার্শনিক যদি ধর্মের দর্শন বা স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষের যুক্তিগুলো নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করে তাহলে তার আস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং, এই গবেষণার ফলাফল নাস্তিকদের উল্লিখিত যুক্তির বিপক্ষেই কথা বলে।

নাস্তিকদের যুক্তিটির প্রথম প্রেমিস (P1) হলো, যদি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে দার্শনিকদের ঐকমত্য থাকে, অথবা অধিকাংশ দার্শনিক যদি নাস্তিক হয়, তাহলে নাস্তিকতা সত্য। দ্বিতীয় প্রেমিস (P2) নাস্তিক্যবাদের পক্ষে অধিকাংশ দার্শনিকদের ঐকমত্য রয়েছে।

কোনো দাবির সত্যতা, বৈধতা, বা যৌক্তিকতার ভিত্তি হিসেবে যদি যদি ন্যায্যতা বা প্রমাণের পরিবর্তে যদি অধিকাংশের মতামত বা বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সে দাবিটির সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় মূলত কু-যুক্তি। তাই নাস্তিকদের যুক্তিটির প্রথম প্রেমিস এবং দ্বিতীয় প্রেমিস বৈধ নয়। যুক্তিবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী প্রেমিস (P) যদি ভুল হয় তবে সিদ্ধান্ত (C) ভুল হতে বাধ্য। তাই নাস্তিকদের যুক্তিটির সিদ্ধান্ত (C) 'নাস্তিকতা সত্য' এটিও সত্য নয়।

স্রষ্টাবিহীন জীবন

মানুষ এই মহাবিশ্বের একমাত্র জীব, যারা নিজ অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে; আমি কে? আমি এখানে কেন? আমার গন্তব্য কোথায়? এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা থাকুক বা না থাকুক, একটি সত্য অনিবার্য–আমরা এবং এই মহাবিশ্ব দুটিই একদিন বিলীন হবে। এই জীবন, যেন একটি ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গ যা প্রদর্শিত হয়, ঝলমল করে ওঠে, সাময়িক আলো ছড়ায়, এবং শেষে চিরতরে হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিটি নক্ষত্র, ছায়াপথ দূরে সরে যাচ্ছে, আর একদিন এই প্রসারণের শেষ পরিণতি হবে অন্ধকার। সমস্ত কিছু বিলীন হবে ব্ল্যাকহোলে, যেখানে কোনো আলো থাকবে না, কোন তাপ থাকবে না, জীবন হারাবে তার স্পন্দন। থাকবে কেবল মৃত নক্ষত্র, মৃত ছায়াপথ, সর্বদা সীমাহীন অন্ধকারের বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপে ঢাকা এক মহাবিশ্ব! তাই শুধু প্রতিটি ব্যক্তির জীবনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেনা, সমগ্র মহাবিশ্বই ধ্বংস হবে।

যদি এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা না থাকে, তবে আমাদের অস্তিত্ব যেন মৃত্যুর দিকে ধাবমান এক শূন্যগামী যাত্রা। আমরা কেবল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মতোই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি! এই মৃত্যুর পরিণতি কী? কোন পরিণতি নেই! এই জীবনের বাইরে কিছু নেই, না কোনো পরকাল, না কোনো পরিণতি, না কোনো আশা। মৃত্যুর পর, আমাদের অস্তিত্ব শেষ হবে মাটির সাথে মিশে গিয়ে। এই বিশ্বাসই যদি চূড়ান্ত সত্য হয়, তবে জীবনের পরমার্থ কী? কোথায় এর মূল্য, কোথায় এর উদ্দেশ্য? যদি জীবনের একমাত্র অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু হয়, তবে,দুর্দশা ভরা এই জীবনের পর আর কোনো সুখের আশা নেই, কোন অর্থ নেই, মূল্য নেই, উদ্দেশ্য নেই! জীবনের কোনো চূড়ান্ত তাৎপর্য নেই! এহেন বিশ্বাসের ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, জীবনের সুখময়তা একটি মরীচিকা হয়ে ওঠে। এর অর্থ যেন হারিয়ে যায়। মূল্যবোধ আর উদ্দেশ্যহীন এই জীবনের শেষ ঠিকানা শূন্যতা আর গভীর হতাশা।

আশাহীন জীবন

আশা–একটি ছোট্ট শব্দ, কিন্তু এর গভীরতা অসীম। এটি এমন এক অনুভূতি, যা আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলার সাহস জোগায়। আশা বলতে বোঝায় সেই আকাঙ্ক্ষা, যে কোনো ভালো কিছু ঘটবে। আমরা সবাই জীবনে সুখ, শান্তি, এবং আনন্দময় মুহূর্তের প্রত্যাশা করি। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আমরা আলোর আশা করি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু এখানেই থেমে থাকে না; আমরা চাই এমন এক জীবনের, যেখানে চূড়ান্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা চাই অন্যায়কারী তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করুক। আমরা কল্পনা করি এমন এক জায়গা, যেখানে ন্যায়ের মশাল জ্বলবে অনন্তকাল। কিন্তু নাস্তিকতার দর্শনে স্রষ্টার ধারণা অস্বীকৃত হওয়ায় এই আশা ভেঙে যায়। এই দর্শন পরকালের ধারণাকেও অস্বীকার করে। ফলে, অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে কোনো আলোর প্রত্যাশা থাকে না। যা কিছু রয়েছে, তা শুধুই এই জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৃত্যুই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এর পরে আর কিছু নেই।

জীবনের অসম ব্যাখ্যা

কল্পনা করুন, আপনি এক তৃতীয় বিশ্বে জন্মেছেন। দারিদ্রের নিষ্ঠুর চাপে পুরো জীবন কেটেছে অনাহার, অপমান আর অবহেলায়। সেই জীবনে আপনি কি আশার আলো দেখবেন? নাস্তিকতার দর্শন অনুযায়ী, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুই সব কিছুর চূড়ান্ত সমাপ্তি। পরকাল বলতে কিছু নেই! মৃত্যুর মাধ্যমেই একটা জৈবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে! এহেন দুর্দশা এই ভরা জীবনের পর আর কোনো সুখের আশা নেই। একটি বিলাসবহুল জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং একটি দুঃখ-কষ্টময় জীবনের প্রতিটি ক্ষত; উভয়ের ফলাফল যদি একই হয়, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি কি জীবনকে অর্থহীন করে না? এই দর্শন হাজী মুহাম্মদ মহসিনের দানশীল জীবন এবং হিটলারের ধ্বংসাত্মক জীবনকে একই পাল্লায় মাপতে বাধ্য করে।

ন্যায়ের অন্বেষা

বিশ্বজুড়ে কত মানুষ তাদের প্রাপ্য বিচার না পেয়েই মৃত্যু বরণ করেছে। যারা নিজেদের চোখের সামনে প্রিয়জনের নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখেছে, তাদের জন্য কি নাস্তিকতার দর্শনে কোনো চূড়ান্ত ন্যায়বিচার অপেক্ষা করে? নাৎসি বাহিনীর হাতে ৬০ লক্ষ ইহুদির করুণ পরিণতির কথা ভাবুন। নাস্তিকতার দর্শন অনুসারে, সেই সকল নির্যাতিত মানুষের জন্য আর কিছুই নেই, বিচারের কোনো আশা নেই। মৃত্যুই তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি। তাহলে, আশাহীন এক জীবনে আমাদের উদ্দেশ্য কী? জীবন কি শুধু ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নাম? নাকি আমাদের গভীরে কোথাও সত্য আর ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা–এক চিরন্তন আশার প্রদীপ–জ্বলতে থাকে, যা মৃত্যুর পরেও কোনো সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় থাকে?

নাস্তিকতার এই দর্শনকে ইসলামের সাথে তুলনা করুন। আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃখ-কষ্টের পেছনে আল্লাহ তা'আলার মহৎ কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট সম্পর্কে অবগত এবং তিনি এর প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

"আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না"।[৫৫]

"আর তোমরা নিরাশ হয় ও বিষণ্ন হয় এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমাদের বিজয়ী হবে"।[৫৬]

আল্লাহ শুধু মাত্র দুনিয়াতেই দুঃখ দুর্দশার বিনিময়ে কল্যাণ দান করেন না। বরং আখিরাতেও পুষিয়ে দেয়। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করা এক জান্নাত যাত্রীকে এক পলক জান্নাত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, "হে আদম সন্তান, কখনো কি কষ্ট দেখছ কি? জীবনে কখনো দুঃখ দুর্দশায় ছিলে?" সে বলবে, "প্রভু কক্ষনো না! আল্লাহর কসম,"আমি জীবনে কখনো কষ্ট পাইনি। কখনো দুর্দশা দেখিনি"।[৫৭]

ইসলাম সবাইকে চূড়ান্ত সুবিচারেরও নিশ্চয়তা প্রধান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে

---

[৫৫] সূরা ইউসুফ: ১২:৮৭

[৫৬] সূরা আলে-ইমরান: ৩:১৩৯

[৫৭] সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী), হাদিস:৬৯৮১ [মূলঃ ২৮০৭]

তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে"।[৫৮]

স্রষ্টাহীন জীবনের মূল্যবোধের সংকট

এই জৈবিক জীবনের সমাপ্তি যদি নিঃশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঘটে, যদি কোনো পরকাল না থাকে, যদি কোনো স্রষ্টা না থাকে, তবে জীবনের উদ্দেশ্য কী? এমন এক দুনিয়ায় হাজী মুহাম্মদ মহসিন কিংবা হিটলার–দুজনের জীবনের কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকে না। কারণ শেষের গন্তব্য একটাই: এক অন্ধকার শূন্যতা, যেখানে বিচার কিংবা মূল্যবোধের কোনো অস্তিত্ব নেই। স্রষ্টাবিহীন দুনিয়ায় হিটলারের কর্মকাণ্ড আর হাজী মুহাম্মদ মহসিনের মহানুভবতা–উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এখানে ভালো-মন্দের কোনো নিরপেক্ষ মানদণ্ড নেই। স্রষ্টাহীন এক পৃথিবীতে কে বলবে যে, একজন হিটলারের মূল্যবোধ একজন হাজী মুহাম্মদ মহসিন এর মূল্যবোধের চাইতে ভালো? সবকিছুই আপেক্ষিক, ব্যক্তি-স্বার্থনির্ভর। হিটলার এবং হাজী মুহাম্মদ মহসিনের জীবনকে বিচার করার কোনো ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ড স্রষ্টাবিহীন দুনিয়ায় নেই।

শূন্যতার গাণিতিক সমীকরণ

যদি জীবনকে একটি সরল অঙ্কের সাথে তুলনা করা হয়, এবং মৃত্যুই যদি এর চূড়ান্ত সমাপ্তি হয়, তবে সেই অঙ্কের ফলাফল হবে শূন্য। এমন এক বাস্তবতায়, যেখানে সুখ আর ক্ষমতা অর্জনই মূল লক্ষ্য, সেখানে একজন মানুষ কেন কষ্টস্বীকার করে ন্যায়ের পথে চলবে? কেন সে শোষিত হবে, যখন সে নিজেই শোষক হতে পারে?

মানুষ স্বভাবত সুখপ্রিয়। সে চায় ভোগ করতে, চায় সুখী হতে, চায় ক্ষমতা পেতে। তাই, এই দর্শনে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলবে; জীবনকে যতদিন সম্ভব উপভোগ করব। আমার সুখের জন্য যা দরকার, তাই করব। ক্ষমতা থাকলে শোষণ করব, ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের সম্পদ কেঁড়ে নিবো, যৌন ক্ষুধা জাগলে তা নিবারণের জন্য মেয়েদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করবো। এবং আমার ইচ্ছা পূরণে যা যা প্রয়োজন তা করতে কোনো বাধা মানব না। যদি এতে মৃত্যু আসে, তাও পরোয়া নেই। কারণ মৃত্যুর পর তো আর কোনো জবাবদিহিতা নেই। জীবনকে যদি উপভোগ না করতে পারি তাহলে জীবনে ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। ভোগান্তিতে থাকা একজন মানুষের জন্য যেমন কেবল শূন্যতা অপেক্ষা করছে আমার জন্যও একই।

দুঃখের মুখোমুখি জীবন

এই দর্শন অনুযায়ী, দুঃখ-কষ্টের জীবনকে গ্রহণ করা একেবারেই নিরর্থক। সুখহীন এক জীবন, যেখানে সংগ্রামের পরিণতিও শূন্য, সেখানে আত্মহত্যা কি অধিক যুক্তিসংগত নয়? জীবনকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হলে, দুঃখের ভারে আকীর্ণ জীবন কাটানোর থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে হতে পারে। এমন এক বিশ্বাসে মূল্যবোধের জায়গা কোথায়? সেখানে মানবিকতা, ন্যায়বিচার, কিংবা অপরের প্রতি শ্রদ্ধার কোনো স্থান নেই। বরং সবকিছুই হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিচায়ক। শক্তি, ক্ষমতা, এবং সুখ অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং, এমন দর্শনে কিছুতেই মূল্যবোধের আশা করা যায় না। স্রষ্টাহীন এক পৃথিবী মূল্যবোধের সংজ্ঞাকে বিলীন

---

[৫৮] সূরা আয-যিলযাল; ৯৯:৬-৮

করে দেয়। জীবন সেখানে হয়ে উঠে নিছক শূন্যতার সমীকরণ। আর সেই শূন্যতাই ধীরে ধীরে গ্রাস করে প্রত্যাশা, আশ্রয় এবং মানবিকতার শেষ চিহ্ন।

উদ্দেশ্যহীন জীবন

জীবনের শেষ প্রান্তে যদি মৃত্যুই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য হয়, তবে এই জীবনের উদ্দেশ্য কী? সমস্ত কিছুই কি তবে নিছক অর্থহীন? মানবজাতি কি কেবল এক উদ্দেশ্যহীন মহাবিশ্বে উদ্দেশ্যহীন পথের পথিক? স্রষ্টাহীন এক জগৎ কি আমাদের এমন এক শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে জীবন কেবল একটি দুর্ঘটনা, আর মৃত্যু তার স্বাভাবিক গন্তব্য?

নাস্তিক দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্সের ভাষায়, "যদি মহাবিশ্ব কেবল ইলেকট্রন এবং স্বার্থপর জিনের সমষ্টি হতো, তবে এমন অর্থহীন দুর্ঘটনা যেমন বাস দুর্ঘটনা, তা ঠিক ততটাই স্বাভাবিক হতো যেমন অর্থহীন সৌভাগ্য। সেখানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বা উদ্দেশ্যের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। একটি মহাবিশ্ব যেখানে অন্ধ শারীরিক শক্তি এবং জেনেটিক প্রতিলিপি কাজ করে, সেখানে কিছু মানুষ আঘাত পাবে, অন্যরা ভাগ্যবান হবে, এবং এতে কোনও যুক্তি বা ন্যায্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা যে মহাবিশ্বটি পর্যবেক্ষণ করি, তা সঠিকভাবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রকাশ করে যা প্রত্যাশিত হয় যদি এর অন্তরে কোনও নকশা, উদ্দেশ্য, মন্দ বা ভাল কিছুই না থাকে, শুধুমাত্র অন্ধ, নির্মম উদাসীনতা।"[৫৯]

অবক্ষয়ের প্রান্তে মানবিকতার সংকট

এমন এক মহাবিশ্বে, যেখানে জীবনের শেষে শুধুই শূন্যতা বিরাজ করে, সেখানে কেন কেউ মানবিক হবে? কেন সে ত্যাগ করবে, আত্মোৎসর্গ করবে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে? বরং, কেন সে হিটলারের মতো জীবন যাপন করবে না? শক্তির অধিকারী হয়ে কেন সে অন্যদের শোষণ করবে না? কীসের আশায়? কোন উদ্দেশ্যে? যে জীবনের কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই, সেখানে স্বার্থপরতা কিংবা অমানবিকতার জন্য কী বাধা রয়েছে? তাহলে প্রশ্ন জাগে–জীবনের কি আসলেই কোনো উদ্দেশ্য নেই? কেন আমরা এখানে এসেছি? আমাদের গন্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর কি কেবল শূন্যতায় নিহিত?

উদ্দেশ্যহীনতার মায়া ভেদ করে

জীবন অর্থহীন হতে পারে না। কারণ প্রতিটি সৃষ্টিরই একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য কখনো গভীর, কখনো সরল, কিন্তু তা সবসময় বিদ্যমান। স্রষ্টাহীন জীবনের দর্শন হয়তো উদ্দেশ্যহীনতার বিভ্রান্তি তৈরি করে, কিন্তু বাস্তবতা তা স্বীকার করে না। আমাদের চিন্তা, প্রশ্ন, এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য লুকায়িত। জীবনের আসল সত্য খুঁজে পেতে আমাদের প্রয়োজন গভীর উপলব্ধি, কারণ উদ্দেশ্যহীনতার মায়া কখনোই বাস্তবের স্থায়ী উত্তর হতে পারে না।

বলুন তো, আপনি কেন এই বইটি পড়ছেন? এর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য নেই? অবশ্যই আছে! এই বইটি পড়ার মাধ্যমে আপনি জ্ঞান অর্জন করছেন। একটি বই যা সম্পূর্ণরূপে জড়বস্তু, যার নেই কোনো অনুভূতি, চিন্তার সামর্থ্য কিংবা মানসিক শক্তি নেই তবুও তার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটি হলো, পাঠককে জ্ঞানের

---

[৫৯] RICHARD DAWKINS, RIVER OUT OF EDEN A Darwinian View of Life, Page: 149-150

আলোয় আলোকিত করা। এখন ভাবুন, যদি এই জড়বস্তুরই একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তবে মানবজাতি, যা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান সত্তা, তাদের জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই–এই ধারণা কি কখনো যুক্তিসংগত হতে পারে? মানুষ, যার হৃদয়ে অনুভূতি, মনে চিন্তা এবং আত্মায় গভীর উপলব্ধি রয়েছে, তার জীবন কি নিছকই উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? এ ধরনের যুক্তি জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

যুক্তিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Logic'। এই শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Logike থেকে। গ্রীক ভাষায় Logike শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ। Logos শব্দের অর্থ চিন্তা, অনুমান। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে চিন্তা যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখনই তা যুক্তিবিদ্যাতে পরিণত হয়। এই কারণে যুক্তিবিদ্যাকে বলা হয় ভাষায় প্রকাশিত যুক্তিপদ্ধতি বা অনুমান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

যুক্তিবিদ্যার মূল বিষয় হলো অনুমান। অনুমান হলো জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের মানসিক প্রক্রিয়া। যেমন, দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখলে আমরা অনুমান করতে পারি যে সেখানে আগুন লেগেছে। এখানে ধোঁয়া হলো জানা বিষয় আর আগুন লাগা হলো অজানা বিষয় বা অনুমান।

যুক্তিবিদ মিলের মতে, যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান যা সাক্ষ্য বা বিচারের বিচারের মাধ্যমে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত অবস্থানের জন্য জ্ঞান শক্তি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জ্ঞান শক্তির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কতটা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।[৬০]

যুক্তিবিদ্যা এমন এক বাক্যের সমষ্টি যেখানে একটি বাক্য অন্য বাক্য থেকে নিঃসৃত হয় এবং ঐ বাক্যগুলোই নিঃসৃত বাক্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন,

আশ্রয় বাক্যঃ সকল দার্শনিক হলো জ্ঞানী।

আশ্রয় বাক্যঃ ইমাম গাজালি একজন দার্শনিক।

সিদ্ধান্তঃ সুতরাং ইমাম গাজালি একজন জ্ঞানী।

এখানে সিদ্ধান্তটি উপরের দুটি বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তবে নিছক কতগুলো বাক্য মিলে কিন্তু যুক্তি যুক্তি গঠিত হয় না। যুক্তির কিছু নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্য (Premises) ও সিদ্ধান্ত (Conclusion) সম্পর্কে জানতে হবে।

আশ্রয় বচন হলো, যখন একটি বাক্য যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তখনই তাকে আশ্রয় বাক্য বলে। অন্যদিকে, সিদ্ধান্ত হচ্ছে, একটা বাক্য যখন আর্শ্যয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে থেকে নিঃসৃত হয় তখন তাকে সিদ্ধান্ত বলে। অনিবার্য সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্যে থাকা শব্দের উপর ভিত্তি করে আসেনা বরং আশ্রয় বাক্যগুলোর মধ্যকার সম্বন্ধের কারণে এসেছে এবং তা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে নয় বরং অনুমানের মাধ্যমে আসে। আপনি যখন কোনো জিনিস সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন তখন তা আপনার মানসিক অবস্থায় বিরাজমান থাকে। সে ধারণা যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখনই যুক্তি গঠিত হয়। সুতরাং, যুক্তি গঠনের জন্য মানুষের মানসিক বিচারশক্তি বা যৌক্তিক বিচারশক্তি থাকা অপরিহার্য। যুক্তি প্রয়োগ করার প্রথম শর্ত হলো যৌক্তিক বিচার শক্তি থাকা। উপরে যে উদাহরণটি আমরা দিয়েছিলাম তা আবার লক্ষ্য করুন;

আশ্রয় বাক্যঃ সকল দার্শনিক হলো জ্ঞানী।

আশ্রয় বাক্যঃ ইমাম গাজালি একজন দার্শনিক।

---

[৬০] যুক্তিবিদ্যা সাধারণ ও প্রতীকী; পৃষ্টা নং: ২

সিদ্ধান্তঃ সুতরাং ইমাম গাজালি একজন জ্ঞানী।

এখানে আশ্রয় বাক্যগুলো থেকেই সিদ্ধান্ত এসেছে। অর্থাৎ এই বাক্যগুলো সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে, সিদ্ধান্ত বাক্যটি অনিবার্যভাবেই নিঃসৃত হয়েছে। কারণ এখানে 'ইমাম গাজালি একজন জ্ঞানী' এটার পরিবর্তে 'পাখিরা আকাশের উড়ে' এটা বলা যাবে না।

যুক্তিবিদ্যার প্রকরণ

যুক্তিবিদ্যা দু'প্রকার। ১) অবরোহ (Deductive) ২) আরোহ (Inductive). যে যুক্তিতে সিদ্ধান্ত এক বা একাধিক যুক্তিবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্ত কখনোই যুক্তি বাক্য থেকে ব্যাপকতর হতে পারে না; সেই যুক্তিকে অবরোহ (Deductive) যুক্তি বা অনুমান বলে। যেমন;

আশ্রয় বাক্যঃ সকল মানুষ হয় মরণশীল।

আশ্রয় বাক্যঃ মিস্টার রহিম একজন মানুষ।

সিদ্ধান্তঃ সুতরাং, মিস্টার রহিম মরণশীল।

এখানে যুক্তি বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য থেকে ব্যাপকতর নয়। অর্থাৎ, এই যুক্তি বাক্য বা প্রেমিসগুলো থেকে সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র "মিস্টার রহিম মরণশীল" এটাই আসবে অন্য কিছু আসবেনা। এই যুক্তিতে যেহেতু আশ্রয় বাক্যের সাথে সিদ্ধান্তের একটা অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে তাই যুক্তি বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সত্য বা বৈধ হতে বাধ্য। এবং যুক্তিবাক্য যদি মিথ্যা হয় তাহলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা বা অবৈধ হতে বাধ্য।

অন্যদিকে, যে অনুমানে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য গঠন করা হয় তাকে আরোহ যুক্তি বা অনুমান বলে।

যেমন;

আশ্রয় বাক্যঃ এশিয়ার সব রাজহাঁস সাদা।

আশ্রয় বাক্যঃ আমেরিকার সব রাজহাঁস সাদা।

আশ্রয় বাক্যঃ ইউরোপের সব রাজহাঁস সাদা।

সিদ্ধান্তঃ সুতরাং, ইউরোপের সব রাজহাঁস সাদা।

এখানে আমরা এশিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের রাজহাঁসগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি, পৃথিবীর সকল রাজহাঁস নয়। অর্থাৎ, আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টনান্তের পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে সেগুলো সব সাদা। এবং এই বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পৃথিবীর সকল রাজহাঁস সাদা। এই যুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ পর্যবেক্ষণ পরিবর্তন হলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে। তাই এই যুক্তিগুলো সম্ভাবনামূলক। আমরা যদি কখনোই কালো বা অন্য কোনো রং এর রাজহাঁস দেখতে পাই তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা হবে।

যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতি

যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতি হলো এমন কিছু মৌলিক নীতি বা আইন যা যুক্তিবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই মৌলিক নীতিগুলো সার্বজনীন এবং যে কোনো যুক্তি

গঠনে এগুলো প্রয়োজন। যুক্তিবিদ্যার তিনটি সর্বাধিক স্বীকৃত আইন হলো,

1. The Law of Identity: A thing is identical to itself. (A = A)

ল অফ লজিকের প্রথম সূত্র 'ল অফ আইডেন্টিটি' অনুযায়ী যে কোনো জিনিস একই সাথে একই সময়ে একটি মাত্র অবস্থানে থাকতে পারে। যেমন, তুষার (snow) কখনো মেঘ (cloud) হতে পারে না। অথবা, x= x হবে। কখনোই x= y হবেনা। অর্থাৎ কোনো জিনিস একই সাথে বৈপরীত্য ধারণ করতে পারে না।

2. The Law of Non-Contradiction: Something cannot be both true and false at the same time and in the same sense. A proposition and its negation cannot both be true. A (A and ~A)

ল অফ লজিকের দ্বিতীয় সূত্র 'ল অফ নন কন্ট্রাডিকশন' অনুযায়ী কোনো কিছু একই সাথে সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না। যেমন, A একই সাথে, একই সময়ে সত্য, আবার মিথ্যা হতে পারে না। হয় সত্য হবে, অন্যথায় মিথ্যা হবে।

3. The Law of the Excluded Middle: A statement is either true or false. There is no middle ground or third option. A statement and its negation must be mutually exclusive. (A or ~A)

ল অফ লজিকের তৃতীয় সূত্র 'ল অফ এক্সক্লুডেড মিডল' অনুযায়ী কোনো কিছু হয় সত্য হবে না হয় মিথ্যা হবে কিন্তু এর মাঝামাঝি অবস্থানে থাকতে পারে না। যেমন, A= a হবে অন্যথায় A= ~A হবে। এর মাঝামাঝি কোনো অবস্থানে থাকতে পারবে না।

যুক্তিবিদ্যার এই মৌলিক নিয়মগুলো গণিত, দর্শন, কম্পিউটার সায়েন্স সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর ও রহস্যময় প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি হলো—এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে হলো? অগণিত গ্যালাক্সি, রহস্যময় ব্ল্যাকহোল, ঝলমলে নক্ষত্র আর তাদের ঘিরে ঘুরে চলা গ্রহসমূহ আমাদের এতোটাই মুগ্ধ করে যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই—কীভাবে সম্ভব হলো এই বিস্ময়কর সৃষ্টি? মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বগুলোর একটি হলো 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহা-বিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই মহাবিশ্ব। এক বিন্দুর মধ্যেই নিহিত ছিল সমস্ত শক্তি ও উপাদান; যা আজকের এই অসীম মহাবিশ্বের রূপ ধারণ করেছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব

বিগ ব্যাং তত্ত্ব হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে সফল এবং সর্বাধিক গৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্বের বর্তমান ও অতীত সকল স্থান-কাল-শক্তি-পদার্থ-পদার্থের নিয়ম সবকিছুই একই সময়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে সমস্ত পদার্থ অসীম ঘনত্ব এবং তীব্র তাপ সহ একটি বিন্দুর মধ্যে সংকুচিত ছিল যাকে সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। পরবর্তীতে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারিত হতে শুরু করে এবং এভাবেই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে।

বর্তমান পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী সময়ের নিখুঁত শুরুর পর্যায় হলো প্ল্যাংক যুগ। অর্থাৎ, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর কার্যকারিতা লাভ করে। মহাবিশ্বের ইতিহাসের ন্যূনতম বোধগম্য অংশও এটি। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর থেকেই আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি। প্ল্যাঙ্ক যুগ বলতে বিগ ব্যাং এর পর ০ থেকে ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়কে বুঝানো হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুযায়ী এই সময়ের আগে একটি মহাকর্ষীয় এককতা প্রস্তাব করে (যদিও এটি কোয়ান্টাম প্রভাবের কারণে ভেঙে যেতে পারে), এবং এটি অনুমান করা হয় যে চারটি মৌলিক শক্তি (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, দুর্বল পারমাণবিক বল, শক্তিশালী পারমাণবিক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ) সব একই শক্তি, এবং সম্ভবত একটি মৌলিক শক্তিতে একীভূত।[৬১] গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক, ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড থেকে ১০$^{-৩৬}$ সেকেন্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অন্যান্য মৌলিক শক্তি (যা একীভূত ছিল) থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং প্রথম দিকের প্রাথমিক কণা (এবং প্রতিকণা) তৈরি হতে শুরু করে।[৬২] গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর প্রায় ১০$^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর থেকে মূলত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়।

পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, যদি আমরা মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে আমরা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং এন্টি ইলেকট্রন (পজিট্রন) এর সমুদ্র দেখতে পাবো যা ১০ বিলিয়ন ডিগ্রি (K) উত্তপ্ত। তারপর ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব শীতল হয়, নিউট্রনগুলো প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো

[৬১] https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_bigbang_timeline.html
[৬২] https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_bigbang_timeline.html

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে ডিউটেরিয়াম তৈরি করে।[৬৩] $১০^{-৩৬}$ সেকেন্ড থেকে $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড এর সময়কে মুদ্রাস্ফীতি যুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ে শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তির পৃথকীকরণের ফলে, মহাবিশ্ব একটি অত্যন্ত দ্রুত সূচকীয় প্রসারণের মধ্য দিয়ে যায়, যা মহাজাগতিক স্ফীতি নামে পরিচিত।[৬৪] এভাবে বিভিন্ন পর্যায়কাল অতিক্রম করেই আমরা বর্তমান মহাবিশ্ব পেয়েছি। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ নীতি অনুযায়ী এটি অসীম নয়। বরং, এটি স্থানিক এবং অস্থায়ীভাবে সীমিত।[৬৫]

১৯২৭ সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ ও খ্রিষ্টান ধর্ম যাজক জর্জ লেমেটার প্রস্তাব করেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একটি আদি অবস্থা থেকে শুরু হয়েছিল। সেই আদি অবস্থা ছিল একটি আদি পরমাণু বা Primeval atom. লেমেটার বলেন, যেহেতু নক্ষত্রগুলো একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অতীতের দিকে ফিরে গেলে দেখা যাবে একপর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ একত্রে ঘনীভূত অবস্থায় বিরাজমান ছিল। সুতরাং, মহাবিশ্ব সবসময় অস্তিত্বশীল ছিল না। বরং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্বে এসেছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। লেমেটারের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানমহলে তখন খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, লেমেটার ধর্মীয় কারণের এমন ব্যাখ্যা প্রধান করেছে। কেননা, লেমেটারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মহাবিশ্ব অস্তিত্বের জন্য একটা শুরু আছে। এবং অস্তিত্বে আসার জন্য যা কিছুর শুরু থাকে তা অস্তিত্বে আসার জন্য কারণ থাকাটা অনিবার্য। যা-কিনা সৃষ্টিকর্তার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ সিঙ্গুলারিটির আগে যেহেতু স্থান-কাল-পদার্থ-শক্তি কিছুই ছিলোনা তাই যে Cause বা কারণ মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছে তা হবে বস্তুজগতের বাহিরের অতিপ্রাকৃতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা। মহাবিস্ফোরণের পরেই স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্রের উদ্ভব হয়েছে।[৬৬]

সে-কারণে নাস্তিক পদার্থবিদগণ প্রবলভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং বিকল্প হিসেবে Steady State Theory (অটল মহাবিশ্ব মডেল) দাঁড় করিয়েছিলো। তাদের প্রস্তাবিত বক্তব্য অনুযায়ী মহাবিশ্বেও কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। প্রায়ই সকল বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের সাথে একমত ছিল। পরবর্তীতে হাবল টেলিস্কোপে পাওয়া মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, ইত্যাদি আবিষ্কার হলে কসমোলজির ধারণায় প্যারাডাইম শিফট নিয়ে আসে। তা হলো এই মহাবিশ্বের সূচনা রয়েছে। বিজ্ঞানী আইন্সটাইনও মহাবিশ্ব প্রসারণের ব্যাপারটি প্রথমে মানতে চাননি। কিন্তু প্রসারণের পক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রমাণ পাওয়ার পর তিন বলেছিলেন এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত।[৬৭]

ফ্রেড হয়েল বিবিসি রেডিওর এক অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য করে এই তত্ত্বের নাম দিয়েছিলো 'বিগ ব্যাং'। কারণ, সৃষ্টির শুরুতে এমন কোনো বিন্দু থাকলে মহাবিশ্বের শুরু কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার নির্ধারণের ভার ধর্ম আর স্রষ্টার হাতে চলে যাবে।[৬৮]

---

[৬৩] https://science.nasa.gov/universe/the-big-bang/
[৬৪] https://science.nasa.gov/universe/the-big-bang/
[৬৫] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:103
[৬৬] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:128-149
[৬৭] ডা.রাফান আহমেদ; হোমো স্যাপিয়েন্স; পৃঃ ২৫
[৬৮] স্টিফেন হকিং, মাই ব্রিফ হিস্ট্রিঃ আত্মস্মৃতি (বঙ্গানুবাদ, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশন ২০১৯) পৃঃ৮০

পরবর্তীতে বিজ্ঞানী এডুইল হাবল সর্ব প্রথম লেমেটারের দাবির পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নিয়ে আসে। তিনি 'রেড লাইট শিফট' ও 'ডপলার ইফেক্ট' এর মাধ্যমে আবিষ্কার করেন যে, দূরবর্তী ছায়াপথ সমূহের বেগ সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এরা পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ,মহাবিশ্ব ক্রমশই সম্প্রাসারণ হচ্ছে। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী সমগ্র মহাবিশ্ব একটি সুপ্রাচীন তত্ত্ব বা আদি পরমাণু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে।

Red light Shift (রেড লাইট শিফট)

রেড লাইট শিফট দ্বারা আলোর তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন বর্ণনা করে। যা নির্ভর করে কোনো বস্তু আমাদের দিকে বা দূরে সরে যাচ্ছে। যখন কোনো বস্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তখন বস্তুর আলোকে রেড শিফট বলা হয়। সূর্যের বর্ণালিতে দৃশ্যমান আলোর পরিসীমা রয়েছে। সেখানে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানো মিটার এবং নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪০০ ন্যানো মিটার। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি কোনো বস্তু থেকে লাল আলো বিকিরিত হলে সেই বস্তুটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ, কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তাহলে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হবে। যার ফলে গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তাহলে তা থেকে নীল আলোর দেখা মিলবে। একে বলে ব্লু-শিফট। অন্যদিকে, কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তা-থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় হতে থাকবে। যার ফলে, গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তা থেকে লাল আলোর দেখা মিলবে। যাকে বলে রেড-শিফট।

হাবল আবিষ্কার করেন যে গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি সে গ্যালাক্সি তত বেশি বেগে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার ফলে লাল আলো নিঃসৃত হয়। যদিও হাবলের আগেই জর্জ লেমেটার এই তত্ত্বের ব্যাপারে আমাদের জানিয়েছিলো।[৬৯]

Doppler Effect (ডপলার ক্রিয়া)

উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির কারণে কোন তরঙ্গ-সংকেতের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ডপলার ক্রিয়া (Doppler Effect) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ওয়াইফাই রাউটারের যত কাছে থাকবেন তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণ করতে পারবেন। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে আপনার যতই কাছে আসবে ততই কম্পাঙ্ক বেশি হবে। অর্থাৎ, উৎস কাছে আসলে কম্পাঙ্ক বাড়ে। এবং উৎস দূরে গেলে কম্পাঙ্ক কমে। ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী উৎস যখন শ্রোতা থেকে দূরে সরে যাবে তা রক্তিম আলো অপসারণ করবে আর যখন শ্রোতার দিকে চলে আসবে তখন নীল আলো অপসারণ করবে। হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণ পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, গ্যালাক্সিগুলো নীল আলো অপসারণ না করে লাল আলো অপসারণ করছে। যা রেড শিফট এর মাধ্যমেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

---

[৬৯] Helge Kragh (1996), Cosmology and Controversy (Princeton University press) Page;30

CMBR: Cosmic microwave background radiation

১৯৬৫ সালে আমেরিকান জ্যোতিবিজ্ঞানি আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইনসন CMB/CMBR আবিষ্কার করেন। এটি মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায় থেকে মহাবিশ্বের সমস্ত স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেহেতু, মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আসা কোনো তরঙ্গকে বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করতে পেরেছিলো, তার মাধ্যমে মহাবিশ্বের বয়স সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। CMBR হলো, বিগ ব্যাং উৎপত্তির পক্ষে সবচেয়ে যুগান্তকারী প্রমাণ। Doppler Effect, Red light shift, CMBR এগুলো প্রমাণ করে আমাদের মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে সিঙ্গুলারিটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

সিঙ্গুলারিটি

পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী সিঙ্গুলারিটি এমন একটি বিন্দু যার অসীম মান রয়েছে। যেহেতু প্রকৃতিতে কোনো কিছুই অসীম পরিমাণে ঘটতে পারেনা, বা অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই সিঙ্গুলারিটিকে বাস্তব বলে মনে করে না।[৭০]

স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি এবং নিউইয়র্ক সিটির ফ্ল্যান্টিরন ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পল এম সাটার এর মতে, "সিঙ্গুলারিটি দিয়ে ফিজিক্যাল কিছু প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং, যখন তারা গণিতে উপস্থিত হয়। তারা (সিঙ্গুলারিটি) আমাদের বলছে যে আমাদের পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে।..........সহজ করে বললে, সিঙ্গুলারিটি হল এমন জায়গা যেখানে গণিত "দুর্ব্যবহার করে", সাধারণত অসীম বড় মান তৈরি করে। পদার্থবিজ্ঞান জুড়ে গাণিতিক এককতার (সিঙ্গুলারিটির) উদাহরণ রয়েছে: সাধারণত, যে কোনো সময় একটি সমীকরণ 1/X ব্যবহার করে, X যখন শূন্যে যায়, সমীকরণের মান অসীম হয়ে যায়"।[৭১]

টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এর মতে, "সাধারণভাবে, সিঙ্গুলারিটি হল একটি ত্রুটিপূর্ণ ভৌত (ফিজিক্যাল) তত্ত্বের অ-ভৌতিক (নন-ফিজিক্যাল) গাণিতিক ফলাফল"।[৭২]

পদার্থ বিজ্ঞানে সিঙ্গুলারিটি বলতে বুঝায়, যে জায়গায় পদার্থের নিয়ম কাজ করে না, গণিত অনুসরণ করা যায় না তাকেই সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। গণিতের ক্ষেত্রে আমরা যদি 1/X দিয়ে ভাগ করি এবং X এর মান যদি হয় 0, অর্থাৎ 1/0= অমীমাংসিত বা অসংজ্ঞায়িত। গাণিতিকভাবে এটাকে সিঙ্গুলারিটি হিসেবে ধরা যায়। আমাদের মহাবিশ্বের দুইটা বিন্দু রয়েছে যাকে বিজ্ঞানীরা সিংগুলারিটি বলে থাকে। ১. ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র। ২. বিগ ব্যাং এর উৎস।

সুতরাং, বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি বলতে কখনোই ফিজিক্যাল রিয়েলিটি কে বোঝাই না কেননা এটা ভ্যারিফায়েবল নয় এবং প্রেডিক্টেবল কোনো কিছুও না। মর্ডান ফিজিক্সে সিঙ্গুলারিটি কেবল মাত্র একটি গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সিঙ্গুলারিটি হলো একটা ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়া। যদি আমাদের সম্প্রসারিত মহাবিশ্বকে একটি ফোলানো বেলুন হিসেবে কল্পনা করি এবং এর ক্রোনোলজি কে অতীতের দিকে

---

[৭০] "Singularity" simply explained for laypersons with examples & an illustraiton (quantumphysicsladz.org)
[৭১] https://www.livescience.com/what-is-singularity
[৭২] Does every black hole contain a singularity? | Science Questions with Surprising Answers (wtamu.edu)

ঘুরিয়ে দেই তাহলে দেখবো বেলুনের বাতাস ছেড়ে দিলে যেমন বেলুন ধীরে ধীরে চুপসে যেতে থাকে আমাদের মহাবিশ্বের সম্প্রসারিত রূপ তেমনই ভাবে সংকুচিত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে সকল পদার্থ, স্থানকাল একক অদ্বৈত বিন্দুতে উপস্থিত হবে এই থট কে গাণিতিকভাবে এক্সপ্রেস করার সময় সিংগুলারিটি (এককতা) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের তাত্ত্বিক এবং পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ

বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্য যথেষ্ট তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত, হাবলের আবিষ্কার। আমরা যদি কোন বস্তুকে বর্ণালি যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং বস্তুটি যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তাহলে বস্তুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে লাল বর্ণালির। অন্যদিকে যদি বস্তুটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে নীল বর্ণালির। এটি হলো ডফলার ইফেক্ট। ১৯২০ এর দশকে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল লক্ষ্য করেছিলেন যে যে দূরবর্তী ছায়াপথগুলির দ্বারা নির্গত রংগুলি বর্ণালির লাল প্রান্তের দিকে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে।[৭৩] এই পর্যবেক্ষণ মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হওয়ার অনুমানকে সমর্থন করে। হাবলের সূত্র অনুযায়ী ছায়াপথের পর্যবেক্ষণ বেগ আমাদের ছায়াপথ থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, গ্যালাক্সিগুলো যত দূরে থাকে, তত দ্রুত আমাদের থেকে দূরে সরে যায়।

দ্বিতীয়ত, হিলিয়ামের প্রাচুর্যতা। ১৫ বিলিয়ন বছরে নক্ষত্ররা খুব সহজে এত হিলিয়াম তৈরি করতে পারেনি। বিগ ব্যাং তত্ত্ব এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্ব একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ ঘনত্ব এবং উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই পর্যায়টিকে 'প্রথম তিন মিনিট' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং এই সময়টি হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম তৈরির জন্য উত্তম ছিল। তাঁরা এবং ছায়াপথের স্পেকট্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষণ দেখায় যে মহাবিশ্ব প্রায় ৭৫ শতাংশ হাইড্রোজেন এবং ২৪ শতাংশ হিলিয়াম নিয়ে গঠিত। এটি বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭৪]

তৃতীয়ত, মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েব পটভূমি বিকিরণ (CMBR). ১৯৬৪ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন মিল্কিওয়ে থেকে রেডিও নির্গমন অধ্যয়নের জন্য একটি অ্যান্টেনা ব্যবহার করেছিলেন। এভাবে তারা অ্যান্টেনাতে আসা সংকেতের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলেন যে, সংকেত গুলো ২.৭২৫°(K) মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ এর কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, যা বিগ ব্যাং তত্ত্বকে সমর্থন করে। ১৯৮৭ সালে পেনজিয়াস এবং উইলসন এই আবিষ্কারের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জয়ী হয়েছিলেন।[৭৫]

---

[৭৩] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:104
[৭৪] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:104
[৭৫] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:104-105

স্রষ্টার অস্তিত্ব

মানুষের জীবন এবং চিন্তনের ইতিহাস মূলত একটি অন্তহীন অনুসন্ধানের গল্প। সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রাক্কালে মানুষ প্রকৃতির রহস্যময় অন্ধকারে অজানার সন্ধানে ছুটেছে। আদিম গুহাবাসী থেকে শুরু করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানুষ, প্রতিটি যুগে মানুষের কৌতূহল তাকে নতুন জ্ঞানের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অনুসন্ধান ছিল কখনও অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা, কখনও বা স্রষ্টাকে বোঝার আকুলতা। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার চিন্তাবিদরা এ বিষয়ে নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের এই অজানার অনুসন্ধান দৃশ্যমান।

তবে এ জিজ্ঞাসার মূল বিষয় দুটি: আমরা কারা এবং কেন এখানে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ বারবার স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং তাঁর প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। স্রষ্টার ধারণা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সাহিত্যিক রচনায়ও প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্ন শুধু তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা নয়, এটি মানুষের নৈতিকতা, জীবনধারা, এবং বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তাই মানুষ জানতে চাই, এই মহাবিশ্বের জন্ম কোথা থেকে? এর উৎপত্তির পেছনে কি কোনো পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান সত্তার কার্যকলাপ রয়েছে? সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কি কেবল ধারণা, নাকি তা বাস্তব? দুনিয়ার এই জীবন কি সবকিছু, নাকি মৃত্যুর পরেও আরেক জীবনের অস্তিত্ব আছে? মৃত্যু কি পরিসমাপ্তি, নাকি তার ওপারেও কোনো অসীম যাত্রার শুরু?

মানব মনের এই চিরন্তন প্রশ্নগুলো যুগে যুগে কৌতূহল আর অনুসন্ধানের জন্ম দিয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের খোঁজে গড়ে উঠেছে নানা মতবাদ, বিশ্বাস এবং তত্ত্ব। এর মধ্যে অন্যতম দুটি ধারণা হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে এবং বিপক্ষে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে মানব ইতিহাস জুড়ে বিতর্ক চলে আসছে, এবং এর পরিসমাপ্তি হয়তো কখনোই ঘটবে না। আস্তিক ও নাস্তিক উভয় পক্ষই তাদের অবস্থান সমর্থন করার জন্য যুক্তি, তথ্য, এবং প্রমাণ হাজির করেছে। তারা যুক্তি দিয়েছেন মহাবিশ্বের জটিলতা ও সৌন্দর্য কি কেবল দৈবক্রমে তৈরি, নাকি এর পেছনে রয়েছে একটি সুশৃঙ্খল সত্তার নিপুণ সৃজনশীলতা?

এই আলোচনায় আমি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল আলোচিত যুক্তি তুলে ধরব। প্রথমত, 'কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট,' যা মহাবিশ্বের সূচনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, 'নির্ভরশীলতার যুক্তি,' যা এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও ক্রমাগত নির্ভরতার প্রশ্নে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়। মানব মনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের রহস্য উন্মোচনের এই আলোচনায় আমরা যুক্তি ও দর্শনের আলোকে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে পর্যালোচনা করব, যা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক নয় বরং চিরন্তন মানবিক অনুসন্ধানের এক অনন্য অংশ।

কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট

কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট (KCA) বর্তমানে ন্যাচারাল থিওলজিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়। জগৎ বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম আল-গাজালি ছাড়াও অনেক দার্শনিকগণ কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের পক্ষে কথা বলেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, প্লেটো, এরিস্টটল, রেনে ডেকার্ট, ইবনে সিনা, সেন্ট এন্সেলম, সেন্ট থমাস একুইনাস, স্পিনোজা, লাইবনিজ সহ আরো অনেকে। মুসলিম দার্শনিক ইমাম আল-গাজালি কসমোজিক্যাল আর্গুমেন্টকে আধুনিক রূপে (The Kalam Cosmological Argument) সহজভাবেই উপস্থাপন করেছেন। গাজ্জালীর যুক্তি অনুযায়ী, অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার অস্তিত্বের জন্য কারণ (Cause) আছে। আমাদের এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু রয়েছে তাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য কারণ (Cause) রয়েছে। অর্থাৎ, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে হলে তার পিছনে অবশ্যই একটা কারণ থাকতে হবে। সৃষ্ট হওয়া সবকিছুর যদি কারণ থাকে তাহলে কারণেরও কারণ আছে। তবে এই কার্য থেকে কারণ সম্পর্ক হিসেব করতে করতে আমাদের চিন্তাধারা ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে যেতে পারে না। কেননা তখন 'অনবস্থা দোষ' (infinite regress) দেখা দিবে। এই অনবস্থা দোষ হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে কারণের শৃঙ্খল কোনো সমাপ্তি পাবে না এবং এটি আমাদের চিন্তাধারাকে একটি কার্যকর সমাধানে পৌঁছাতে দেবে না। যদি 'অনবস্থা দোষ' দেখা যায় তাহলে কখনোই বর্তমানে আসা সম্ভব না। ইমাম আল-গাজালির মতে, এই কারণ-কার্য শৃঙ্খলকে থামানোর জন্য একটি চূড়ান্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণের অস্তিত্ব আবশ্যক। সেই কারণটি হলো এমন এক সত্তা যা নিজেই কারণহীন, এবং সৃষ্টির উৎস।

প্রেমিস আকারে:

- ❖ P1: Whatever begins to exist has a cause of its beginning. (অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুর আছে তার শুরুর কারণ আছে।)
- ❖ P2: The universe began to exist. (মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু আছে)
- ❖ P3: Therefore, the universe has a cause of its beginning. (অতএব, মহাবিশ্বের শুরুর জন্য একটি কারণ রয়েছ।)

আমেরিকান বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম লেন ক্রেগ প্রথমে ইমাম আল-গাজ্জালীর এই সূত্র গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে ইমাম আল-গাজ্জালীর সূত্রের প্রথম প্রেমিসে পরিবর্তন এনে নতুন মডেলে প্রকাশ করেছেন। ক্রেগের প্রকাশিত মডেলের প্রথম প্রেমিস,

- ❖ P1: If the universe began to exist, the universe has a cause of its beginning.

কালাম কসমোলজির আর্গুমেন্টগুলো সত্য হবে যদি P1 এবং প্রেমিস P2 সত্য হয় এবং উপসংহার যদি প্রেমিস গুলো যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে।

ব্যাখ্যা:

- **P1: whatever begins to exist has a cause of its beginning. (অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুর আছে তার শুরুর কারণ আছে।)**

P1 হচ্ছে 'Principle of sufficient reason' (PSR) এর সংস্করণ। এটি দার্শনিক লাইবনিজ তার কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এটি সজ্ঞাতভাবে সুস্পষ্ট যে অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার কারণ (Cause) আছে। PSR অনুযায়ী সব কিছুর অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত কারণ বা ব্যাখ্যা রয়েছে। এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। এটি 'Principle of sufficient reason বা PSR' এর সংস্করণ। আমরা আমাদের চারপাশে যে-সব জিনিস দেখি যেমন, চেয়ার, টেবিল, গাছপালা, ঘরবাড়ি, ইত্যাদি। এগুলোর কোনো কিছুই চিরকাল অস্তিত্বে ছিলো না। বরং, একটা সময়ে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং কোনো কারণ ছাড়াই এগুলো এমনি এমনি অস্তিত্বে চলে এসেছে এমন দাবিও যৌক্তিক নয়। তাহলে অবশ্যই অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো-না-কোন কারণ প্রয়োজন। তাই কেউ চাইলেই এই ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ।

PSR ইন্ডাক্টিভ মেথড দিয়েও প্রমাণ করা যায়। মানব জাতির ইতিহাসে আমরা অসংখ্য জিনিসের সম্মুখীন হয়েছি। তবে আমরা কখনোই এমন কোন জিনিসের সম্মুখীন হয়নি যা কোনও কারণ ছাড়াই এমনি এমনি অস্তিত্বে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা ইন্ডাক্টিভ মেথডের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার শুরুর কারণ আছে। ধরুন, আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ডিপার্টমেন্টের ক্লাসরুমগুলো কে তৈরি করেছে? জবাবে আপনার বন্ধু বললো, "সব ক্লাসরুম এমনি এমনি অস্তিত্বে এসেছে, কেউ তৈরি করেনি।" এই উত্তর আপনার কাছে অসংগত ও হাস্যকর মনে হবে। কারণ, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বলে যে, প্রতিটি সৃষ্ট জিনিসের পিছনে একটি কারণ থাকে।

কিছু নাস্তিক এখানে দাবি করতে পারে যে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনে ভার্চুয়াল পার্টিকেল কোনো কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে চলে আসতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তারা দেখায় যে, Radio Active Deca বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয় এর বিষয়টি। এই দাবিটা আসলে সত্য নয়। তাত্ত্বিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ ক্যাসলাভ ব্রুকনার কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে কার্যকারণকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ধরুন আপনার সামনে একসারি ডমিনো সাজানো আছে। আপনি যখনই প্রথম ডমিনোটি ফেলে দিবেন তখন আস্তে আস্তে বাকি ডমিনো গুলো পরতে থাকবে একের পর এক। অর্থাৎ, A থেকে B ডমিনো, B থেকে C ডমিনো, C থেকে D এভাবে পরতে থাকবে। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকারণের উদাহরণ। তবে কোয়ান্টাম জগতে A ডমিনোর পতনের ফলে B ডমিনো পরবে নাকি C ডমিনো পরবে তা নির্ধারণ করা যায় না। ডমিনোর পতন A থেকে শুরু হবে নাকি B থেকে শুরু হবে তা অজানা থাকে। তাই কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে কার্যকারণ অনির্ধারিত থাকে বা অজানা থাকে।[৭৬]

রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বলেছে কার্যকারণ তত্ত্ব সব

---

[৭৬] Caslav Brukner Causality in a quantum world. DOI.org/10.1063/PT.6.1.20180328a

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। প্রফেসর ডি আরিয়ানো ২০১৮ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত 'Causality re-established' শিরোনামের এক গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে বলেন, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কার্যকারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি উপপাদ্য এবং এটি ফলসিফায়েবল এবং প্রেডিকশন তৈরি করতে সক্ষম। যার ফলে কার্ল পপারের ডিমার্কেশন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কার্যকারণ সবক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।[৭৭] সুতরাং, 'অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুর আছে তার শুরুর কারণ আছে' এই যুক্তিটি একটি বৈধ যুক্তি বলে বিবেচিত হবে।

- **P2: The universe began to exist. (মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু আছে)**

P2 অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য মহাবিশ্বের শুরু আছে। অধিকাংশ নাস্তিক P2 কে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে। কারণ তারা মনে করে মহাবিশ্ব অসীম। তবে তাদের এ ধারণাটি সঠিক নয়। অস্তিত্বের জন্য মহাবিশ্বের একটা শুরু রয়েছে এমন দাবির স্বপক্ষে যুক্তি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

Deductive argument-1:

প্রকৃত অসীমের অসম্ভবতার (প্রকৃত অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়) উপর ভিত্তি করে এই আর্গুমেন্টটি গড়ে উঠেছে। প্রেমিস আকারে,

- P2. 1.1: An actual infinite cannot exist. (প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না।)
- P2. 1.2: An infinite temporal regress of events is an actual infinite. (কোনো ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস হলে তা প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে)
- P2. 1.3: Therefore, an infinite temporal regress cannot exist. (সুতরাং, অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস থাকতে পারে না।)
- P2. 1.4: Therefore, The Univers began to exist. (সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু রয়েছে)

ব্যাখ্যা;

- **P2. 1.1: An actual infinite cannot exist. (প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না।)**

এই প্রেমিস অনুযায়ী প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না। অসীম বলতে, সীমাহীন, অন্তহীন বা যে কোনো সংখ্যার চেয়ে বড় কিছুকে বুঝায়।ফিলোসফিতে দুই ধরনের অসীম পাওয়া যায়। ১. সম্ভাব্য অসীম (Potential Infinity). ২. প্রকৃত অসীম (Actual Infinity).

সম্ভাব্য অসীম ও প্রকৃত অসীম

সম্ভাব্য অসীম বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো এমন কিছু যা কখনো শেষ হয় না,

---

[৭৭] D'Ariano, G. M. (2018). Causality re-established. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 376(2123), 20170313

যা অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকে। এটি সময়ের প্রবাহের মতো, যা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু কখনো থামে না। যেমন, অসীম সংখ্যক দিন আমাদের সামনে রয়েছে । কিন্তু যদি অসীম না-ও থাকে, তাহলে কেন বলি, অসীম সংখ্যক দিন রয়েছে? কারণ, আমরা জানি যে, একটি দিন শেষ হওয়ার পর আরেকটি দিন যোগ করা যায়। একের পর এক, হাজার, লাখ বা কোটি দিনও যোগ করা সম্ভব, কিন্তু একটি সময়ে এসে আমাদের গণনা থেমে যাবে, আমাদের সীমাবদ্ধতা সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই কারণেই আমরা বলে থাকি, অসীম সংখ্যক দিন। এই কারণে বলি অসীম সংখ্যক দিন। কিন্তু তা আসলে প্রকৃত অসীম না, সম্ভাব্য অসীম। আমরা গণনা করতে শেষ করতে পারবো না বিধায় বলি অসীম।

আবার, প্রকৃত অসীমের কথা বললে, তা এমন কিছু যা একেবারে সীমাহীন, যার শুরু বা শেষ কিছুই নেই। যেমন, আপনার কাছে অসীম সংখ্যক বল রয়েছে, এর মানে এই নয় যে আপনি অনেক বলের মালিক, বরং আপনি অসীম বলের মালিক, যা কল্পনাতেও ধরার বাইরে। এখানে প্রকৃত অসীমের অস্তিত্ব যেমন বাস্তবে সম্ভব নয়, তেমনি এটি আমাদের অভিজ্ঞতার সীমারেখারও বাহিরে। প্রকৃত অসীম বা ইনফিনিটি আমাদের মেটাফিজিক্যাল নিয়মকে (metaphysical necessity) ভায়োলেশন করে। এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা Hilbert's Infinite Grand Hotel Paradox কে ব্যবহার করতে পারি।

হিলবার্টের অসীম গ্র্যান্ড হোটেল প্যারাডক্স

ধরা যাক, আপনাকে প্রশ্ন করা হলো; ১ থেকে ৫ এর মধ্যে কয়টি সংখ্যা রয়েছে? আপনি সহজেই বলবেন, পাঁচটি। কিন্তু যদি বলা হয়, আপনার উত্তর পুরোপুরি সঠিক নয়, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আসলেই আপনার উত্তর পুরোপুরি সঠিক নয়। সংখ্যা রেখার দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়, ১ থেকে ৫ এর মধ্যে কেবল ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-ই নয়, বরং এই দুই সীমার মাঝে অসীম সংখ্যক ভগ্নাংশ বা দশমিক সংখ্যা রয়েছে। ১.১, ১.১১, ১.১১১–এভাবে চলতে থাকা প্রতিটি সংখ্যা আমাদের বোঝায়, এই সীমারেখায় গণনার কোনো শেষ নেই। এটি অসীম ধারণারই একটি প্রাঞ্জল উদাহরণ।

এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট তৈরি করেছিলেন একটি অসাধারণ প্যারাডক্স, যা পরিচিত Hilbert's Hotel Paradox নামে। এই তত্ত্বে তিনি তুলে ধরেন, অসীম ধারণার বাস্তব প্রয়োগ কতটা বিস্ময়কর হতে পারে।

ধরা যাক, আপনি মালয়েশিয়ার 'ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড হোটেলের' কথা জানেন, যা ২০০৮ সালের গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনুসারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল। এর ৬,১১৮টি কক্ষ প্রতিটি পূর্ণ থাকে, যেখানে একজন করে অতিথি অবস্থান করছেন। এখানে নতুন অতিথিকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়, যদি না কোনো পুরোনো অতিথি চেক আউট করেন। কিন্তু হিলবার্টের হোটেল এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

হিলবার্ট হোটেল এমন এক হোটেল, যেখানে অসীম সংখ্যক কক্ষ রয়েছে। বিষয়টি এমন নয় যে এখানে এক হাজার, এক মিলিয়ন, এক ট্রিলিয়ন রুম রয়েছে। এর মানে, হোটেলটি শুধু বড় নয়, বরং সীমাহীন। এমনকি যদি প্রতিটি কক্ষে একজন করে অতিথি অবস্থান করেন, তবুও নতুন অতিথিকে জায়গা দেওয়া সম্ভব।

কীভাবে? হিলবার্ট দেখিয়েছেন, কক্ষ নম্বরগুলো পুনরায় সাজিয়ে অসীমতার ভেতরে আরও জায়গা সৃষ্টি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রতিটি অতিথিকে তার বর্তমান কক্ষ থেকে ঠিক এক কক্ষ পিছিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নতুন অতিথির জন্য প্রথম কক্ষটি খালি হয়ে যায়। এই প্যারাডক্স আমাদের চেনা বাস্তবতার সীমাকে ভেঙে দেয় এবং অসীম ধারণার গভীরতা ও বিস্তৃতি উন্মোচন করে।

একদিন, হোটেলটি সম্পূর্ণ পূর্ণ। প্রতিটি কক্ষ দখল করে আছেন অতিথিরা। এমন সময় দরজায় উপস্থিত হলেন নতুন এক ভ্রমণার্থী। এমতো অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন? নিশ্চয় নতুন আসা অতিথিকে হোটেলে রুম খালি নেই বলে বিদায় করে দিতেন। কিন্তু হিলবার্ট হোটেলের ম্যানেজার ছিল একজন গণিতবিদ। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। আমাদের হোটেলে জায়গা সবসময় পাওয়া যায়।"

তিনি ঘোষণা দিলেন, "প্রতিটি অতিথি, আপনারা নিজেদের কক্ষ নম্বরের এক যোগ করে পরবর্তী কক্ষে স্থানান্তরিত হোন।" যেই বলা, সেই কাজ। ১ নম্বর কক্ষের অতিথি চলে গেলেন ২ নম্বর কক্ষে, ২ নম্বর কক্ষের অতিথি গেলেন ৩ নম্বরে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকল অসীম পর্যন্ত। আর ফাঁকা হয়ে গেল ১ নম্বর কক্ষ। এবং নতুন অতিথি সেখানে আরামে চেক-ইন করলেন।

প্রথমে হোটেলের প্রতিটি কক্ষ পূর্ণ ছিল এবং অতিথিদের সংখ্যা ছিল অসীম। নতুন অতিথি যোগ করার পরও অতিথিদের সংখ্যা রইল অসীম। কারণ, অসীমের সঙ্গে যে সংখ্যাই যোগ করা হোক না কেন, ফলাফল সবসময় অসীমই থেকে যায়।

একদিন আবার দরজায় দাঁড়ালেন অসীম সংখ্যক নতুন অতিথি। প্রতিটি অতিথির কণ্ঠে কৌতূহলের রেশ–তারা কি আদৌ জায়গা পাবেন? হোটেল ম্যানেজার আবার তার গণিতের জাদু দেখালেন। অসীমের সম্ভাবনার কোনো শেষ নেই। তিনি ভাবলেন, কোনো সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করলে ফলাফল সবসময় জোড় সংখ্যা হবে। তাই তিনি এইবার প্রতিটি অতিথিকে নিজেদের কক্ষ নম্বরকে দ্বিগুণ করে কক্ষ পরিবর্তন করতে নির্দেশ দিলেন। এতে কি হলো? ১ নম্বর কক্ষের অতিথি চলে গেলেন ২ নম্বর কক্ষে, ২ নম্বর কক্ষের অতিথি গেলেন ৪ নম্বরে, ৩ নম্বর কক্ষের অতিথি গেলেন ৬ নম্বরে। আর বেজোড় সংখ্যার সমস্ত কক্ষ ফাঁকা হয়ে গেল। কারণ, অসীম সংখ্যক রুম থাকলে জোড় সংখ্যক রুমও অসীম, আর বিজোড় সংখ্যক রুমও অসীম। নতুন অতিথিরা ১, ৩, ৫–এভাবে ফাঁকা কক্ষগুলোতে সহজেই জায়গা পেলেন। ব্যাস, ঝামেলা শেষ!

এমন অসাধারণ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ম্যানেজার বুঝিয়ে দিলেন যে, অসীমের ভেতরে স্থান সৃষ্টির অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে, কোনো ঝামেলা ছাড়াই অসীম সংখ্যক অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে হিলবার্ট হোটেল আবার নতুন করে তার অসীমত্বের জয়গান গাইল।

এ হোটেলের রহস্য এখানেই শেষ নয়। একদিন একদল অতিথি এলেন, তাঁদের সংখ্যাও অসীম, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই একটি বাসে এসেছেন। শুধু কি একটি বাস? না, এমন অসীমসংখ্যক বাস এল, এবং প্রতিটি বাসে অসীমসংখ্যক অতিথি। হোটেল ম্যানেজার দুশ্চিন্তায় পরে গেলেন! কীভাবে এতো অতিথিকে হোটেলে রুমের ব্যবস্থা করে দিবেন! এমন সময় হোটেল ম্যানেজারের চোখ পরলো তার টেবিলে রাখা গণিতবিদ ইউক্লিডের ছবির দিকে। ইউক্লিড প্রমাণ করেছিলেন যে,

মৌলিক সংখ্যা অসীম। যে সংখ্যাকে কেবল ১ ও সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩.... অসীম সেট।

তাই হোটেল ম্যানেজার চিন্তা করলেন যদি, প্রথমে অসীম সংখ্যক রুম ফাঁকা করা যায়, তাহলে সেখানে একটা বাসের অসীম সংখ্যক অতিথিকে জায়গা করে দেওয়া যাবে। এরপর আরেকবার অসীম সংখ্যক রুম ফাঁকা করে সেখানে আরেকটি বাসের অসীম সংখ্যক অতিথিদের জায়গা দেওয়া যাবে। এভাবে অসীম সংখ্যকবার করা গেলে অসীম সংখ্যক বাসের অসীম সংখ্যক অতিথিদের হোটেলে জায়গা করে দেওয়া যাবে, এবং এই কাজটা অসীম সংখ্যকবার করতে হবে।

তাই হোটেল ম্যানেজার বর্তমানে হোটেলে থাকা সব অতিথিদের প্রথম মৌলিক সংখ্যা ২এর ঘাত অনুযায়ী শিফট হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ, ১ নম্বর কক্ষের অতিথি গেলেন ২^১= ২ নম্বরে, ২নং রুমের অতিথিকে ২^২= ৪ নং রুমে, ৩নং রুমের অতিথিকে ২^৩= ৮ নং রুমে, ৪নং রুমের অতিথিকে ২^৪=১৬ নং রুমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হোটেলে অবস্থানরত সব অতিথি চলে যাবে প্রথম মৌলিক সংখ্যা ২এর ঘাত (2^n) অনুযায়ী রুমে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকল অসীম পর্যন্ত। ফলে হোটেলে অসীম সংখ্যক বেজোড় সংখ্যার কক্ষ (১, ৩, ৫, ৭...) ফাঁকা হয়ে গেল।

তাহলে নতুন করে আসা অসীম সংখ্যক বাসের অসীম অতিথিরা কোথায় যাবে? হোটেল ম্যানেজার প্রথম বাসের অতিথিদের মৌলিক সংখ্যা ৩এর ঘাত অনুযায়ী রুমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ, বাসের প্রথম সিটের অতিথি যাবে ৩^১= ৩ নং রুমে। দ্বিতীয় সিটের অতিথি যাবে ৩^২= ৯ নং রুমে। তৃতীয় সিটের অতিথি যাবে ৩^৩= ২৭ নং রুমে। চতুর্থ সিটের অতিথি যাবে ৩^৪= ৮১নং রুমে। এভাবে প্রথম বাসের অতিথিরা যাবে ৩^n তম রুমে।

একইভাবে, ২য় বাসের অতিথিদের ৫এর ঘাত অনুযায়ী হোটেল রুমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ৩য় বাসের অতিথিদের ৭এর ঘাত, ৪র্থ বাসের অতিথিদের ১১এর ঘাত ৫নং বাসের অতিথিদের ১৩এর ঘাত অনুযায়ী হোটেল রুমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকল অসীম পর্যন্ত। এভাবেই হোটেল ম্যানেজার অসীম সংখ্যক বাসের অসীম সংখ্যক অতিথিদের হোটেলে জায়গা করে দিলেন।

এই অসাধারণ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে হোটেল ম্যানেজার প্রমাণ করলেন, অসীমের ধারণার কোনো সীমা নেই। হোটেলে প্রথম থেকেই অতিথিদের সংখ্যা ছিল অসীম, আর এখন অসীম সংখ্যক বাসের অসীম সংখ্যক অতিথিকেও জায়গা দেওয়া সম্ভব হলো। যদিও এই অসীম সংখ্যক অতিথিকে হোটেলে জায়গা করে দেওয়ার আগেও হোটেলের অতিথি সংখ্যা ছিল অসীম।

এবার প্রথম সিচুয়েশনটি কল্পনা করুন। হোটেল ম্যানেজার অসীম সংখ্যক রুম পূর্ণ হোটেলে একজন নতুন অতিথিকে জায়গা করে দিয়েছিলো। যদি সেখান থেকে অসীম সংখ্যক অতিথিকে বিয়োগ করা হয় তাহলে ফলাফল হবে ১জন। ধরুন, অসীম সংখ্যক অতিথি হচ্ছে X। এখন নতুন ১জন অতিথি আসার পরে হোটেলের বর্তমান অতিথি সংখ্যাও অসীম। তাহলে এখন অসীম সমানও ধরুন X। এখন যদি X থেকে X বিয়োগ করেন তাহলে ফলাফল হবে X-X= 1.

এবার দ্বিতীয় সিচুয়েশনটি কল্পনা করুন, হোটেল ম্যানেরজার অসীম বিজোড়

সংখ্যক রুম ফাঁকা করে অসীম সংখ্যক অতিথিকে জায়গা করে দিয়েছিল। তখনো হোটেলে অসীম জোড় সংখ্যক অতিথি ছিল। যদি হোটেল থেকে জোড় সংখ্যক অতিথি চেকআউট করে তাহলে কি হবে? ধরুন জোড় সংখ্যক অসীম = X এবং বিজোড় সংখ্যক অসীম = X. তাহলে, X-X=X. কারণ জোড় সংখ্যক অসীম থেকে বিজোড় সংখ্যক অসীম বাদ দেওয়ার পরেও জোড় সংখ্যক অসীম থেকেই যাচ্ছে। যদিও অসীম সংখ্যক অতিথি চেকআউট করেছে।

এবার তৃতীয় সিচুয়েশনটি কল্পনা করুন। মৌলিক সংখ্যা আছে যেহেতু অসীম সেহেতু হোটেলটি পূর্ণ অবস্থায় হোটেল ম্যানেজার অসীম সংখ্যক নতুন গেস্টকে হোটেলে জায়গা করে দিয়েছেন। সুতরাং, আবারো অসীম থেকে অসীম বিয়োগ করলে ফলাফল হবে অসীম। X-X=X.

এই অ্যানালজিতে দেখা যাচ্ছে যে, Identical Quantity - Identical Quantity = Different Result! কারণ, আপনি যদি দুই থেকে দুই বিয়োগ করেন তাহলে প্রতিবারই ফলাফল আসবে শূন্য। কখনোই ফলাফল শূন্য ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কিন্তু অসীমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অসীম থেকে বিয়োগ করলে একেকবার একেক ফল আসে। অর্থাৎ, এটা মেটাফিজিক্যালি নেসেসারি ট্রুথ কে ভায়োলেট করে। অসীম হোটেল পূর্ণ থাকার পরেও হোটেলে নতুন মানুষকে জায়গায় করে দেওয়া যাচ্ছে, যা পুরোপুরিই অযৌক্তিক। কেননা রুম আগে থেকেই পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ একই সাথে একই সময়ে খালি আবার পূর্ণ যা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের বিরোধী। আবার আইডেন্টিক্যাল কোয়ান্টিটি বাদ দিলে আমরা ভিন্নভিন্ন ফলাফল পাচ্ছি যা সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। সুতরাং, যা কিছু মেটাফিজিক্যাল নেসেসারি ট্রুথকে ভায়োলেশন করে তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। অসীম মেটাফিজিক্যাল নেসেসিটিকে ভায়োলেট করে, তাই অসীম বাস্তবে অস্তিত্বে থাকতে পারে না।

হিলবার্ট হোটেলের এই অযৌক্তিকতা আমাদের এটাই দেখায় যে অসীম কেবল মাত্র গাণিতিক ধারণা এবং এটাকে আমরা বাস্তবজীবনে উপলব্ধি করতে পারি না। অতএব, এই পর্যবেক্ষণ থেকে এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রেমিস (প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না) সত্য।সুতরাং আমরা এখন এই আর্গুমেন্টে উপনীত হতে পারি যে,

- যা কিছু মেটাফিজিক্যাল নেসেসারি ট্রুথ ধারণ করে তা অস্তিত্বে থাকতে পারেনা।
- ইনফিনিটি বা প্রকৃত অসীম ল-অফ ভায়োলেশন ধারণ করে।
- সুতরাং, বাস্তবে ইনফিনিটি থাকতে পারেনা।

- **P2. 1.2: An infinite temporal regress of events is an actual infinite. (কোনো ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস হলে তা প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে)**

এই প্রেমিস অনুযায়ী, কোনো ঘটনার পেছনে যদি অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস ঘটে, তবে তা প্রকৃত অসীমের ধারণাকে প্রতিনিধিত্ব করে । উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনার হাতে থাকা একটি মোবাইল ফোন। এই ফোনটি অসীম কাল ধরে আপনার হাতে ছিল না। বরং, এটি আপনার হাতে আসার পেছনে একটি নির্দিষ্ট কারণ বা ঘটনা রয়েছে। সেই ঘটনারও একটি পূর্ববর্তী কারণ ছিল, এবং এর পেছনেও আরও

কারণ ছিল। যদি এই কারণগুলোর শৃঙ্খল অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহলে সেটি প্রকৃত অসীমের প্রতিনিধিত্ব করে। একইভাবে, যদি আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তির কারণ অসীম হয়, তবে এটি বোঝায় যে, মহাবিশ্বের শুরুতে পৌঁছানোর পেছনে অসীম সংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই অসীম সংখ্যক ঘটনা প্রকৃত অসীমের ধারণাকে চিত্রায়িত করে।

- **P2. 1.3: Therefore, an infinite temporal regress cannot exist. (সুতরাং, অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস থাকতে পারে না।)**

P2. 1.1 (An actual infinite cannot exist) থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 'প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারেনা'। প্রেমিস P2. 1.2 থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 'কোন ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস হলে তা প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে'। যেহেতু প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারেনা সেহেতু কোন ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস ঘটলে সেটাও অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং তা বাস্তবে থাকতে পারে না। তাই P2. 1.3 সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, 'অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস থাকতে পারে না'।

- **P2.4: Therefore, The Univers began to exist. (সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু রয়েছে)**

যেহেতু, P2. 1.1 অনুযায়ী 'প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না'। P2. 1.2 অনুযায়ী 'কোনো ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস হলে তা প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে'। P2.3 অনুযায়ী 'অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস থাকতে পারেনা'। এই প্রেমিস গুলো থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, 'প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না', 'অতীত ঘটনা অসীম হতে পারে না', এবং 'অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে বলে অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস ঘটতে পারে না', তাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই শুরু রয়েছে। অন্যথায়, বর্তমান সময়ে আসা সম্ভবই হতো না।

Diductive Argument-2

এই আর্গুমেন্টে আমরা প্রমাণ করবো অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার (কার্যকারণ) ধারাবাহিকতা অসীম হতে পারে না। যুক্তিটির গঠন নিম্নরুপ;

- P2. 2.1: A collection formed by successive addition cannot be actually infinite. (ধারাবাহিক সংযোজন দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ আসলে অসীম হতে পারে না)
- P2. 2.2: The temporal series of past events is a collection formed by Successive addition. (অতীতের ঘটনাগুলির সাময়িক সিরিজের দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ ধারাবাহিক সংযোজন)
- P2. 2.3: Therefore, the temporal series of past events cannot be actually infinite. (অতএব, অতীত ঘটনার সাময়িক সিরিজ আসলে অসীম হতে পারে না)

- P2. 2.4: Therefore, the universe began to exist. (অতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল)

ব্যাখ্যা;

P2.2.1: A collection formed by successive addition cannot be actually infinite. (ধারাবাহিক সংযোজন দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ আসলে হতে পারে না অসীম)

কল্পনা করুন, আপনার সামনে একটি ব্যাগে অসীম সংখ্যক মার্বেল রয়েছে। আপনার বন্ধু সীমান্ত অসীম অতীত কাল থেকে সেই মার্বেলগুলো গুণতে শুরু করেছে। একসময়, ঘণ্টাখানেক পরে, সে আপনাকে জানায়, "আমি অসীম সংখ্যক মার্বেল গুণে শেষ করেছি।" এমন দাবিটি শোনামাত্রই আপনি বুঝবেন, এটি বাস্তবে অসম্ভব।

কিন্তু কেন? উত্তর হলো; অসীম শব্দটির অর্থই হলো যার কোনো শুরু নেই এবং শেষও নেই। যদি মার্বেল গণনার কাজ অসীম অতীত থেকে শুরু হয়ে থাকে, তবে তা কখনোই শেষ হওয়ার কথা নয়। কারণ, অসীমের ধারণাই হলো এমন একটি শৃঙ্খল, যা চিরন্তন এবং সীমাহীন। অসীমের কোনো নির্দিষ্ট সীমা না থাকলে, সেই সীমাহীন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গণনা শেষ করার দাবি কেবল অযৌক্তিকই নয়, তা অসীমের সংজ্ঞার সঙ্গেও বিরোধপূর্ণ।

এই উদাহরণের অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতা আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় যে ধারাবাহিক সংযোজন দ্বারা গঠিত কোনো সংগ্রহ প্রকৃতপক্ষে অসীম হতে পারে না। একের পর এক মার্বেল যোগ করার মাধ্যমে আমরা কেবল একটি সসীম সংখ্যার ধারাবাহিকতাই তৈরি করতে পারি, কিন্তু তা কখনো প্রকৃত অসীমে পৌঁছাতে পারে না। অসীম একটি বিমূর্ত ধারণা–এটি এমন কিছু, যা শুরু এবং শেষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। কিন্তু বাস্তব জগতে ধারাবাহিক যোগফল সবসময় সসীম থাকে, কারণ প্রত্যেকটি সংযোজন একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ধরে সংঘটিত হয়। এভাবে, ধারাবাহিক সংযোজনের মাধ্যমে অসীমকে বাস্তবে অর্জন করা যায় না।

- **P2.2.2: The temporal series of past events is a collection formed by Successive addition. (অতীতের ঘটনাগুলির সাময়িক সিরিজের দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ ধারাবাহিক সংযোজন)**

P2. 2.2: অনুযায়ী অতীতের ঘটনাগুলির সাময়িক সিরিজটি ধারাবাহিক সংযোজন দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ। অর্থাৎ, আমরা যদি অতীত কাল থেকে শুরু করে একের পর এক মার্বেল যোগ করে একটি সংগ্রহ তৈরি করি তাহলে তা একটি ধারাবাহিক সংযোজন।

- **P2. 2.3: Therefore, the temporal series of past events cannot be actually infinite.** (অতএব, অতীত ঘটনার সাময়িক সিরিজ আসলে অসীম হতে পারে না)

যেহেতু, ধারাবাহিক সংযোজন দ্বারা গঠিত একটি সংগ্রহ আসলে অসীম হতে পারে না এবং অতীতের ঘটনাগুলোর সাময়িক সিরিজের দ্বারা গঠিত সংগ্রহ বা যে কোন

কিছু ধারাবাহিক সংযোজন, তাই অতীতের ঘটনার সাময়িক সিরিজ অসীম নয়। অর্থাৎ, অতীতের ঘটনার সাময়িক সিরিজ অসীম হতে পারেনা। সহজ করে বললে, অসীম অতীত সময়ে অসীম মার্বেল একটা নির্দিষ্ট সময়ে গণনা শেষ করা যাবে না। কারণ অসীম সংখ্যক মার্বেল গুণতে সময় লাগবে অসীম এবং অসীম সময় কখনোই শেষ হবেনা। তাই অসীম সময় শেষ করে কখনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো সম্ভব না।

- **P2. 2.4: Therefore, the universe began to exist. (অতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল)**

আমাদের মহাবিশ্ব যদি অসীম কার্যকারণ সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় গঠিত হতো, তাহলে আমরা বর্তমানে পৌঁছাতে পারতাম না। কারণ অসীম কার্যকারণ বা ঘটনা মানে হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার কোনো শেষ নেই এবং যার সম্পূর্ণতা অর্জন অসম্ভব। অসীম কার্যকারণ শেষ হতে সময় লাগতো অসীম। আর অসীম সময় পার করতে সময়ও লাগতো অসীম। যেহেতু অসীম সময় শেষ করা সম্ভব না সেহেতু অতীতে অসীম কার্যকারণ ঘটার পরে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারতো না।

অতএব, যুক্তির পথ ধরে বলা যায়, আমাদের মহাবিশ্বের একটি শুরু থাকা আবশ্যক। কারণ যদি এর শুরু না থাকত এবং এটি অসীম কার্যকারণের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হতো, তাহলে বর্তমান সময়ে আসা সম্ভব হতো না। এই যুক্তি থেকে স্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসার জন্য একটি প্রাথমিক সূচনা বিন্দু থাকা অপরিহার্য।

বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টেফেন হকিং এর মতে, "সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে, মহাবিশ্ব চিরকালের জন্য বিদ্যমান ছিল না, এটি প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়েছিল। এটি সম্ভবত আধুনিক কসমোলজির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।........এই বক্তৃতার উপসংহার হল মহাবিশ্ব চিরকালের জন্য বিদ্যমান ছিল না। বরং, প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্ব এবং সময়ের শুরু হয়েছিল।"[৭৮]

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

প্রকৃত অসীমের অস্তিত্ব নিয়ে ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের মাধ্যমে ধারণাগত যুক্তি উপস্থাপনের পর আমরা এখন অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের আলোকে যুক্তি প্রয়োগ করব। বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্ব প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে শূন্য অবস্থা থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এই তত্ত্ব নির্দেশ করে যে, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সূচনা বিন্দু রয়েছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব আমাদের কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের দ্বিতীয় শর্ত (P2). অর্থাৎ 'মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে', এই ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়ে সমর্থন করে। যেহেতু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাই ভবিষ্যতের কোনো নতুন পর্যবেক্ষণ বা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান হয়তো বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিকল্প ধারণা উপস্থাপন করতে পারে। তবে বর্তমান পর্যন্ত কোনো বিকল্প তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়নি যা বিগ ব্যাংয়ের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বা ব্যাখ্যাযোগ্য।

---

[৭৮] https://www.hawking.org.uk/in-words/lectures/the-beginning-of-time

অতএব, এই মুহূর্তে বিগ ব্যাং তত্ত্বই মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে আমাদের কাছে সবচেয়ে সফল এবং সর্বাধিক স্বীকৃত তত্ত্ব। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, কসমোলজি আমাদের যুক্তির দ্বিতীয় শর্তকে (P2) শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক সমর্থন প্রদান করে এবং মহাবিশ্বের শুরু থাকার যুক্তিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

- ❖ **P3: Therefore, the universe has a cause of its beginning. (অতএব, মহাবিশ্বের শুরুর জন্য একটি কারণ রয়েছে।)**

যেহেতু, আমরা P1 & P2 সত্য প্রমাণ করেছি তাই ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কনক্লুশন P3 সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং, 'মহাবিশ্বের শুরুর জন্য একটি কারণ (স্রষ্টা) রয়েছে' এটা সত্য। উপরে আমরা প্রমাণ করেছি, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু আছে।

আমরা ইতিমধ্যে দেখিয়েছি যে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের শুরু আছে এবং যা কিছু অস্তিত্বে এসেছে তার পেছনে অবশ্যই একটি কারণ রয়েছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ স্রষ্টার সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক?

প্রথমত, মহাবিশ্বের কারণটি অবশ্যই স্বাধীন, স্ব-নির্ভর হতে হবে। যদি এটি নিজে আরেকটি কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে আমরা কার্যকারণের একটি অনন্ত শৃঙ্খলে বা অসীম রিগ্রেসে পতিত হবো। যেহেতু বাস্তব জগতে প্রকৃত অসীম অস্তিত্বশীল হতে পারে না, তাই কার্যকারণ সম্বন্ধ অসীম শৃঙ্খলে যেতে পারে না। সুতরাং, এই কারণটি এমন কিছু হতে হবে যা নিজেই কারণহীন–একটি স্ব-নির্ভর, চিরন্তন সত্তা, যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত, কারণহীন কারণটি হবে বুদ্ধিমান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, ইত্যাদি। 'সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থ নাকি বুদ্ধিমান সত্তা' এবং 'স্রষ্টার প্রকৃতি' অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলো প্রমাণ করেছি। আদি কারণের এই বৈশিষ্ট্য গুলো আস্তিকদের স্রষ্টার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, আদি কারণ বা কারণহীন কারণ, স্ব-নির্ভর, অনন্তকাল থেকেই অস্তিত্বশীল সেই কারণ অবশ্যই স্রষ্টা।

কালামকসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট নিয়ে আপত্তির জবাব

নাস্তিকরা বিভিন্ন উপায়ে কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের উপর আপত্তি আরোপ করে। P1 'অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার কারণ আছে' বা PSR'কে নাস্তিকরা অস্বীকার করে কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের উপর প্রথম আপত্তি করে থাকে। যদিও আমরা দাবি করি PSR স্বজ্ঞাতভাবে (intuitively), স্বতঃস্ফূর্তভাবে (self-evidently) বা সহজাতভাবে প্রমাণিত। তবে নাস্তিকরা দাবি করেন, কোয়ান্টাম ফিল্ডে কোন পার্টিকেল (কণা) কারণ ছাড়া অস্তিত্বে আসতে পারে। কারণ, কোয়ান্টাম ফিল্ডে কোন কণিকা বা পার্টিকেল কারণ ছাড়া অস্তিত্বে আসা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব নয় যেমনটা অসম্ভব একজন মানুষ একই সাথে বিবাহিত আবার অবিবাহিত। যেহেতু, কোয়ান্টাম ফিল্ডে কারণ ছাড়া পার্টিকেল অস্তিত্বে আসাতে পারে সেহেতু P1 সঠিক নয়। এছাড়াও কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী, সাবএটমিক পর্যায়ে যে কোন কিছু কোন কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসতে পারে। সুতরাং, P1 কোনোভাবেই সঠিক নয়।

P1 নিয়ে আপত্তির জবাব

দার্শনিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ নাস্তিকদের এই অভিযোগের জবাবে বলেন, P1 এমন কিছু নয় যে যার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে কারণ এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে (self-evidently) প্রমাণিত।[৭৯] 'নাস্তিকতা কি সহজাত' এই অর্ধায়ে আমরা কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তার অন্যতম একটি বিষয় ছিল যে জগতকে আমরা বাস্তব মনে করে দিন নিপাত করি সেই জগৎ কি আসলেই বাস্তব নাকি নিছক বিভ্রম? আমাদের যৌক্তিক অনুষদগুলো কি আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম?

এই জগৎ বাস্তব কি-না, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের বোধ এবং অভিজ্ঞতা এই জগৎকে বাস্তব বলে মেনে নিতে বাধ্য করে। এটি আমাদের প্রকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমরা জগৎকে বাস্তব বলে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করি। তবে, যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই জগৎ নিছক বিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের সাথে যদি কোন কিছু সাংঘর্ষিক না হয় তবে তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এমন একটি বাস্তবতাও কল্পনা করা যায়, যেখানে আমরা আসলে বিভ্রমে আবদ্ধ এবং আমাদের ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানীয় অনুষদগুলো আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম নয়। এই জীবন নিছক বিভ্রম, আমাদের যৌক্তিক অনুষদগুলো আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদানে ব্যর্থ, এই ব্যাপারগুলো যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না যেমনটা তৈরি করে একজন লোক একই সাথে বিবাহিত আবার অবিবাহিত, একটা বৃত্তের চারটি কোণ থাকার মতো ব্যাপার গুলিতে।

তাহলে কি আমরা এটাই মনে করি যে, আমাদের চারপাশের সবকিছুই নিছক বিভ্রম? আমাদের যৌক্তিক অনুষদ কি তবে প্রকৃত অর্থে সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদানে অক্ষম? আমরা কি কখনো এমন ধারণা করি যে, আমাদের অস্তিত্ব আসলে নিছক এক বিভ্রম? যে আমরা দূরের কোনো অজানা গ্রহে একটি পাত্রের মধ্যে ভেসে থাকা কেবলমাত্র একটি মস্তিষ্ক? যে মস্তিষ্কে কোনো অদ্ভুত এলিয়েন তাদের প্রযুক্তির

---

[৭৯] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:139

কলকাঠি নাড়িয়ে আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে অনুভূতির ঢেউ, বাস্তবতার ছোঁয়া, এবং জীবনের এক স্বপ্নময় অনুভব?

অবশ্যই আমরা এমনটা মনে করি না। বরং, এই জগৎ বাস্তবিকভাবে অস্তিত্বশীল; এমন বিশ্বাস আমাদের সহজাত স্বজ্ঞার অংশ। যদিও এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তবুও মানব মন স্বতঃসিদ্ধভাবে এ ধারণায় স্থির থাকে যে, এই জীবন বাস্তব এবং আমাদের যৌক্তিক অনুষদগুলো সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে, সত্যকে চিনতে সক্ষম। এ ধরনের বিশ্বাসের জন্য আমাদের কোনো যুক্তি, প্রমাণ বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। দর্শনের ভাষায় এ ধরনের বিশ্বাসগুলোকে Self-evident truth বলে। একইভাবে, স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে এটিও মেনে নেওয়া যায় যে, কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের P1 (অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার কারণ আছে/ PSR) সত্য। আমাদের এই অভিজ্ঞতাগুলো শুধু বিশ্বাসের ভিত্তি নয়, বরং চিন্তা ও যুক্তির শেকড়ও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলোতে গভীরভাবে প্রোথিত। সুতরাং, নিছক যৌক্তিক সম্ভাবনার অজুহাত দিয়ে এই দাবি করা যায় না যে বাস্তব জগতে কোনো কারণ ছাড়াই কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে। কারণ ছাড়াই কণিকা অস্তিত্বে আসতে পারে–এমন ভাবাটাই বরং অযৌক্তিক। বাস্তব জগতে প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ থাকে, এবং এই কারণ-কার্য সম্পর্কের নীতিই আমাদের বাস্তবতার ভিত্তি।

দার্শনিক ডেবিট হিউম ১৭৫৪ সালে লিখিত এক চিঠিতে লিখেন, "তবে আমাকে আপনার উদ্দেশ্যে বলতে দিন যে আমি কখনই এতটা অযৌক্তিক প্রস্তাব দৃঢ় করিনি যে কারণ ছাড়াই কিছু হতে পারে"।[৮০]

P1 নিয়ে আরো একটি অভিযোগ হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী, সাব অ্যাটমিক পর্যায়ে যে কোনো কিছু কোন কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসতে পারে। এই ধারণাটি মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তথাকথিত কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যাখ্যাগুলো অনিশ্চয়তাবাদী (indeterministic)।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান এর মতে, "আমি মনে করি আমি নিরাপদে বলতে পারি যে কেউ সত্যিই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝে না।"[৮১]

দার্শনিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ এর মতে, কোপেনহেগেনের ব্যাখ্যা সঠিক হলেও, এটি অনুসরণ করে না যে কোন কিছুই শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম পরম শূন্যতা নয় বরং 'অস্থির শক্তির একটি সমুদ্র, হিংসাত্মক কার্যকলাপের একটি ক্ষেত্র যার একটি সমৃদ্ধ শারীরিক গঠন রয়েছে এবং শারীরিক আইন দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে'।[৮২] ক্রেইগ তার লিখিত 'The Kalam Cosmological Argument; Scientific Evidence for the Beginning of the Universe' বইতে উল্লেখ করেন, "একটি ভ্যাকুয়ামকে সাধারণত খালি স্থান বলে মনে করা হয়, কিন্তু আধুনিক কণা পদার্থবিদ্যা অনুসারে ভ্যাকুয়াম হল একটি ভৌত বস্তু, যা শক্তির ঘনত্ব এবং চাপ দিয়ে সমৃদ্ধ।"[৮৩]

---

[৮০] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:140
[৮১] Opinion | Even Physicists Don't Understand Quantum Mechanics - The New York Times
[৮২] Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A philosophical Introduction. Page:140
[৮৩] William Lane Craig Paul Copan; The Kalām Cosmological Argument; Scientific Evidence for the Beginning of the Universe; Page: 151

কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা প্রকৃত অর্থে শূন্য স্থান নয়। সেখানে পদার্থের নিয়ম চলে। কোয়ান্টাম শূন্যতা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী শক্তির অবস্থা। আর সেই শক্তি থেকেই প্রতিনিয়ত জোড়ায় জোড়ায় তৈরি হয় কণা ও প্রতিকণা। যারা পুনরায় ধ্বংস হয়ে আবার শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং, কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা মানে ভৌত কিছু।[৮৪]

উইকিপিডায়ার তথ্য অনুযায়ী, ভ্যাকুয়াম স্টেট বা কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম যাকে বলা হয় তার বর্তমান সময়ের উপলব্ধি অনুসারে, এটি 'কোনোভাবেই একটি সাধারণ খালি স্থান' নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতে, ভ্যাকুয়াম অবস্থা সত্যিকার অর্থে খালি নয় বরং এতে ক্ষণস্থায়ী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ এবং কণা রয়েছে যা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের মধ্যে আসে এবং বিলীন হয়ে যায়।[৮৫]

কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি পদার্থের মৌলিক এককগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একই সময়ে একটি কণার অবস্থান এবং গতিবেগ পুরোপুরি জানতে পারে না। এই অনিশ্চয়তার একটি উদ্ভট পরিণতি হল যে একটি ভ্যাকুয়াম কখনই সম্পূর্ণ খালি থাকে না, বরং এর পরিবর্তে তথাকথিত 'ভার্চুয়াল কণা' দ্বারা গুঞ্জন হয় যা ক্রমাগত অস্তিত্বের মধ্যে এবং বাইরে চলে যায়।[৮৬]

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি যে, একটি বস্তুর অবস্থান এবং বেগ উভয়ই সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, একই সময়ে, এমনকি তত্ত্বেও।[৮৭]

সুতরাং, কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম কোন খালি স্থান নয়, সেখানে শূন্য থেকে কোন কিছু অস্তিত্বে আসতে পারেনা। তাই কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্স অনুযায়ী 'সাব অ্যাটমিক পর্যায়ে যে কোনো কিছু কোন কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসতে পারে' এই দাবিটি মোটেও সঠিক নয়।

P2 নিয়ে আপত্তির জবাব

কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের P2 অনুযায়ী 'The universe began to exist.' (মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু আছে)। এর স্বপক্ষে আমরা নিম্নে দেওয়া উপ যুক্তিটি (Sub Argument) ব্যবহার করেছি। এই উপ যুক্তিটি মূলত বাস্তব অসীমের অসম্ভবতার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।

- P2. 1.1 An actual infinite cannot exist. (প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারেনা।)
- P2. 1.2 An infinite temporal regress of events is an actual infinite. (কোনো ঘটনার জন্য অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস হলে তা প্রকৃত অসীমকে প্রতিনিধিত্ব করে)
- P2. 1.3 Therefore, an infinite temporal regress cannot exist. (সুতরাং, অসীম টেম্পোরাল রিগ্রেস থাকতে পারে না।)

---

[৮৪] https://physics.aps.org/story/v2/st28
[৮৫] Quantum vacuum state - Wikipedia
[৮৬] Something from Nothing? A Vacuum Can Yield Flashes of Light - Scientific American
[৮৭] Uncertainty principle | Definition & Equation | Britannica

- P2. 1.4 Therefore, the Univers began to exist. (সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু রয়েছে)

নাস্তিকরা উপ যুক্তির P2. 1.1 প্রত্যাখ্যান করেন। P2. 1.1 অনুযায়ী বাস্তবে প্রকৃত অসীম থাকতে পারে না। কিন্তু নাস্তিকদের মতে, প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে কারণ অসীমের ধারণাটি যুক্তির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য বা বিরোধ তৈরি করে না। একটি চারকোনা বিশিষ্ট ত্রিভুজ কিংবা বিবাহিত ব্যাচেলর–এই ধারণাগুলো প্রকৃতপক্ষে স্ববিরোধী এবং যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কারণ, এগুলো নিজেদের সংজ্ঞার সাথেই সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। তাই এ ধরনের কিছুর অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। অন্যদিকে, একটি গোলাপি রঙের হাতি বা প্রযুক্তি ছাড়াই আকাশে উড়তে সক্ষম একজন মানুষের অস্তিত্ব থাকার ধারণা যৌক্তিকভাবে সম্ভব। যদিও এগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়, তবুও এগুলো নিজেদের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না।

নাস্তিকদের মতে, গণিতবিদ কান্টরের সেট তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রকৃত অসীমকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। এই তত্ত্বে অসীমের ধারণাটি যুক্তিসম্মত এবং সুসংগতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু প্রকৃত অসীমের এই ধারণা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব নয়, তাই বাস্তব জগতে প্রকৃত অসীমের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। সুতরাং, P2. 1.1 'প্রকৃত অসীম বাস্তবে থাকতে পারে না' সঠিক নয়।

P1 নিয়ে আপত্তির জবাবে ইতোমধ্যেই আমরা দেখিয়েছি যে, যৌক্তিকভাবে কোনো কিছু সম্ভব হলেই তার অস্তিত্ব বাস্তবিকভাবে থাকবে–এমনটি নয়। কান্টরের সেট তত্ত্ব অসীমকে সুসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম এবং অসীমের অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে সম্ভব হলেও, তা অনটোলজিক্যালি বা আধিভৌতিকভাবে (metaphysically) বাস্তবতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, অসীমের ধারণাটি সুসংগত হতে পারে, তবে এর মানে এই নয় যে বাস্তব জগতে প্রকৃত অসীমের অস্তিত্ব সম্ভব।

কান্টরের সেট তত্ত্ব গাণিতিক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যা বিমূর্ত সত্তা (Abstract entities) হিসেবে বিবেচিত। বিমূর্ত সত্তা বলতে বোঝানো হয় এমন কিছু, কেবল ধারণাতে অস্তিত্বশীল এবং বাস্তব জগতে যার শারীরিক অস্তিত্ব নেই। বিপরীতে, যা কিছু শারীরিকভাবে বিদ্যমান, সেগুলোকে কংক্রিট সত্তা (Concrete entities) বলা হয়।

বিমূর্ত সত্তাগুলোর নিজস্ব সৃষ্টি বা (Causal Power) তৈরি করার ক্ষমতা নেই। ফলে, অসীম ধারণাটি গাণিতিক জগতে থাকতে পারে, কিন্তু এটি কংক্রিট জগতে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। যদি আমরা আমাদের ফিজিক্যাল জগতে সেট তত্ত্বের ধারণা প্রয়োগ করি, তবে তা মেটাফিজিক্যাল কন্ট্রাডিকশন বা মেটাফিজিক্যাল নেসেসারি ট্রুথের (metaphysical necessary truths) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। উদাহরণস্বরূপ, গাণিতিকভাবে 'মাইনাস -২ জন লোক' কোনো বাসায় যেতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে -২ জন লোকের অস্তিত্ব বা তাদের বাসায় যাওয়ার ঘটনা সম্ভব নয়। কারণ এটি মেটাফিজিক্যাল নেসেসারি ট্রুথ লঙ্ঘন করে। একইভাবে, গাণিতিকভাবে অসীম ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হলেও, কংক্রিট জগতে এই ধারণা বাস্তবায়িত হলে তা মেটাফিজিক্যাল নেসেসারি ট্রুথের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। অতএব, এই জগতে প্রকৃত অসীমের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

প্রকৃত অসীম যদি অস্তিত্বে না থাকে তাহলে আল্লাহ কীভাবে অসীম হয়?

কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টে আমাদের দেখিয়েছে, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট সূচনা রয়েছে এবং অসীম বাস্তবতা কোনোভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। অপরদিকে, নির্ভরশীলতার যুক্তি আমাদের জানায়, মহাবিশ্বে যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ বা অনুভব করি, তার সবই সসীম, আর তা অসীম হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এ দু'টি যুক্তিতেই আমরা বলি, স্রষ্টা হলেন অসীম। এখানেই নাস্তিকরা একটি স্ববিরোধিতার অভিযোগ তোলে। তারা বলে, আস্তিকেরা প্রথমে দাবি করে যে অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না, অথচ পরক্ষণেই স্রষ্টাকে অসীম হিসেবে অভিহিত করে। তাদের মতে, এটি স্পষ্টতই একটি স্ববিরোধী বক্তব্য এবং এতে স্পেশাল প্ল্যাডিং-এর (Special padding) আশ্রয় নেওয়া হয়।

নাস্তিকদের এই আপত্তির পেছনে মূলত রয়েছে স্রষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'অসীম' শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা। যখন আমরা বলি, কোনো ইফেক্ট (Effect) এর পেছনে অসীম সংখ্যক কারণ বা প্রভাব থাকতে পারে না, তখন সেটি একটি গাণিতিক বা পরিমাণগত অসীমতাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, কোনো একটি প্রভাবের জন্য অসীম পৃথক কারণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, যখন স্রষ্টার ক্ষেত্রে 'অসীম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন তা গাণিতিক বা পরিমাণগত অসীম নয়, বরং গুণগত অসীম। গাণিতিক অসীম বলতে বোঝানো হয় ১, ২, ৩, ৪... এভাবে গণনা করতে থাকা এমন একটি ধারাকে, যা কখনোই শেষ হয় না। কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে আমরা এই অসীমতাকে গুণগত অর্থে গ্রহণ করি। অর্থাৎ, স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরম করুণাময়–এবং এই গুণগুলো অসীম।

স্রষ্টার গুণাবলির মধ্যে কোনো পৃথকতা বা সীমাবদ্ধতা নেই। এই গুণাবলির একত্রীকরণই তাকে গুণগত অসীম করে তোলে। এটি কোনো গণনার বা সংখ্যার বিষয় নয়, বরং একটি পরম গুণের প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনার একটি গুণ হলো সততা। এই সততা কোনো অসংখ্য পৃথক কারণের সমষ্টি নয়। এটি এমন একটি গুণ, যা সংখ্যার ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায় না। স্রষ্টার গুণাবলির ক্ষেত্রে আমরা যে 'অসীম' শব্দটি ব্যবহার করি, তা একই ধরনের একটি গুণের চূড়ান্ত রূপ। অর্থাৎ, তিনি এমন সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী, যার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারী আর কিছু হতে পারে না। এই গুণাবলি পরিমাপের ঊর্ধ্বে। এ কারণেই আমরা স্রষ্টার ক্ষেত্রে 'অসীম' শব্দটি ব্যবহার করি।

নির্ভরশীলতার যুক্তি (আর্গুমেন্ট ফ্রম কন্টিনজেন্সি)

এই যুক্তির মূল ভিত্তি হলো কার্যকারণ নীতি। সহজ ভাষায় এর অর্থ হলো; যা কিছু অস্তিত্বে আসতে ব্যর্থ হতে পারত, তার অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই কোনো-না-কোনো কারণ রয়েছে। আমাদের চারপাশে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, তার প্রতিটি বস্তুই এমন যে, তা অস্তিত্বে না-ও থাকতে পারত। ধরা যাক, আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোন, রাস্তার ধারের ইট-পাথর, সবুজ গাছপালা, পোষা কুকুর-বিড়াল, আকাশের গ্রহ-তারা, কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা–এগুলো কোনো না কোনোভাবে অস্তিত্বশীল হলেও, সহজেই এমন একটি মহাবিশ্ব কল্পনা করা সম্ভব যেখানে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কারণেই বলা হয়, এই জিনিসগুলো অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল।

তবে প্রশ্ন হলো–এমন কিছু কি সত্যিই আছে, যার অস্তিত্ব অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না? এমন কোনো সত্তা কি বিদ্যমান, যার অস্তিত্ব থাকাটা অপরিহার্য? যা প্রতিটি সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে থাকে? অপরিহার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝাচ্ছি, এমন কিছু যার অস্তিত্ব চিরন্তন এবং যার অস্তিত্বহীনতা একেবারেই অসম্ভব। এটি এমন একটি সত্তা যা কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং নিজেই কার্যকারণ ঘটাতে সক্ষম।

এই অংশে আমরা এমন একটি অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যা তার অস্তিত্বের জন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, বরং নিজেই চূড়ান্ত কারণ এবং যার অস্তিত্ব থাকাটা অপরিহার্য, যিনি কার্যকারণ (Cause & Effect) ঘটাতে সক্ষম। এই সত্তা কার্যকারণের প্রাথমিক ভিত্তি এবং তাঁরই মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির কার্যকারণ চক্র শুরু হয়েছে। কার্যকারণের অর্থ হলো, কোনো ঘটনার পূর্ববর্তী অবস্থা এবং সেই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আতিকের হাত থেকে একটি গ্লাস পড়ে ভেঙে যায়। এই ঘটনার দুটি পর্যায় রয়েছে–পূর্ববর্তী ঘটনা হলো গ্লাসটি হাত থেকে পড়ে যাওয়া, আর পরবর্তী ঘটনা হলো সেটি ভেঙে যাওয়া। গ্লাস ভাঙার জন্য পূর্ববর্তী ঘটনাটি এখানে পর্যাপ্ত কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

এই আর্গুমেন্টটি ভালোভাবে বুঝতে হলে কিছু ফিলোসফিক্যাল বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে। যেমন, অনিবার্য অস্তিত্ব, (Necessary Existence), অনিবার্য বৈশিষ্ট্য (Essential Properties), আকস্মিক বৈশিষ্ট্য (Accidental Properties) সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং অসম্ভাব্য অস্তিত্ব (Possible Existence & Impossible Existence), নির্ভরশীল অস্তিত্ব, পর্যাপ্ত কারণের নীতি (Principle of sufficient reason (PSR)) ইত্যাদি।

অনিবার্য অস্তিত্ব

অনিবার্য অস্তিত্ব (Necessary Existence) বলতে বোঝায়, যা কারণহীন কারণ, স্বাধীন, অপরিহার্য এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এটি সেই অস্তিত্ব, যা কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং যার অস্তিত্ব চিরন্তন ও অনিবার্য। মডাল লজিক অনুসারে, এমন কোনো সত্তা বা বিষয়কে অনিবার্য অস্তিত্ব বলা হয়, যা সকল সম্ভাব্য জগতে অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান বা সত্য। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক ত্রিভুজের প্রকৃতি।

ত্রিভুজের তিনটি বাহু থাকা একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কোনো সম্ভাব্য জগতে ত্রিভুজের বাহু পাঁচটি বা দশটি হওয়া সম্ভব নয়। যেকোনো বাস্তবতায় ত্রিভুজ সর্বদাই তিনটি বাহুবিশিষ্ট–এটি তার প্রকৃতির অংশ। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যই তাকে নেসেসারি বা অনিবার্য করে তোলে।

অনিবার্য অস্তিত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। ত্রিভুজের তিনটি বাহু থাকার বিষয়টি যেমন কোনো বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে না। বরং এটি তার নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত। এই অস্তিত্ব এমন যে, তা নিজেই নিজের প্রকৃতি ও সত্যকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

দার্শনিক ইবনে সিনা অনিবার্য অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "আমরা বলি যে প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) হলো অকারণ (অসৃষ্ট), যেখানে একটি 'সামগ্রিক অস্তিত্ব' (Contingent Existence) সৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় অস্তিত্বটি (Necessary Existence) সমস্ত সম্ভাব্য উপায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় (Necessary)।[৮৮]

অপরিহার্য অস্তিত্বের প্রশ্নটি কসমোলজি, অন্টোলজি এবং ধর্মতত্ত্ব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কসমোলজি দিয়ে শুরু করি। অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা জগতের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

স্টিফেন হকিং বলেছেন, একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে তার লক্ষ্য হল "মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা, এটি যেভাবে আছে সেভাবে কেন আছে, এবং কেন অস্তিত্বশীল।"

কসমোলজিস্ট শনক্যারল লিখেছেন, "আমরা বাস্তবতার একটি সম্পূর্ণ, সুসংগত এবং সহজভাবে বোঝার সন্ধান করছি"। ব্রায়ান গ্রিন, একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, জোর দিয়ে বলেছেন যে "মহাবিশ্বের একটি চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ার জন্য সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করবে"।[৮৯]

বিজ্ঞানীদের এমন চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অনুসন্ধান আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের জানান দেয়, ঠিক কোন ধরনের ব্যাখ্যা আসলে চূড়ান্ত হতে পারে? নির্ভরশীল অস্তিত্ব কি চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে? নাকি একটি অপরিহার্য বাস্তবতা বা অপরিহার্য অস্তিত্বের মধ্যেই আমাদের মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নিহিত?

নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউসের মতে, চূড়ান্ত নির্ভরশীল বাস্তবতার মূল ভিত্তি হলো 'নাথিং'। তবে তার ব্যবহৃত 'নাথিং' শব্দটি প্রকৃত শূন্যতা নয়; বরং এর মধ্যে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের আইন ও শর্তাবলি। তাই প্রশ্ন ওঠে–এই তথাকথিত 'নাথিং' কি আসলেই শূন্য? সচেতন মন স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইবে–এই পদার্থবিজ্ঞানের আইন ও শর্তগুলোর উৎস কী? কেন এগুলো অস্তিত্বশীল? এগুলোর অস্তিত্ব কি একেবারে অনিবার্য, নাকি এর পরিবর্তে অন্য কোনো আইন থাকতে পারত? প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো আইন বা শর্তও বাস্তবতা হতে পারত।

ফলে, ক্রাউসের 'নাথিং' কোনো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে না। বরং এটি নিজেই একটি অপূর্ণ ধারণা, যা অস্তিত্বের গভীরতম প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ।

---

৮৮ Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7

৮৯ Alexander R. Pruss and Joshua L. Rasmussen; Necessary Existence ; Page: 4

এই তথাকথিত শূন্যতা আসলে এক রূপক মাত্র, যা অস্তিত্বের মূলে থাকা প্রকৃত রহস্যকে প্রকাশ করতে অক্ষম।

অনিবার্য অস্তিত্ব অন্টোলজির আলোচনাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ও গভীরতর প্রাসঙ্গিকতা রাখে। অন্টোলজিস্টরা বাস্তবতার মৌলিক কাঠামো এবং তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। বাস্তবতাকে সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথমত, কনক্রিট বাস্তবতা–যা পদার্থ এবং ঘটনা নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়ত, বিমূর্ত বাস্তবতা–যার মধ্যে রয়েছে সংখ্যা, সম্পর্ক, এবং ধারণাগত কাঠামো। তৃতীয়ত, মানসিক বাস্তবতা–যা অভিজ্ঞতা, চেতনা, এবং অনুভূতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অনেক দার্শনিকের মতে, এই তিন ধরনের বাস্তবতার পার্থক্য নির্ভরশীল ও অপরিহার্য অস্তিত্বের পার্থক্যের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তবে প্রশ্ন হলো–কনক্রিট বাস্তবতা কি অনিবার্য অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি এমন কোনো কনক্রিট বাস্তবতা থাকে যা রিয়ালিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ও অপরিহার্য, তবে কনক্রিট বাস্তবতা অনিবার্য অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার গভীরে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের চারপাশের কনক্রিট বাস্তবতার কোনো কিছুই চূড়ান্তভাবে অপরিহার্য নয়। এগুলো মূলত নির্ভরশীল, এবং এগুলোর বিকল্প বাস্তবতা বা সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও ভিন্নতর হতে পারত।

ধর্মতত্ত্বেও অনিবার্য অস্তিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধর্মতত্ত্বে অনিবার্য অস্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রায় সকল ধর্মেই স্রষ্টাকে অনিবার্য অস্তিত্ব হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনিবার্য বৈশিষ্ট্য ও আকস্মিক বৈশিষ্ট্য

অনিবার্য বৈশিষ্ট্য (Essential Properties) বলতে বোঝায়, এমন গুণাবলি যা কোনো সত্তার অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ এবং সমস্ত সম্ভাব্য জগতে তা অপরিবর্তনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিভুজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর তিনটি বাহু। কোনো সম্ভাব্য জগতেই এমন কোনো ত্রিভুজ কল্পনা করা সম্ভব নয়, যার তিনটি বাহু নেই। সুতরাং, তিন বাহু ত্রিভুজের একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। আরেকটি উদাহরণ ধরা যাক–একজন ব্যাচেলরের। ব্যাচেলর শব্দের সংজ্ঞা হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিবাহিত নন। এই সংজ্ঞার আলোকে, প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে একজন ব্যাচেলর সবসময় অবিবাহিতই থাকবেন। এমন কোনো জগৎ কল্পনা করা সম্ভব নয় যেখানে একজন ব্যাচেলর বিবাহিত। সুতরাং, অবিবাহিত হওয়া একজন ব্যাচেলরের জন্য একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।

অপরপক্ষে, আকস্মিক বৈশিষ্ট্য (Accidental Properties) হলো এমন গুণাবলি যা বাধ্যতামূলকভাবে কোনো সত্তার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং যা পরিবর্তনযোগ্য। আকস্মিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি বলা যায় যে সত্তার অস্তিত্বে এ বৈশিষ্ট্য থাকাও যেমন সম্ভব, তেমনই না থাকাও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষের ক্ষেত্রে মরণশীলতা একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য, কারণ সমস্ত মানুষের ওপর এ সত্যটি প্রযোজ্য। কিন্তু তার অবস্থান বা পেশা আকস্মিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। ধরা যাক, মাজেদ আল-নোয়াব একজন ইসলামিক স্কলার। ইসলামিক স্কলার হওয়া তার একটি আকস্মিক বৈশিষ্ট্য। তিনি বাধ্যতামূলকভাবে স্কলার হবেন এমন কোনো শর্ত

নেই; তিনি দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা কোনো অন্য পেশার মানুষও হতে পারতেন। তবে মাজেদ আল-নোয়াব মরণশীল–এটি তার একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য, কারণ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই এটি অপরিহার্য।

সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং অসম্ভাব্য অস্তিত্ব

সম্ভাব্য অস্তিত্ব বলতে বোঝানো হয় এমন একটি হাইপোথেটিক্যাল বা কাল্পনিক পরিস্থিতি, যেখানে কোনো সত্তা বা বস্তুর বর্তমান অবস্থা ভিন্নভাবে বিদ্যমান হতে পারতো। সহজ ভাষায়, কোনো কিছুর অস্তিত্ব যেভাবে রয়েছে, ঠিক সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতে পারতো, তা-ই সম্ভাব্য অস্তিত্ব। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করছেন, তার রং কালো। তবে মোবাইলটি কালো না হয়ে সাদা, নীল, কিংবা অন্য যে কোনো রঙের হতে পারত। এ সম্ভাব্য রঙগুলোই মোবাইলটির বর্তমান অবস্থার বিকল্প বা অল্টারনেটিভ সিনারিও।

তবে সম্ভাব্য অস্তিত্বের আলোচনা করতে গেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো; অল্টারনেটিভ পরিস্থিতি বা বিকল্প সম্ভাবনাগুলো অবশ্যই ল অব লজিক বা যুক্তির নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, বিকল্পগুলি এমন হতে হবে যা যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোবাইল ফোনটির রং কালো। এটি কালো রং ছাড়াও সাদা, নীল বা অন্য কোনো রং হতে পারত। কিন্তু যদি বলা হয়, মোবাইলটি একই সময়ে একই সাথে কালো এবং সাদা রং ধারণ করে, তবে তা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। আবার, কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহিত হন, তবে তিনি একই সঙ্গে বিবাহিত এবং অবিবাহিত হতে পারবেন না। কারণ এটি যৌক্তিকভাবে অসংগত। তাই, ফিলোসফির মোডাল লজিক অনুযায়ী, যা কিছু যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না, তা-ই সম্ভাব্য অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, যা কিছু যুক্তির নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা অসম্ভব বা অসম্ভাব্য অস্তিত্ব।

সম্ভাবনার ধরন

সম্ভাব্যতা (Possibility) মূলত দুই প্রকারে বিভক্ত: যৌক্তিক সম্ভাব্যতা এবং বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা। এই দুইটি ধারণা বাস্তবতা এবং সম্ভাবনার পরিসীমাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকিত করে।

যৌক্তিক সম্ভাব্যতা (logically possible) বলতে বোঝায় এমন সব কিছু যা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ল অব লজিক অনুযায়ী, যা কিছু যুক্তিসংগত এবং কোনো সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি করে না, তাই যৌক্তিকভাবে সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ: একজন অবিবাহিত মানুষের কোনো স্ত্রী থাকবে না, একজন মানুষের একাধিক টি-শার্ট থাকা সম্ভব। এই দাবিগুলো প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে সত্য, কারণ এগুলোতে কোনো যৌক্তিক সাংঘর্ষিকতা নেই। তবে, যদি বলা হয়; একজন অবিবাহিত মানুষের স্ত্রী রয়েছে, একটি বর্গাকার বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব, একটি ত্রিভুজের পাঁচটি বাহু বা কোণ থাকতে পারে। এই দাবিগুলো প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে, কারণ সেগুলো যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান করে। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার মূল কথা হলো–যা কিছু যুক্তির নিয়মগুলোর পরিপন্থি নয়, তা-ই যৌক্তিকভাবে সম্ভাব্য।

অপরপক্ষে, বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা (scientifically possible) হলো, আমাদের মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট নিয়মের আলোকে নির্ধারিত। আমাদের জগতের প্রকৃতি

কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলে, যা লঙ্ঘন করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কনক্রিট জগতে আলোর গতি ধ্রুবক, এবং এটি ভঙ্গ করা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। অথবা, কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই মানুষ আকাশে উড়তে পারে না। এগুলো বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সীমার মধ্যে সত্য। তবে, বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব বলেই যে তা যৌক্তিকভাবেও অসম্ভব, এমনটি নয়। যৌক্তিকভাবে এমন একটি সম্ভাব্য জগৎ কল্পনা করা যায় যেখানে আলোর গতি ধ্রুব নয় বা মানুষ কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই আকাশে উড়তে পারে।

যৌক্তিক সম্ভাব্যতা এবং বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, যৌক্তিক সম্ভাব্যতা যুক্তিবিদ্যার সীমার মধ্যে যা সম্ভব তা নির্ধারণ করে, যেখানে বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা আমাদের মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে সম্ভাবনার সীমানা নির্দেশ করে। যৌক্তিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র বিশাল ও অবারিত, যেখানে বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা কেবল আমাদের মহাজাগতিক নিয়মের আওতায় সীমাবদ্ধ। সুতরাং, যৌক্তিকভাবে সম্ভব এমন অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব হতে পারে। এই দুই প্রকার সম্ভাব্যতার আলোচনায় আমরা বাস্তবতার পরিধি ও সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতাকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি।

নির্ভরশীল অস্তিত্ব (contingent existence)

নির্ভরশীল অস্তিত্ব (Contingent Existence) বলতে বোঝায়, যেগুলো অস্তিত্বে নাও থাকতে পারতো কিংবা যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্য কোনোভাবে থাকতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ, আমি বা আপনি জন্মগ্রহণ না-ও করতে পারতাম। তাই, আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। মোডাল লজিক অনুসারে, যা কিছু তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল এবং যা বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বশীল নয়, তাই নির্ভরশীল অস্তিত্ব।

আমাদের এই মহাবিশ্বে যা কিছু আমরা অনুভব করি বা পর্যবেক্ষণ করি, তা সবই নির্ভরশীল। এই পৃথিবী, প্রকৃতি, আপনি যে চেয়ারটিতে বসে আছেন, এমনকি সেই বইটিও যার পাতায় আপনি এই লেখা পড়ছেন–সবই নির্ভরশীল অস্তিত্ব। কারণ, এগুলোর অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক নয়; এগুলো নাও থাকতে পারতো, কিংবা অন্য কোনো রূপ ধারণ করতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যে চেয়ারটি ব্যবহার করছেন, সেটি তৈরি না-ও হতে পারতো। বা, তৈরি হলেও আপনি সেটি কিনতেন না। আবার, সেটি ভিন্ন নকশা বা রঙে তৈরি হতে পারতো।

যে কোনো নির্ভরশীল সত্তার অস্তিত্বের জন্য একটি কারণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, এটি অস্তিত্বশীল কেন? এটি কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে? এর আকৃতি এমন কেন হলো? এটি কি নিজের আকৃতি নিজেই নির্ধারণ করেছে, নাকি এটি অন্য কারো দ্বারা নির্ধারিত?

যা কিছু অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল, তার অস্তিত্ব নেসেসারি বা অনিবার্য নয়। বরং তা কেবল সম্ভাব্য বা অপ্রয়োজনীয় । উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার অস্তিত্বের জন্য তার বাবা-মা, অক্সিজেন, খাবার, এবং অন্যান্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা প্রমাণ করে যে এই সত্তার অস্তিত্ব অনিবার্য নয়, বরং এটি কেবল সম্ভাব্য ও নির্ভরশীল। দর্শনের পরিভাষায়, অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বোঝায় এমন সত্তা যার অস্তিত্ব অনিবার্য–যার অস্তিত্ব না থাকা অসম্ভব। এর অস্তিত্ব

নেই, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। অপরদিকে, নির্ভরশীল অস্তিত্ব হলো এমন সত্তা, যা জরুরি নয়; তার অস্তিত্ব না থাকলেও বাস্তবতায় তেমন কোনো তারতম্য ঘটত না। সুতরাং, নির্ভরশীল অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের জন্য সর্বদাই অন্য কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল। এটি নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হতে পারে না এবং এর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা অন্য কোনো শক্তি বা কারণের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নির্ভরশীল অস্তিত্বের কারণ কী?

PSR অনুযায়ী প্রতিটি নির্ভরশীল সত্তার অস্তিত্বের জন্য কোনো না কোনো কারণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এ ধরনের সত্তাগুলোর অস্তিত্বের মূলে কী কারণ নিহিত রয়েছে, বা কোন শক্তি, প্রক্রিয়া, কিংবা নীতির উপর এগুলো নির্ভরশীল, তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রশ্নটি এখানেই কেন্দ্রীভূত হয়; এই নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো কি তাদের কারণ অন্য কোনো নির্ভরশীল সত্তা থেকে লাভ করে, নাকি একটি চূড়ান্ত, অনিবার্য বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে? নাকি নিছক শূন্য থেকেই এসেছে?

শূন্য থেকে সৃষ্টি?

কোনো কিছুই শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না—এই সত্য যুক্তির পথ ধরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচলিত অর্থে শূন্য বলতে বোঝায় যাবতীয় পদার্থ, শক্তি, কিংবা সম্ভাব্য সকল বিষয়ের অনুপস্থিতি। শূন্যতা মানে এমন এক অবস্থা, যেখানে কোনো কারণ নেই, পরিবেশ নেই, এমনকি অস্তিত্বের সম্ভাবনাও নেই। তাহলে, অস্তিত্বহীন কিছু থেকে কিছু অস্তিত্বে আসবে কীভাবে? অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। শূন্যতা থেকে কিছুই আসবে না; যেমন গণিতে শূন্যে যত শূন্য যোগ করা হোক, ফলাফল শূন্যই থাকবে। কখনোই তা তিন বা অন্য কোনো সংখ্যায় রূপান্তরিত হবে না।

ধরা যাক, গতকাল রাতে আপনি বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে বিরিয়ানি খেলেন, কিন্তু সেটা আসলে কিছুই ছিল না! এই দাবি শুনে যে কেউ বিস্মিত হবে। অন্য উদাহরণ ধরুন: পরীক্ষার হলে আপনার পাশে কেউ বসেনি, তবুও তারা নাকি আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দেখিয়েছে! এটি কি সম্ভব? আরেকটি উদাহরণ কল্পনা করুন: আপনি একটি অন্ধকার, বন্ধ ঘরে আটকে আছেন। দরজা-জানালা বন্ধ, কোনো সাহায্য পাওয়ার সুযোগ নেই। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখলেন, ঘরটিতে এমনি এমনি একটি টেবিল এসেছে, তার উপর রয়েছে একটি ল্যাপটপ, বিদ্যুৎ সংযোগ, এমনকি ইন্টারনেট! কোনো যুক্তিবাদী, বিবেকবান ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিকে বাস্তব বলে মানতে পারবেন না। 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' ধারণাটিও এমনই হাস্যকর এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত। অনেক নাস্তিক দাবি করতে পারে, কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের শূন্যতা থেকে কণিকা অস্তিত্বশীল হতে পারে। কিন্তু কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম আসলে কোনো শূন্য স্থান নয়। এটি একটি ক্ষণস্থায়ী শক্তির অবস্থা, যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম কার্যকর। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় কণা ও প্রতিকণা সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতাও নিজেই একটি ভৌত বাস্তবতা।[১০]

---

[১০] Physics - The Force of Empty Space (aps.org)

স্ব-সৃষ্ট?

কোনো নির্ভরশীল অস্তিত্ব নিজেই নিজের সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। যেমন, আপনি নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবেন না, একটি আপেল নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবে না, এমনকি সমগ্র মহাবিশ্বও নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে অক্ষম।

সৃষ্টির অর্থ হলো, কোনো কিছু অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আসা। অর্থাৎ, যা আগে ছিল না, পরে তা অস্তিত্বশীল হয়েছে। Principle of sufficient reason (PSR) অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য সব কিছুর অবশ্যই পর্যাপ্ত কারণ বা ব্যাখ্যা থাকবে। যদি কোনো কিছু নিজেই নিজের সৃষ্টির কারণ হয়, তবে তাকে অস্তিত্বে আসার আগে থেকেই অস্তিত্বের কারণ হিসেবে অস্তিত্বে থাকতে হবে। এই ধারণা স্ববিরোধী এবং চিরকালই যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এখন, সৃষ্টির পূর্বশর্ত অনুযায়ী, তাকে প্রথমে অস্তিত্বহীন থাকতে হবে। কিন্তু যদি সে নিজেই নিজের কারণ হয়, তাহলে অস্তিত্বে আসার জন্য তাকে আগে থেকেই অস্তিত্বশীল হতে হবে। এটি একসঙ্গে দুই বিপরীত অবস্থা দাবি করে; সে একই সময়ে অস্তিত্বে আছে এবং নেই।

এটি Lwo of Logic এর দ্বিতীয় সূত্র Low of Non-contradiction কে ভায়োলেট করে। এটা Principle of noncontradiction (PNC) নামেও পরিচিত। Low of Non-contradiction বলতে বুঝানো হয়, কোনো বস্তুকে একই সময়ে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক অবস্থায় থাকতে পারে না। যেমন, N= True, N= False. এখানে N একই সাথে সত্য আবার মিথ্যা। অথবা, একটি বৃত্ত একইসঙ্গে বর্গাকার হতে পারে না। কোনো জিনিসই একই সময় পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক অবস্থায় থাকা সম্ভব না। সুতরাং, কোনো নির্ভরশীল অস্তিত্ব নিজেই নিজের সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। এটি শুধু যৌক্তিক সূত্র নয়; এটি বাস্তবতার গভীর অন্তর্নিহিত সত্য।

যে সূত্রটিকে আমরা Principle of noncontradiction (PNC) হিসেবে জানি, তা এমন এক স্বতঃসিদ্ধ নীতি, যা অস্বীকারের উর্ধ্বে। ধরা যাক, সিফাত নামের এক লোক বললো যে সে Principle of noncontradiction কে অস্বীকার করে। যেহেতু, সে Principle of noncontradiction বিশ্বাস করে না সেহেতু তার মতে কোনো জিনিস একই সাথে সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে। অর্থাৎ, তার বিশ্বাস করা আর বিশ্বাস না করা দুটো একই সময়ে একই। সুতরাং, সিফাত যখনই বলেছে সে, Principle of noncontradiction বিশ্বাস করে না ঠিক তখনই তার মতে সে Principle of noncontradiction স্বীকার করে।

অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট?

পরনির্ভরশীল সত্তা কি অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট হতে পারে? কিংবা, আমাদের এই মহাবিশ্ব–যা পরনির্ভরশীল এবং যার অস্তিত্ব শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া বা স্ব-সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব–এটি কি এমন কোনো সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যা আবার অন্য কোনো সত্তা থেকে এসেছে? তর্কের খাতিরে যদি আমরা মেনে নিই, যে মহাবিশ্ব এমন একটি সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যা আবার অন্য কোনো সত্তার দ্বারা সৃষ্টি, তবে সেই সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এবং যদি এর উত্তর আসে, 'অন্য সত্তা,'

'তাহলে সেই সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?' -এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি অবিরাম চলতে থাকবে, যদি না শুরুতেই এমন কোনো অসৃষ্ট সত্তা থাকে, যা সমস্ত সত্তার অস্তিত্বের উৎস ও কারণ।

কার্যকারণ সম্বন্ধ কী অসীম হতে পারে?

যদি কোনো সৃষ্ট সত্তা এমন একটি সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়, যা আবার অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট, তাহলে প্রশ্ন উঠবে; সেই সৃষ্ট সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এমনভাবে প্রশ্নের প্রবাহ অবিরত চলতে থাকবে, একটি প্রক্রিয়া যা সময়ের পর সময় পিছিয়ে যাবে। অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্পর্কের একটি অসীম শৃঙ্খলা তৈরি হবে-একটি অসীম শৃঙ্খলা যা কখনো শেষ হবে না। কিন্তু কোনো নির্ভরশীল অস্তিত্ব অসীম হতে পারে না, কারণ প্রকৃত অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়। কোনো সৃষ্ট সত্তার অস্তিত্বের জন্য যদি অসীম সংখ্যক কারণ থাকে, তবে সেই সত্তা কখনোই অস্তিত্বে আসবে না, বা বর্তমান সময়ে উপস্থিত হবে না।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, কোনো সত্তার অস্তিত্বের জন্য অসীম কারণ রয়েছে, তবে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, এই অসীম ব্যাখ্যায় আপনি প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে আমরা 'X' হিসেবে চিহ্নিত করি, এবং 'X' এর অস্তিত্বের কারণ যদি হয় 'X1', আবার 'X1' এর অস্তিত্বের কারণ যদি হয় 'X2', এবং এভাবে এই কারণের শৃঙ্খলা অবিরত চলতে থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে 'X' কখনোই অস্তিত্বে আসতে পারবে না। কেননা, 'X' এর অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্ভর করতে হবে 'X1' এর উপর, আবার 'X1' এর অস্তিত্ব নিশ্চিত হতে নির্ভর করবে 'X2' এর উপর, এবং এই শৃঙ্খলা যদি অনন্তকাল ধরে চলে, তবে 'X' এর অস্তিত্বে আসার জন্য একান্তভাবে নির্ভর করবে একটি অনন্ত সময় ধরে চলে আসা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপরে। এভাবে, যদি কোনো অস্তিত্ব অসীম সংখ্যক কারণের উপর নির্ভর করে, তবে তা কখনোই অস্তিত্বে আসতে পারবে না। কারণ, এভাবে অনাদিকাল ধরেই চলা সৃষ্ট কিছুর উপর নির্ভর করলে 'অনবস্থা দোষ' (Infinite regress) ঘটবে। এক্ষেত্রে একটি সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হবে অসীম সংখ্যক পূর্ববর্তী সৃষ্টির ওপর, এবং এই অসীম প্রবাহ কখনোই একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টিকে জন্ম দিতে সক্ষম হবে না। কারণ, অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়। অতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য অসীম কারণের শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকলে তা কখনোই বর্তমান সময়ে উপস্থিত হতে পারবে না। সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি কারণহীন কারণ থাকা অনিবার্য, যা সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের সৃষ্টি ঘটানোর জন্য দায়ী।

এটি বুঝতে আমরা একটি চিন্তার পরীক্ষা করি। ধরুন, আপনি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য টিকিট কাটেন এবং বাসে উঠতে যাচ্ছেন। বাসের সামনে কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। ফলে, যাত্রীদের উঠার পর আপনি বাসে উঠতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনার সামনে অসীম সংখ্যক যাত্রী দাঁড়িয়ে থাকে? আপনি কখনোই বাসে উঠতে পারবেন না, কারণ অসীম যাত্রীদের ওঠার জন্য অসীম সময় প্রয়োজন, আর যেহেতু অসীম কখনো শেষ হয় না, তাই আপনার উঠাও হবে না। কিন্তু আপনার সামনে যদি সসীম সংখ্যক যাত্রী থাকে তবে আপনি বাসে উঠতে পারবেন। এখন, এই দৃশ্যপটের সাথে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের তুলনা করুন। এখানে, আপনার বাসে ওঠা = মহাবিশ্ব, এবং আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অসীম যাত্রী =

মহাবিশ্বের কারণ। যদি এইভাবে হয়, তাহলে মহাবিশ্ব কখনোই অস্তিত্বে আসবে না। কারণ, যদি অতীতে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব অসীম কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে এটি কখনোই বর্তমান সময়ে উপস্থিত হতে পারবে না।

দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, "সামগ্রিক অস্তিত্বের (নির্ভরশীল অস্তিত্ব) সেটটি (set) ব্যাখ্যা করার জন্য সেটের বাইরে একটি অনিবার্য অস্তিত্বের প্রয়োজন।"

অসৃষ্ট থেকে সৃষ্ট

যেহেতু নির্ভরশীল অস্তিত্ব নিজে থেকে সৃষ্টি হতে পারে না, শূন্য থেকেও সৃষ্টি হতে পারে না এবং এর কারণ অসীমও হতে পারে না, তাহলে এই পরিস্থিতির বিকল্প একমাত্র এমন একটি সত্তা হতে পারে যা কারণহীন, অর্থাৎ এমন একটি সত্তা যা অস্তিত্বের জন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। এটি এমন একটি সত্তা হবে যা চিরকাল থেকে অস্তিত্বশীল, অনাদী (Eternal)। তার অস্তিত্ব কোনো বাহ্যিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত বা নির্ধারিত হয় না, যা সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে থেকে বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে এই সত্যতা জ্বল জ্বল করছে। পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, "বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই"।[৯১]

মূল যুক্তি

শুরুতেই আমি এই যুক্তিটির ভিত্তি তুলে ধরেছি, তা হলো কার্যকারণ নীতি। অর্থাৎ, যা কিছু অস্তিত্বে থাকতে পারতো না বা বিকল্প অস্তিত্ব হতে পারতো, তার অস্তিত্বের জন্য কোনো কারণ থাকা আবশ্যক। এই যুক্তির মাধ্যমে এটি পরিষ্কার হয় যে, আমাদের মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি বা অনুভব করি, প্রতিটি দৃশ্যমান বা অনুভূত ঘটনা পর-নির্ভরশীল। এ এগুলো অস্তিত্বের জন্য ব্যর্থ হতে পারতো। সে কারণেই এই অস্তিত্বের পেছনে একটি ব্যাখ্যা বা কারণের প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার একমাত্র উপযুক্ত সমাধান হচ্ছে, পর-নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো এমন এক সত্তার উপর নির্ভরশীল, যার অস্তিত্ব মহাবিশ্ব থেকে স্বাধীন। যে সত্তার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, এবং যার অস্তিত্ব চিরন্তন ও অনিবার্য, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব না থাকা অসম্ভব। যদি এমন না হয়, তাহলে পর-নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলোর জন্য আরো একটি পর-নির্ভরশীল কারণ যুক্ত হতে থাকে, যার ফলে কারণের এই অবিরাম ধারাবাহিকতা শেষ হবে না, এবং অশেষ সময় ধরে চলে যেতে থাকবে। এইভাবে, অবশেষে ইনফিনিটি রিগ্রেস ঘটে। এই মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুভব করি, তা যে পর-নির্ভরশীল তা যেভাবে বুঝতে পারি;

১. পরনির্ভরশীল বস্তু বা সত্তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার অপ্রয়োজনীয়তা। অপ্রয়োজনীয়তা। অপ্রয়োজনীয় বলতে বুঝায়, এগুলোর অস্তিত্ব থাকতেই হবে এমন নয়। এই সত্তাগুলোর অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক নয়, এগুলো থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। ধরুন, এক শীতল সকালে আপনি আপনার বন্ধুর সাথে একটি মেঠো পথে হাঁটছেন। হঠাৎ, রাস্তার ধারে একটি ফুটবল দেখতে পেলেন। ফুটবলটি দেখে নিশ্চয়ই আপনি এমনটা কল্পনা করবেন না যে, এটা এমনি এমনি এখানে

---

[৯১] সূরা ইখলাস; ১১২: ১-৪

এসেছে। আপনার মনে প্রশ্ন আসবে, ফুটবলটি এখানে কেন আছে? এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি হতে পারে, কেউ হয়তো ভুল করে এটি এখানে ফেলে দিয়েছে। ফুটবলটি এখানে থাকার প্রয়োজন ছিল না, অর্থাৎ এটি অনিবার্য নয়। এটার এখানে থাকার পেছনে কোনো বিশেষ কারণ ছিল। সেই ব্যক্তি যিনি এখানে রেখে গেছে, তিনি হয়তো এটা এখানে নাও রাখতে পারতেন। ফুটবল উৎপাদনকারী কোম্পানি এটিকে তৈরি না-ও করতে পারতো, এবং যে ব্যক্তি এটি কিনেছেন, তিনি এটা না কিনেও থাকতে পারতেন। সুতরাং, ফুটবলটি এখানে থাকার জন্য একটি কারণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এটি একটি পর-নির্ভরশীল বস্তু।

একইভাবে আমাদের এই মহাবিশ্ব যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তা না-ও হতে পারতো। মহাবিশ্বের অস্তিত্বও না থাকতে পারতো। এর বর্তমানে বিদ্যমান নিয়মগুলো যেমন আছে, ঠিক তেমন নাও হতে পারতো। কারণ, এগুলোর মধ্যে কোনো যৌক্তিক সাংঘর্ষিকতা নেই, বা এগুলো এমন কিছু নয় যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কেউ হয়তো বলবেন যে, মহাবিশ্বের বর্তমান নিয়মগুলো যদি বিপরীত হয়ে যেত, তবে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু এই দাবি, কেবল প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বের বর্তমান নিয়মগুলো, তার প্রকৃত অবস্থায় না থাকা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। আমরা ইতোমধ্যে সম্ভাব্য অস্তিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে দেখা গেছে যে, যেকোনো কিছু, যা যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিক নয়, সেটি অস্তিত্বে থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব হওয়ার মানে এই যে তার অস্তিত্ব থাকতে পারতো না। সুতরাং, মহাবিশ্ব যেভাবে আছে, তা না-ও হতে পারতো, বা এর অস্তিত্ব না-ও থাকতে পারতো। এটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব ছিল।

২. কোনো জিনিসের উপাদানগুলোকে যদি যেভাবে আছে তার বিপরীতেও ব্যাখ্যা করা যায় সেক্ষেত্রেও সেটা পর-নির্ভরশীল। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুণ;

একটি সন্ধ্যার কথা কল্পনা করুন–মৃদু আলোর ছায়া আর সোডিয়াম বাতির দ্যুতিতে আলোকিত এক শূন্য রাস্তা। সেই রাস্তায় আপনি আর আপনার বন্ধু হাঁটছেন দিকভ্রান্ত পথিকের মতো। হঠাৎ গোল চত্বরে পৌঁছেই আপনার চোখে পড়ল ফুল দিয়ে সাজানো তিনটি শব্দ–'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এমন দৃশ্য দেখে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; ফুলগুলো এভাবে না সাজিয়ে অন্যভাবেও তো রাখা যেত! যেমন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'-এর পরিবর্তে 'আমি তোমাকে পছন্দ করি' লেখা যেতে পারত। কারণ এভাবে না হয়ে অন্যভাবেও সজ্জিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব কিছু নয়। যেহেতু এ বিন্যাসটি অপরিহার্য নয় এবং অন্য রূপ ধারণ করতে পারত, তাই এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ফুলগুলো তো গাছে থাকার কথা, তবে কেন এগুলো রাস্তার উপর সাজানো হলো? কেউ যদি বলে এগুলো এমনি এমনি এমনভাবে সজ্জিত হয়েছে, আপনি তাকে হয়তো মানসিক অসঙ্গতিতে ভুগছে বলে বিবেচনা করবেন। বরং যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা হবে–কেউ একজন গাছ থেকে ফুলগুলো সংগ্রহ করেছে এবং রাস্তার উপর সাজিয়ে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিন্যাস করেছে। এটাই হলো ওই বিন্যাসের বাহ্যিক কারণ। তাই, এই বিন্যাস নির্ভরশীল–এটি নিজে থেকে হয়নি।

ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্বের অবস্থাও বিবেচ্য। এই মহাবিশ্ব যেমনভাবে সজ্জিত, তা সম্পূর্ণ উল্টোভাবেও থাকতে পারত। এর ভৌত নিয়ম ও উপাদানগুলো অন্য রূপ ধারণ করতে পারত। যেমন, পৃথিবীতে প্রাণ টিকে থাকার

জন্য চাঁদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাঁদ পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে থাকার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এই ভারসাম্য না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত যে, এখানে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে যেত। তবুও, এমন একটি সম্ভাব্য জগৎ কল্পনা করা যায়, যেখানে চাঁদের অস্তিত্বই নেই, অথবা পৃথিবীই নেই। কারণ চাঁদ বা পৃথিবীর অস্তিত্ব না থাকাও যুক্তির দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং, মহাবিশ্বের উপাদানগুলো যেভাবে বিদ্যমান, সেগুলো তার বিপরীত দিকেও থাকতে পারত। এই কারণেই বলা যায়, মহাবিশ্ব পর-নির্ভরশীল।

৩. পরনির্ভরশীল সত্তার আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর রূপগত গুণাবলীর সীমাবদ্ধতা। এ গুণাবলি বলতে বোঝায় এর রং, আকার, ভর, তাপমাত্রা, আকৃতি ইত্যাদি। আমাদের মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুরই নির্দিষ্ট রং, আকার, ও আকৃতি রয়েছে। তবে এগুলো যেভাবে আছে, তা ভিন্নভাবেও হতে পারতো। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি, এগুলো এর বিপরীত রূপে বিদ্যমান থাকতে পারতো। এই পরিবর্তনশীলতা ইঙ্গিত দেয় যে, এগুলো নিজেরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেনি। বরং, কেউ বা কিছু এগুলোকে এভাবে নির্ধারণ করেছে। তা না হলে, কেন কোনো বস্তুর আকার বা রং এরকম হলো, অন্যরকম হলো না? কেন এগুলো এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করল?

একটি ফুটবলের উদাহরণ ধরুন। ফুটবল হাতে নিয়ে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন না যে, ফুটবল নিজেই নিজের রং, আকার, বা ভর নির্ধারণ করেছে। এর রূপগত গুণাবলীর জন্য এটি অবশ্যই কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল। আবার, ধরা যাক, আপনি একটি কেক অর্ডার করলেন। কেক খাওয়ার পর আপনার ছোট ভাই বলল, "এই কেকের স্বাদ, আকার, রং এমনই হওয়া অনিবার্য।" এটি নিশ্চয়ই যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ, কেকের স্বাদ, আকার ও রং সম্পূর্ণ নির্ভর করে কেক প্রস্তুতকারকের উপর। কেক নিজেই নিজের রূপ ও গুণাবলীর সিদ্ধান্ত নেয়নি। সুতরাং, যেসব জিনিসের রূপগত গুণাবলিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলো পরনির্ভরশীল।

এই যুক্তিকে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, আমাদের মহাবিশ্বের আকার, তাপমাত্রা, রং এবং নিয়মগুলোও এভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ, গাছের পাতা সবুজ না হয়ে অন্য কোনো রঙের হতে পারতো। প্রকৃতির নিয়মাবলীও বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারতো। কিন্তু এগুলো যেভাবে বিদ্যমান, তা নিজে থেকেই এমন হয়নি। মহাবিশ্ব নিজেই নিজের রূপ নির্ধারণ করেনি, নিয়মগুলো তৈরি করেনি। এই অবস্থা প্রমাণ করে, মহাবিশ্বের রূপগত গুণাবলি কেউ না কেউ নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, এই সীমাবদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার যুক্তি থেকেই বোঝা যায়, মহাবিশ্ব একটি পরনির্ভরশীল অস্তিত্ব।

৪. পরনির্ভরশীল সত্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সসীমতা। আমাদের মহাবিশ্ব এবং এর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুরই সসীম রূপ ও গঠন রয়েছে। যা কিছু আমরা অনুভব করি, পর্যবেক্ষণ করি–সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই মহাবিশ্বের একটি সূচনা মুহূর্ত রয়েছে। এটি প্রমাণ করে, আমাদের মহাবিশ্ব অনন্ত নয়, বরং সসীম। এ বিষয়ে "মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরনির্ভরশীলতার এসব বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। আমরা অনুভব করি ও পর্যবেক্ষণ করি যে, আমাদের মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই পরনির্ভরশীল। সুতরাং, মহাবিশ্বের প্রতিটি সত্তাই এমন কিছুর উপর নির্ভরশীল, যা নিজে থেকে সৃষ্ট বা অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা বুঝতে পারা আমাদের সামনে মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য উন্মোচনের দ্বার উন্মুক্ত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটা ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি। যুক্তির বিবৃতি নিম্নরূপ;

- P1: Everything that exists has an explanation of its existence. (যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন)
- P2: The universe exists. (মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল)
- P3: Therefore, the universe has an explanation for its existence. (অতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যাখ্যা আছে)
- P4: That explanation is either explained by its own nature or some external thing. (সেই ব্যাখ্যাটি হয় তার নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারা অথবা কোন বাহ্যিক জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।)
- P5: The explanation is a necessary Being/ God. (সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে অনিবার্য অস্তিত্ব বা স্রষ্টা।)
- Conclusion: Therefore, God exists. (সুতরাং, স্রষ্টা অস্তিত্বশীল)

ব্যাখ্যা;

- **P1: Everything that exists has an explanation of its existence. (যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন)**

PSR নিয়ে আলোচনাতে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। সুতরাং, P1 সত্য।

- **P2: The universe exists. (মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল)**

আমাদের মহাবিশ্বের অস্তিত্ব এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা কোনো যুক্তি কিংবা প্রমাণ ছাড়াই সহজে স্বীকৃত। কারণ মহাবিশ্বের অস্তিত্বই আমাদের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, এবং চিন্তার মঞ্চ তৈরি করে। তাই এই বিষয়ের বিপরীতে কেউ যদি দ্বিমত পোষণ করে, তার দায়িত্ব হবে যুক্তি-সহ প্রমাণ উপস্থাপন করা যে, কেন মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল নয়। তবে এই দাবি কেবল যুক্তিহীনই নয়, এর পক্ষে কোনো যুক্তি দাঁড় করানোও প্রায় অসম্ভব। কারণ, মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গেলে তাকে এমন একটি অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দিতে হবে, যা নিজেই বাস্তবতার ভিত্তি অস্বীকার করে। অথচ বাস্তবতা ছাড়া যুক্তি কিংবা প্রমাণের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব এক অমোঘ এবং অনস্বীকার্য সত্য। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, প্রেমিস-২ (P2) সত্য।

- **P3: Therefore, the universe has an explanation for its existence. (অতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যাখ্যা আছে)**

P1 এবং P2 থেকে আমরা জেনেছি যে যা কিছু অস্তিত্বে আছে তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেহেতু, আমাদের এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল সেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং, P1 এবং P2 এর মতো P3 সত্য হতে বাধ্য।

- **P4: That explanation is either explained by its own nature or some external thing. (সেই ব্যাখ্যাটি হয় তার নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারা অথবা কোন বাহ্যিক জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।)**

মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে–এর একটি সূচনা আছে, যা তার নির্ভরশীলতার প্রমাণ বহন করে। আর এই নির্ভরশীলতার কারণেই এর অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তবে, এই ব্যাখ্যা হতে হবে কোনো বাহ্যিক কারণ থেকে উৎসারিত। 'মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব' অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে অস্তিত্বশীল নয়। এর শুরু আছে, যা স্পষ্ট করে যে এটি একসময় অস্তিত্বে ছিল না। যেহেতু, আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, এটার শুরু আছে, এটা নির্ভরশীল, তাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটি অবশ্যই বাহ্যিক কোনো কারণ হতে হবে।

আর 'নির্ভরশীল অস্তিত্ব' অংশে আমরা দেখিয়েছি, কোনো কিছুর অস্তিত্ব এমন হলে, যা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, তাহলে তা নির্ভরশীল। একইভাবে, কোনো কিছু যেভাবে আছে, তা যদি অন্যভাবে রূপান্তর করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটিও নির্ভরশীল। আমাদের এই মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়, অনুভব করা যায়, তা এমন কিছু নয় যা বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বশীল হতে হবে। আমরা মহাবিশ্বকে যেমনভাবে দেখি, তা সহজেই এর বিপরীত আকারেও কল্পনা করা সম্ভব। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো অনিবার্য নয়, বরং আকস্মিক। এই কারণেই আমরা বলি, আমাদের মহাবিশ্ব পরনির্ভরশীল। এখানে যা কিছু বিদ্যমান, তা চিরন্তন বা স্বাধিকারসম্পন্ন নয়; বরং এগুলো সসীম এবং বাহ্যিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল।

পরনির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো কখনোই নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। মহাবিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয়। এর অস্তিত্ব স্বসৃষ্ট হতে পারে না, কারণ, 'নির্ভরশীল অস্তিত্ব কি স্বসৃষ্ট?' অংশে আমরা দেখিয়েছি স্বসৃষ্টির ধারণা স্ববিরোধী। এই মহাবিশ্ব, এর সূচনা, এবং এর নান্দনিক সজ্জার প্রতিটি উপাদান আমাদের এমন একটি বাস্তবতার দিকে যায় যে, আমাদের এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য একটি বাহ্যিক কারণের প্রয়োজন। এটি এমন এক বাস্তবতা যা চিরন্তন, স্বাধীন এবং পরম।

- **P5: The explanation is a necessary Being/ God. (সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে অনিবার্য অনিবার্য অস্তিত্ব বা স্রষ্টা।)**

PSR থেকে আমরা গভীরতর এক উপলব্ধি অর্জন করেছি–অস্তিত্বের জন্য সবকিছুরই কোনো না কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা অনিবার্য অস্তিত্ব

এবং নির্ভরশীল অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। নির্ভরশীল অস্তিত্ব সবসময়ই নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো সত্তার ওপর নির্ভরশীল। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোনো সত্তা অস্তিত্বে আসার জন্য কার্যকারণ সম্পর্ক অসীম চক্রে আবদ্ধ হতে পারে না। 'কার্যকারণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে?' শিরোনামে আমরা এই বিষয়টি ইতোমধ্যেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি। যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব পরনির্ভরশীল এবং এমন কোনো পরনির্ভরশীল সত্তা বা অস্তিত্ব নেই যা কারণহীনভাবে বিদ্যমান, তাই এটি কার্যকারণ সম্পর্কের শেষ বিন্দুতে পৌঁছানোর দাবি তোলে।

এই দাবির নির্যাস হলো–মহাবিশ্বের অস্তিত্বের মূল ব্যাখ্যা একটি এমন সত্তা, যা কারণহীন কারণ। এটি এমন কিছু, যা স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল। কারণ যদি সেই কারণ নিজেই স্বাধীন এবং অনিবার্য না হয়, তবে তা কার্যকারণের অসীম চক্রে পতিত হবে। আর এই চক্রে পতিত হলে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিই সম্ভব হতো না। অতএব, একটি চূড়ান্ত সত্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য–একটি সর্বোচ্চ বাস্তবতা যা কারণহীন কারণ, সবকিছুর ভিত্তি। এই অনিবার্য সত্তা ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্ব, তার সূচনা এবং তার পরম শৃঙ্খলার কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সুতরাং, P5 অমোঘ সত্য।

- **Conclusion: Therefore, God exists. (সুতরাং, স্রষ্টা অস্তিত্বশীল)**

কারণহীন কারণ, স্বাধীনতা, স্ব-নির্ভরতা, চিরন্তনতা এবং অনিবার্য অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র স্রষ্টার প্রকৃতির সঙ্গেই সুষমভাবে মিলে যায়। স্রষ্টা সেই পরম বাস্তবতা, যিনি নিজে কারণহীন এবং যার অস্তিত্ব অন্য কোনো সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয়। ডিডাক্টিভ যুক্তি অনুসারে, যদি প্রাথমিক অনুমান বা প্রেমিস (P) সত্য হয়, তবে তার থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত (Conclusion) অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্য হতে বাধ্য। এই যুক্তির আলোকেই 'স্রষ্টা অস্তিত্বশীল'–এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি অমোঘ সত্য ও অবধারিত। অতএব, যুক্তি, দর্শন এবং বাস্তবতার সম্মিলনে এই সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে এক পরম সত্যের ঘোষণা দেয়–এক স্রষ্টার অস্তিত্ব, যিনি পরম স্বাধীন, যাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন এবং যাঁর দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির শৃঙ্খলা নির্ধারিত।

স্রষ্টার প্রকৃতি

স্রষ্টা হলেন প্রাকৃতিক জগতের সীমার বাইরের এক অতিপ্রাকৃত সত্তা, যিনি চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ বাস্তবতা। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, নিখুঁত, এবং অনন্য এক সত্তা, যিনি একমাত্র উপাসনার যোগ্য। বহু দার্শনিকের অভিমত, স্রষ্টার প্রকৃতি তিনটি মূল গুণে সমৃদ্ধ–সর্বশক্তিমানতা, সর্বজ্ঞতা, এবং এককত্ব। এই গুণাবলি তাঁকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে, সুনিপুণভাবে অপরিহার্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁকে উপাসনার যোগ্য করে তোলে। স্রষ্টার এই গুণগুলো তাঁর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বজ্ঞতার অর্থ হলো–তিনি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন; তিনি যা কিছু জানা সম্ভব, তার সবই জানেন। সর্বশক্তিমানতা বোঝায়–তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, যা কিছু যৌক্তিকভাবে সম্ভব। আর এককত্বের অর্থ হলো–তাঁর সমতুল্য কেউ নেই; তিনি স্বাধীন, স্বনির্ভর, এবং অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। এই গুণাবলির পরিপূর্ণতায় স্রষ্টা অনন্য ও পরম এক অতুলনীয় সত্তা, যাঁর মহিমা আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি শ্বাসে প্রতিফলিত হয়।

স্রষ্টা সর্বশক্তিমান

স্রষ্টার গুণাবলীর মধ্যে সর্বশক্তিমানতা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসঙ্গে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিষয়ের উপর আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলছে। নাস্তিকগণ প্রায়ই 'Omnipotence Paradox' ব্যবহার করে স্রষ্টার সর্বশক্তিমানত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাদের যুক্তি এভাবে উঠে আসে; 'স্রষ্টা কি এমন একটি পাথর সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন?' যদি তিনি পারেন, তাহলে তাঁর সর্বশক্তিমানত্ব খর্ব হয়, কারণ তখন এমন একটি বস্তু থাকবে যা তিনি তুলতে পারেন না। আবার, যদি তিনি তা করতে না পারেন, তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান নন, কারণ এমন কিছু থাকবে যা তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম। যাই হোক, এই প্যারাডক্স এবং তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ আমরা পরবর্তী অংশে গভীরভাবে আলোচনা করব। তবে, এর আগে স্রষ্টার শক্তিমত্তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কেন স্রষ্টাকে শক্তিমান হতে হবে? এবং কেন এই শক্তিমান সত্তাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে?

সর্বশক্তিমান শব্দটি স্রষ্টার ঐশ্বরিক শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশকে নির্দেশ করে। স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান বলার অর্থ হলো–এটি স্বীকার করা যে তার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই এবং কোনো কিছু বা কেউই তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং এর সর্বময় অধিকারী। তার ইচ্ছায় এই বিশাল জগৎ গঠিত হয়েছে, এবং তিনিই এর সমস্ত শক্তির উৎস ও ধারক। সুতরাং, স্রষ্টার সর্বশক্তিমানত্ব শুধু তার সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং তা তার স্বাতন্ত্র্য, স্বমহিমা এবং অখণ্ড ঐশ্বরিক সত্তার গভীর প্রকাশ।

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে '*Understanding omnipotence*' শিরোনামে প্রকাশিত একটি পেপারে সর্বশক্তিমান সত্তার সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, একটি সর্বশক্তিমান সত্তা হবে এমন একটি সত্তা যার ক্ষমতা হলো সীমাহীন। মানুষের ক্ষমতা দুটি স্বতন্ত্র উপায়ে সীমাবদ্ধ; আমরা আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, এবং আমরা যা ইচ্ছা করেছি তা কার্যকর করার

ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধতার এই দুটি স্বতন্ত্র উত্স সর্বশক্তিমানের একটি সহজ সংজ্ঞা প্রস্তাব করে: একজন সর্বশক্তিমান সত্তা হল এমন একজন যার ইচ্ছার নিখুঁত স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার নিখুঁত কার্যকারিতা উভয়ই রয়েছে।[৯২]

এই সৃষ্টিজগতে যখন আমরা কোনো সৃষ্ট বস্তু দেখি, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয়-কোনো শক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান সত্তা সেটিকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, শক্তি ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, রূপান্তর করা বা আকার দেওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন। প্রথমত, স্রষ্টার ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টির ধারণা জন্মায়, আর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং, যেহেতু স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এটি স্পষ্ট যে তিনি শক্তিমান। কিন্তু স্রষ্টার শক্তি কোনো সীমাবদ্ধ শক্তি নয়; তিনি সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ, তাঁর শক্তি এমন উচ্চতায় অবস্থান করে যার চেয়ে শক্তিমান কিছু কল্পনাও করা অসম্ভব।

স্রষ্টা যদি সর্বশক্তিমান না হন, তাহলে তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। এমন সীমাবদ্ধ সত্তা আরো শক্তি অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে এবং সেই সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা তাঁর চেয়ে শক্তিমান কোনো সত্তার কল্পনা করতে পারি। কিন্তু যেখানে সীমাবদ্ধতা থাকে, সেখানেই সেই সত্তা পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। আর যে সত্তা পরনির্ভরশীল, তার অস্তিত্বের জন্য আরও একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।ই এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে-পরনির্ভরশীল সত্তা যদি থাকে, তবে সে কীসের ওপর নির্ভরশীল? যার ওপর সে নির্ভর করে, তিনিও কি পরনির্ভরশীল? যদি তিনিও পরনির্ভরশীল হন, তবে তাঁর অস্তিত্বেরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এভাবে একের পর এক ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমরা একটি ইনফিনিটি রিগ্রেস-এ পৌঁছে যাব, যা যুক্তির বিচারে অগ্রহণযোগ্য। তাই সৃষ্টির সূচনায় এমন এক অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক, যিনি সর্বশক্তিমান, যার শক্তি সর্বোচ্চ এবং যার ওপর আর কেউ নির্ভরশীল নয়। এই অনিবার্য সত্তার শক্তি এমন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ যে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো সত্তার কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং, সত্যিকার অর্থেই অনিবার্য সত্তা সর্বশক্তিমান হতেই হবে।

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সর্বশক্তিমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যার হাতে, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।[৯৩]

"নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান"।[৯৪]

"আর তারা কি যমিনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিমাণ। অথচ তারা তো শক্তিতে ছিল এদের চেয়েও প্রবল। আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান"।[৯৫]

স্রষ্টা প্রজ্ঞাবান

স্রষ্টার প্রজ্ঞাকে তাঁর জ্ঞানের সেই দিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা এমন

---

[৯২] Kenneth L. Pearce and Alexander R. Pruss; Understanding omnipotence; Page. 403

[৯৩] সূরা আল-মুলক; ৬৭:১

[৯৪] সূরা বাকারা; ২: ২০

[৯৫] সূরা ফাতির; ৩৫: ৪৪

কিছুর প্রণয়ন করতে চায় যা স্রষ্টার করতে চাওয়া কাজের মধ্যে যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য রয়েছে তা বাস্তবায়ন করেন। ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে "ঈশ্বরের জ্ঞান যুক্তিযুক্ত এবং স্বজ্ঞাতভাবে (Intuitively) অনুমান করা যেতে পারে।"[৯৬]

ইংরেজ দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক উইলিয়াম প্যালি এর মতে, "ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা তার সৃষ্টিতে আমরা যে জটিল নকশা লক্ষ্য করি তার মাধ্যমে অনুমানযোগ্য।"[৯৭]

এই বিশাল সৃষ্টিজগতের অপরিসীম জটিলতা আমাদেরকে এক অনস্বীকার্য সত্যের মুখোমুখি করে। এত সুনিপুণ এবং সূক্ষ্মভাবে এই মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে বলে এর পেছনে অবশ্যই একজন জ্ঞানী, শক্তিমান এবং নিখুঁত সত্তার উপস্থিতি রয়েছে। যখন আমরা সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তু দেখি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয় যে এটি কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সত্তার সৃষ্টি। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি এটাই বলে যে সৃষ্টিজগতের এই অনুপম শৈলী এবং সূক্ষ্ম বিন্যাস কোনো দৈবক্রমে নয়, বরং এর পেছনে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে। যেমন, আপনি একটি চেয়ার তৈরি করলে, প্রথমে আপনার চেয়ারের নকশা এবং কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তাই চেয়ারের ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবে। এটি কখনোই সম্ভব নয় যে একটি জড় পদার্থ নিজে নিজেই একটি চেয়ার তৈরি করে ফেলবে। ঠিক তেমনই, এই বিশাল মহাবিশ্ব এবং এর প্রতিটি সূক্ষ্ম বিন্যাসও প্রজ্ঞা ও শক্তিহীন কোনো কিছুর দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং, যে সত্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তার জ্ঞান এবং শক্তির পরিধি অসীম এবং অতুলনীয়।

স্রষ্টার প্রতিটি কর্মে গভীর অর্থ এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিহিত রয়েছে। বিশেষত, এমন মহাজাগতিক কাজ, যেমন–মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা, তা কখনো উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। স্রষ্টা কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাই নয়; তিনি এটি এমনভাবে গঠন করেছেন, যেন তা একটি সুপরিকল্পিত লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি একটি খেলনা গাড়ি তৈরি করেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে–কেন আপনি এটি তৈরি করলেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য বা কারণ রয়েছে। আপনি খেলনার গাড়ির পরিবর্তে একটি খেলার বলও তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু আপনি কেন খেলার বল না বানিয়ে খেলনা গাড়ি তৈরি করলেন? এর পেছনে অবশ্যই একটি চিন্তাশীল কারণ কাজ করেছে। ঠিক একইভাবে, একজন সর্বজ্ঞ স্রষ্টার কোনো কাজ কখনো উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। তিনি এই মহাবিশ্বকে নিছক সৃষ্টির খেয়ালে সৃষ্টি করেননি। তার প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা এবং সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এ থেকেই বোঝা যায়, মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে যেমন অর্থ রয়েছে, তেমনি আমাদের অস্তিত্বের মধ্যেও নিহিত রয়েছে এক অনন্য তাৎপর্য।

স্রষ্টার প্রজ্ঞা সর্বোচ্চ পর্যায়ের হতে বাধ্য। কোনো জড় পদার্থ বা সীমাবদ্ধ সত্তা কখনোই নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধন করতে পারে না। আর যদি স্রষ্টার জ্ঞানে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকত, তাহলে তিনি আর সর্বজ্ঞ থাকতেন না। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সত্তা চাইলে আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারে, কিন্তু এমন সত্তা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

[৯৬] Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11
[৯৭] Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11

তবে স্রষ্টার সংজ্ঞা অনুসারে, তিনি স্বনির্ভর এবং অপরিহার্য। তার জ্ঞান এমন পরিপূর্ণ এবং বিস্তৃত যে, তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কোনো সত্তা কল্পনাও করা যায় না। তাই, স্রষ্টা সর্বজ্ঞ এবং সর্বপ্রজ্ঞাময়। তার জ্ঞান সীমাহীন, তার প্রজ্ঞা চিরন্তন।

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ভালোভাবে অবগত"।[৯৮] "সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। যমীনের গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই"।[৯৯]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[১০০]

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে অবশ্যই অবগত রয়েছেন, এ ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির দলিল হলো, বিনা ইলমে বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি স্বীয় ইচ্ছার মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার ইচ্ছা করার জন্য উদ্দিষ্ট বস্তুর আকৃতি সম্পর্কে কল্পনা করা আবশ্যক। উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে এ কল্পনার নাম ইলম। সুতরাং, সৃষ্টি করার জন্য ইচ্ছা করা জরুরি। আর ইচ্ছার জন্য ইলম আবশ্যক। একই সাথে সৃষ্টি করার জন্য ইলম থাকা জরুরি।[১০১]

ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ, ইবনে তাইমিয়া যুক্তি দেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূক্ষ্মতা এবং নিপুণতা কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের উদাহরণ দেয় না, বরং তার প্রতিটি সৃজনশীল কাজের অন্তর্নিহিত একটি উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।[১০২]

ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ, ইবনে তাইমিয়া যুক্তি দেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূক্ষ্মতা এবং নিপুণতা কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের উদাহরণ দেয় না বরং তার প্রতিটি সৃজনশীল কাজের অন্তর্নিহিত একটি উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।[১০৩]

স্রষ্টা চিরন্তন

চিরন্তন সত্তা বলতে সেই সত্তাকে বোঝানো হয়, যিনি শাশ্বতভাবে বিরাজমান এবং যার অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। কোনো সত্তার চিরন্তন না হওয়ার অর্থ হলো, তার অস্তিত্বের সূচনা আছে, এবং যেহেতু তার অস্তিত্বের শুরু আছে, সেহেতু তার অস্তিত্বের জন্য কোনো কারণ রয়েছে। অর্থাৎ, সে সত্তাটি পরনির্ভরশীল–তার অস্তিত্ব কেবলমাত্র অন্য কোনো সত্তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ ধরনের নির্ভরশীল সত্তা কখনোই স্রষ্টা হতে পারে না। নির্ভরশীল সত্তাগুলো তাদের অস্তিত্বের জন্য কোনো বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরতার একটি সীমা রয়েছে। কারণ, নির্ভরতার শৃঙ্খল বা কার্যকারণ সম্পর্ক অসীম হতে পারে না। এটি ইতোমধ্যেই 'কার্যকরণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে' শীর্ষক আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের মহাবিশ্ব পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ এর অস্তিত্বের জন্য কোনো কারণ বা

---

[৯৮] সূরাঃ মুলক; ৬৭; ১৪
[৯৯] সূরা আল-আন আম; ৬:৫৯
[১০০] সূরা আল-বাকারা; ২:২৪৪
[১০১] শারহুল আকীদাহ আত-তহাবীয়া; খন্ড নং: ১; পৃষ্ঠা ১৬৮-১৮৭
[১০২] Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11
[১০৩] Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11

ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা অসীম সংখ্যক হতে পারে না। অতএব, যুক্তি ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সবকিছুর মূল একটি কারণ বা ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক, যা নিজেই কারণহীন–স্বাধীন, স্বনির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল।

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি চিরন্তন বা শাশ্বত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলা বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান"।[১০৪] আয়াতে উল্লিখিত حَيّ শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব।[১০৫] حَيّ শব্দটি আল্লাহর অবিনশ্বরতা-চিরন্তনতার প্রমাণ বহন করে। এটি আল্লাহ তা'আলার সর্বদা বিদ্যমান থাকা এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা প্রমাণ করে। একই সাথে এই শব্দটি এই অর্থ বহন করে যে, আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলা অনিবার্য অস্তিত্ব।

স্রষ্টা কেন এক?

একটি দৃশ্যপট কল্পনা করুন। ধরা যাক, দুজন অনিবার্য সত্তা অস্তিত্বশীল, এবং উভয়েরই রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। সেক্ষেত্রে, তারা ভিন্ন ইচ্ছা প্রকাশ করল। প্রথম অনিবার্য সত্তা চাইল পুরো মহাবিশ্ব কালো হবে, আর দ্বিতীয় অনিবার্য সত্তা চাইল পুরো মহাবিশ্ব থাকবে সাদা। এখন প্রশ্ন হলো, এই দুই বিপরীত ইচ্ছা কি একসঙ্গে প্রতিফলিত হতে পারে? নিঃসন্দেহে নয়! কারণ, এটি যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতির পরিপন্থি। একইসঙ্গে কালো এবং সাদা হওয়া, অর্থাৎ একে অপরকে পরিপন্থি দুই অবস্থা সহাবস্থান করতে পারে না।

এবার একই পরিস্থিতি উলটো দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবুন। ধরে নিন, এই দুই সত্তার মধ্যে একজনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যজনেরটি হয়নি। এমনটা ঘটলে যার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি, তিনি আর অনিবার্য সত্তা হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। কেননা, তিনি তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের শক্তি রাখেন না। অথচ, অনিবার্য সত্তা তো সর্বশক্তিমান। তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়াই যুক্তিসংগত, কারণ সর্বশক্তিমান কোনো সত্তার ইচ্ছা প্রতিফলিত না হওয়া তার শক্তির সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। অতএব, যদি প্রথম সত্তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় এবং দ্বিতীয় সত্তার না হয়, তাহলে প্রথম সত্তাই প্রকৃত অনিবার্য সত্তা হিসেবে গণ্য হবেন। কারণ, তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন তার সর্বশক্তিমানের পরিচায়ক। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সত্তা তার ইচ্ছা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তিনি নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই, একইসঙ্গে দুই অনিবার্য সত্তার সহাবস্থান তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব।

আরেকটি দৃশ্যপট বিবেচনা করুন। ধরা যাক, দুজন অনিবার্য সত্তা অস্তিত্বশীল, কিন্তু তাদের কারও ইচ্ছাই প্রতিফলিত হলো না। প্রথম অনিবার্য সত্তা চাইল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে, আর দ্বিতীয় অনিবার্য সত্তা চাইল মহাবিশ্ব সৃষ্টি না হোক। এবার প্রশ্ন ওঠে, মহাবিশ্ব আদৌ সৃষ্টি হতো কি? যদি তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে কোন ইচ্ছাটি বাস্তবে রূপ নিত? দুজনের ইচ্ছা একসঙ্গে প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব, কারণ তা যুক্তির মৌলিক নিয়মের বিরোধী। তাহলে, যদি একজনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, তবে যার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে তিনিই হবেন

---

[১০৪] সূরা আলে-ইমরান; ৩:২

[১০৫] https://www.almaany.com/quran/3/2/6/

প্রকৃত স্রষ্টা। অন্যজন, যিনি তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেননি, তিনি নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আর যদি কারও ইচ্ছাই প্রতিফলিত না হয়, তাহলে অনিবার্য সত্তার ধারণাই নস্যাৎ হয়ে যায়। সুতরাং, যুক্তির নিরিখে এটি স্পষ্ট যে অনিবার্য সত্তা হতে পারে একক এবং তিনি অবশ্যই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সর্বজনীন স্রষ্টা এবং প্রকৃত চিরন্তন সত্তা।

এই যুক্তির মধ্যে পবিত্র কুরআনের সত্যতা ফুটে উঠেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি"।[১০৬]

"আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু"।[১০৭]

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনও সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক।[১০৮]

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান"।[১০৯]

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই"।[১১০]

স্রষ্টাই অনিবার্য অস্তিত্ব

অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায় কারণহীন কারণ, স্বাধীন, চিরন্তন, স্ব-নির্ভর অস্তিত্ব। মোডাল লজিক অনুসারে যে-সকল জিনিস বা অস্তিত্ব সকল সম্ভাব্য জগতে বাধ্যতামূলক বা অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল, বা সত্য তাকে অনিবার্য অস্তিত্ব বলে।

দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, "আমরা বলি যে প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) হলো অকারণ (অসৃষ্ট), যেখানে একটি 'সামগ্রিক অস্তিত্ব'(নির্ভরশীল অস্তিত্ব) সৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় অস্তিত্বটি (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) সমস্ত সম্ভাব্য উপায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় (নেসেসারি)।[১১১]

স্রষ্টার প্রকৃতি নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। স্রষ্টা এমন এক সত্তা যিনি স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, যিনি চিরন্তন সত্তা, তার অস্তিত্ব না থাকা সম্ভব নয়, যিনি হবে একক সত্তা। অনিবার্য অস্তিত্বও এমন সত্তা যিনি স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি চিরন্তন, তার অনস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি চিরন্তন, তার অনস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়, যিনি হবে একক সত্তা, এই বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র স্রষ্টার প্রকৃতির সাথেই খাপ খায়। সুতরাং, অনিবার্য অস্তিত্বই মূলত স্রষ্টা।

---

[১০৬] সূরা আল- ইখলাস; ১১২: ১-৪
[১০৭] সূরা আল-বাকারা; ২: ১৬৩
[১০৮] সূরা আল-বাকারা; ২: ২৫৫
[১০৯] সূরা আলে-ইমরান; ৩: ২
[১১০] সূরা আলে-ইমরান; ৩: ১৮
[১১১] Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কিছু বিভ্রান্তির নিরসন

এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব এবং তার সৃষ্টির জন্য যে এক অনিবার্য সত্তা বা স্রষ্টার প্রয়োজন, এটি প্রমাণিত হওয়ার পর নাস্তিকরা নানা প্রশ্নের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই বিতর্কের মূল প্রশ্নগুলো হলো, যদি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ হন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কেন আল্লাহকে বুদ্ধিমান সত্তা হতে হবে? আল্লাহ কি এমন একটি পাথর তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নয়? বা, আল্লাহ কি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন? এসব প্রশ্নের মাধ্যমে তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকে।

তবে, এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যে গভীর অন্তর্নিহিত বিভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তা হলো স্রষ্টার প্রকৃতিকে ভুলভাবে উপলব্ধি করা। যেমন, 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' –এই প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রুটিপূর্ণ চিন্তা থেকে উদ্ভূত, যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্বের জন্য কোনো বাহ্যিক কারণ প্রয়োজন এমন একটি ধারণা রয়েছে, যা মৌলিকভাবে ভুল। স্রষ্টা এমন এক সত্তা, যার অস্তিত্ব চিরন্তন, স্বাধীন এবং স্ব-নির্ভর; তাঁর অস্তিত্বের জন্য কোনো বাহ্যিক সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

এছাড়া, 'আল্লাহ কি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন?' এমন প্রশ্নও স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতি এক ভুল ধারণা থেকেই জন্ম নেয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সত্যের প্রতীক। তাঁর পক্ষ থেকে মিথ্যা কথার প্রচলন সম্ভব নয়, কারণ মিথ্যা বলতে গিয়ে তাঁর প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি হবে। স্রষ্টার ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞা কখনোই মিথ্যা বা ভুলের দিকে পরিচালিত হতে পারে না।

এখানে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে, তা মূলত স্রষ্টার অস্তিত্ব, প্রকৃতি এবং ক্ষমতা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। তবে এসব বিভ্রান্তির সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি, যা এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পরও, এসব প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সঠিক জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে সত্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও শক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে।

সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কিত নাস্তিকদের সাধারণ যে আপত্তি শোনা যায়, তা হলো–'যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা থাকে, তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?' তবে, এই প্রশ্নটি অত্যন্ত অবান্তর এবং শিশুসুলভ। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য যে সর্বশক্তিমান, চিরন্তন সত্তার প্রমাণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে, এমন প্রশ্ন একটি অদ্ভুত অর্থহীনতা। আসুন, এই বিষয়টি একটু গভীরভাবে ব্যাখ্যা করি।

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তবে, তিনি সৃষ্ট নয়; বরং তিনি স্রষ্টা। স্রষ্টা এই জগতের নিয়মকানুনের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। আমাদের পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের কানো-না-কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল। যেমন আপনি যে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করছেন, তার অস্তিত্ব একাধিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আর সেই উপাদানগুলোও অন্য কিছুতে নির্ভরশীল। এমন নির্ভরশীলতা আমরা প্রতিটি বস্তুতেই দেখতে পাই, তবে সৃষ্টিকর্তা কি মহাবিশ্বের অংশ? তাকে কি মহাবিশ্বে খুঁজে পাবো? আপনি কি কখনো ফোনের মধ্যে ফোন নির্মাতাকে খুঁজে পাবেন? বা, কাঠ মিস্ত্রিকে তার বানানো চেয়ারটির মধ্যে খুঁজে পাবেন?

সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি এই মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের মহাবিশ্বের সব কিছুই কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল; কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এমন কিছু যা কোনো বাহ্যিক কিছুতে নির্ভরশীল নয়। কারণ তিনি অনিবার্য সত্তা, চিরন্তন সত্তা, তার অস্তিত্ব থাকা বাধ্যতামূলক। যেহেতু সৃষ্টির সব কিছু নির্ভরশীল, তাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বেও যদি এমন নির্ভরশীলতার প্রয়োগ করা হয়, তবে তা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়বে। আমরা আমাদের অস্তিত্বের কারণ খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার ধারণা পেয়ে থাকি। সৃষ্টিকর্তা এমন কিছু নয় যাকে আমরা স্বচক্ষে (Empirically) দেখতে পাবো। সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল সব কিছুর অস্তিত্বের জন্য যদি কোনো-না-কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল। একারণে যদি চিরন্তন সত্তাও তার অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে চিরন্তন সত্তা ও সসীম সত্তার মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায় ?

স্রষ্টা এবং সৃষ্টি দুটোই আলাদা ক্যাটাগরি। একটা ক্যাটাগরির কোন নিয়ম অন্য ক্যাটাগরিতেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে এমন অনুমান করে নেওয়া এক ধরনের ভ্রান্তি যা ক্যাটাগরি মিস্টেক ফ্যালাসি নামে পরিচিত। 'সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?' এই প্রশ্নটি কেবল একটি ফ্যালাসি। সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে তফাত বুঝতে পারলে এই ধরনের প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। বিবাহিত এবং কুমার যেমন একই ক্যাটাগরিতে পরেনা, তেমনি পার্টিকুলার এবং অসীমও একই ক্যাটাগরিতে পরে না।

এছাড়া, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মৌলিক পার্থক্য বুঝতে পারলে এ ধরনের অবান্তর প্রশ্নে মাথা ঘুরপাক খাওয়ার অবকাশ নেই। সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি, এমন কিছু যা কোনো এক সময় অস্তিত্বে ছিল না এবং নির্দিষ্ট এক মুহূর্তে অস্তিত্বে এসেছে। কিন্তু নাস্তিকদের প্রশ্ন অনুযায়ী যদি আমরা মেনেও নেওয়া হয় যে

সৃষ্টিকর্তারও স্রষ্টা থাকা আবশ্যক, তাহলে এর মানে দাঁড়ায়, সৃষ্টিকর্তা একসময় অস্তিত্বে ছিল না, এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে তার অস্তিত্ব শুরু হয়েছে। এখন, যেসব নাস্তিকরা এমন চমকপ্রদ প্রশ্ন দিয়ে মানুষের চিন্তায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আমার একটিই প্রশ্ন–যদি সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, তবে তিনি কি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে অবিরত থাকবেন, নাকি সৃষ্ট হয়ে যাবেন?

নাস্তিকদের এই প্রশ্নটি আসলে একটি মৌলিক যুক্তির বিশাল দুর্বলতা প্রকাশ করে, যা স্রষ্টার প্রকৃতিকে একেবারেই অস্বীকার করে। যদি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে আর স্রষ্টা থাকতে পারে না, বরং সে নিজেই সৃষ্ট হয়ে যাবে, এবং সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্রতা ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে করুন, X হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা। যদি X, X1 থেকে সৃষ্টি লাভ করে, তাহলে X কি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরিচিত থাকবে, নাকি সৃষ্ট হয়ে যাবে? স্পষ্টভাবেই, X সৃষ্ট হবে, সৃষ্টিকর্তা থাকবে না। এই যুক্তি অনুসারে, সৃষ্টিকর্তাকেই যদি সৃষ্ট হতে হয়, তবে তা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতির মৌলিক বিপরীত অবস্থান তৈরি করে, এটি তার চিরন্তন ও অসীম সত্তার সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার কোনো বাহ্যিক উপাদান বা কারণ থাকা অসম্ভব, কারণ তিনি নিজেই চিরন্তন ও অসীম সত্তা, যার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র এবং কোনো শর্তাধীন নয়। সুতরাং, এই প্রশ্নটি যুক্তিবিদ্যার মূলনীতির সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে।

এছাড়া, 'সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?' এই প্রশ্নটি একটি লোডেড কোশ্চেন ফ্যালাসি, বা কমপ্লেক্স কোশ্চেন ফ্যালাসি। এখানে controversial বা unjustified assumption করা হয়। কারণ, এতে প্রশ্নকারীর মধ্যে এক ধরনের পূর্বধারণা থাকে, সে আগেই ধারণা করে নিয়েছে যে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি হতে হবে। কিন্তু, আসলে এটি শুধু একটি অনুমান, যা কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। এই ধরনের প্রশ্ন অনেকটা এমন, যেমন কেউ আপনাকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করবে, "আপনি কি এখনো বউ পেটান?" এই প্রশ্নকারী, আসলে, আগে থেকেই ধরে নিয়েছে যে আপনার বউ আছে এবং আপনি তাকে নির্যাতন করেন। সৃষ্টিকর্তা, যিনি অসীম সত্তা, তার কোনো শুরুও নেই, তিনি অসৃষ্ট। অর্থাৎ, তার অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই, এবং তিনি কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে সৃষ্টি হয়নি। তাই, তার অস্তিত্বকে সৃষ্টির সাথে যুক্ত করা বা তাকে সৃষ্টি করার ধারণা একেবারেই অসম্ভব।

সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী, তিনি এক অসৃষ্ট স্রষ্টা, যার অস্তিত্ব কোনো অনস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত হয়নি। তার অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই, কারণ তিনি অসীম সত্তা। অসীম সত্তার জন্য কোনো বাহ্যিক সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। ধরুন, X হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অসীম সত্তা যার কোনো শুরু নেই। এখন যদি আমরা ধরে নিই, X, X1 থেকে সৃষ্টি লাভ করেছে, তখন একটি প্রশ্ন উঠবে–তাহলে X1 কে সৃষ্টি করেছে? যদি বলা হয়, X1, X2 থেকে সৃষ্টি লাভ করেছে, তবে প্রশ্ন হবে X2 কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে, যদি প্রশ্নের ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে আপনি অসীম সংখ্যকবার প্রশ্ন করতে পারবেন। এইভাবে চলতে থাকলে, প্রশ্নের উত্তর কখনোই শেষ হবে না। কারণ, X অস্তিত্বের জন্য X1 এর

উপর নির্ভরশীল, X1 অস্তিত্বের জন্য X2 এর উপর নির্ভরশীল, X2 অস্তিত্বের জন্য X3 এর উপর নির্ভরশীল, এই ধারা অব্যাহত। এভাবে নির্ভরশীলতার অবিরত ক্রমের মধ্যে আমাদের কখনোই বর্তমান সময়ে পৌঁছানোর সুযোগ ছিল না। এমন একটি অনাদিকাল বা অসীম কালব্যাপী চলতে থাকা সৃষ্টির নির্ভরশীলতার পরিণতি হবে 'অসীম প্রত্যাবর্তন' (Infinite Regress), যা কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেবে না। আর, এমন চলমান নির্ভরশীলতার এক অনন্ত চক্রে বর্তমান অস্তিত্ব কখনোই নিশ্চিত হতে পারত না। সুতরাং, সৃষ্টির জন্য একমাত্র একটি স্রষ্টা থাকা একান্ত অনিবার্য, যিনি চিরন্তন, এবং যার কোনো স্রষ্টা নেই–এটি একমাত্র সমাধান হতে পারে।

এছাড়াও, Law of parsimony (মিতব্যয়িতা নিয়ম) অনুসারে, একই জিনিসের একটি মাত্র কারণ থাকা সম্ভব। তাহলে এই ইউনিভার্সের একটি মাত্র কারণ থাকা সম্ভব। এবং সেই কারণই হলো সৃষ্টিকর্তা।

কুরআনের মত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলা বলেন, "বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি"।[১১২]

দার্শনিকদের মতামত

অধ্যাপক এন্থনি ফ্লিউয়ের 'দেয়ার ইজ গড' বইয়ের পরিশিষ্টে অধ্যাপক আব্রাহাম ভার্গসে জোরালোভাবে বলেছে, "আস্তিক নাস্তিক একটি বিষয়ে একমত হতে পারে, যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তা হলে এর আগে অবশ্যই এমন কিছু থাকতে হবে যা সব সময় অস্তিত্বশীল। চিরকালীন অস্তিত্ববান এই সত্তা কীভাবে এসেছে? এর উত্তর হলো, এটা কোনোভাবেই আসেনি। এটা সব সময় অস্তিত্ববান"।[১১৩]

[১১২] সূরা আল-ইখলাস; ১০২: ১-৪

[১১৩] দেয়ার ইজ এ গড: হাউ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট নতরিয়াস এথিস্ট চেইনজড হিজ মাইন্ড। পৃষ্ঠা নং: ১৫৬

স্রষ্টা কী এমন একটি পাথর তৈরি করতে পারবেন যেটা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারেন না?

স্রষ্টার গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো সর্বশক্তিমানতা, যা নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। নাস্তিকরা 'omnipotence paradox' দিয়ে প্রমাণ করতে চাই যে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়। 'omnipotence paradox' হলো; 'স্রষ্টা কি এমন পাথর তৈরি করতে পারবে যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন?' যদি তিনি পারেন তাহলে তিনি আর সর্বশক্তিমান থাকেনা। কারণ এমন একটি জিনিস থাকে যা তিনি তুলতে সক্ষম নয়। আবার যদি তিনি না পারেন তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান নয়। কারণ এমন একটি জিনিস থাকে যা তিনি করতে পারে না। 'omnipotence paradox' এ উল্লিখিত এই ঘটনাটি স্রষ্টার সর্বশক্তিমানের সংজ্ঞার সাথে বৈপরীত্য তৈরি করে। এমন আরো অনেকগুলো প্যারাডক্স রয়েছে। যেমন, স্রষ্টা যেহেতু সব কিছু করতে পারে সেহেতু তিনি কি 'মিথ্যা' বলতে পারবে কিনা? 'তিনি কি তার অনুরূপ আরেকটি স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে পারবেন?'

প্রকৃতির অগণিত রহস্যের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব একটি অমিত শক্তির পরিচায়ক। আসলে, স্রষ্টা হলো সর্বশক্তিমান; অর্থাৎ, তাঁর চাইতে অধিক শক্তিধর এমন কিছু সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাঁর অনুপম শক্তির স্নিগ্ধতায়, আমরা কোনোভাবেই তাঁকে অতিক্রম করার মতো শক্তিমান কিছু কল্পনা করতে পারি না। নাস্তিকরা যখন এই জটিল প্যারাডক্স নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে, তখন তারা স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান হিসেবেই মেনে নেয়। তবে, যেহেতু স্রষ্টার পরাক্রমের সীমা নেই, তাই তাঁর চাইতে শক্তিশালী অন্য কিছু সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব। এই সত্যকে উপলব্ধি করে, আমরা বুঝতে পারি যে, নানা প্যারাডক্স, যেমন, 'স্রষ্টা কি এমন পাথর তৈরি করতে পারবে যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন?' কিংবা 'তিনি কি মিথ্যা বলতে সক্ষম?' 'তিনি কি তার অনুরূপ আরেকটি স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে পারবেন?' এই প্রশ্নগুলো তাঁর অসীম শক্তির সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

তাই আধিভৌতিকভাবে (metaphysically) বিচার করলে, এটি অসম্ভব যে স্রষ্টা তাঁর থেকে শক্তিশালী কোনো পাথর নির্মাণ করবেন, মিথ্যা বাক্য উচ্চারণে সক্ষম হবেন, অথবা তাঁর স্বরূপের অনুরূপ আরেকটি স্রষ্টাকে সৃষ্টি করবেন। কারণ, মৌলিকভাবেই স্রষ্টা হলো অসৃষ্ট; অর্থাৎ, যিনি চিরন্তন ও অবিনাশী। যদি তিনি কিছু সৃষ্টি করেন, তাহলে সেটি স্রষ্টা নয়, বরং একটি সৃষ্টি। সুতরাং, স্রষ্টার স্বরূপের অনুরূপ কিছু তৈরি করার প্রশ্নটিই সঠিকভাবে ভুল। এই প্রশ্নে প্রশ্নকারী পূর্বেই কোনো যুক্তি ছাড়াই ধারণা করে নেয় যে, কোনো সৃষ্টির পরেও সেটি অসৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে– যা যুক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যদি স্রষ্টা তার অনুরূপ আরেকটি স্রষ্টা সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টি হওয়া সেই সত্তা তো সৃষ্টিই হবেন! স্রষ্টা হবেন না।

এমন পূর্বকালীন অনুমান একটি গুরুতর বিভ্রান্তি। যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায়, একে বলা হয় লোডেড কোশ্চেন ফ্যালাসি; যা আমাদের যুক্তি ও বোধের মধ্যে অসংগতি সৃষ্টি করে। একইভাবে, নাস্তিকরা পূর্ব থেকে অনুমান করে নেয় যে, সর্বশক্তিমানের চাইতে অধিক শক্তিশালী কিছু অস্থিতিশীল হতে পারে, যদিও এটি

যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। তাই 'স্রষ্টা কি এমন পাথর তৈরি করতে পারবে যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন?' এই প্রশ্নটিও একটি ভ্রান্তি।

কোন মানুষ কি একইসাথে বিবাহিত আবার অবিবাহিত হতে পারে? অবশ্যই পারে না। আবার আমরা কি চাইলে এমন কোন বৃত্ত তৈরি করতে পারবো যার কোণ হবে চারটি? এটাও পারবো না। কারণ, এগুলো যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক। 'যুক্তিবিদ্যা' অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আমরা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম (Laws of logic) নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখিয়েছি যে যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, কোন মানুষ কি বিবাহিত হয় আবার অবিবাহিত হতে পারবে? বা কেউ কি এমন কোন বৃত্ত বানাতে পারবে যার চারটি কোণ থাকবে? এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে প্রশ্ন নয়। বাক্যের শেষে কেবল প্রশ্নবোধক চিহ্ন জুড়ে দিলেই প্রশ্ন করা হয়ে যায় না। একইভাবে 'স্রষ্টা কি এমন পাথর তৈরি করতে পারবে যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন?' এই প্রশ্নটিও আসলে প্রশ্ন নয়। যেহেতু, স্রষ্টার চাইতে শক্তিমান আর কোন-কিছু থাকা সম্ভব না সেহেতু এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। যার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় তা 'বাস্তব' নয়। তাই যেটা 'বাস্তব' না তা স্রষ্টার উপর আরোপ করা যাবে না।

শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন; আহলে সুন্নাহর দৃষ্টিতে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং যা কিছু সম্ভব তার অন্তর্ভুক্ত। যেটি সহজাতভাবে অসম্ভব, যেমন একটি জিনিস বিদ্যমান এবং অস্তিত্বহীন, এর মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই এবং এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তাই জ্ঞানীদের ঐকমত্য অনুসারে এটিকে 'বস্তু' বলা যায় না। এর মধ্যে নিজের মতো অন্যকে তৈরি করার ধারণা এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১১৪]

স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন এর মানে যা কিছু ঘটা সম্ভব, যা কিছু যৌক্তিকভাবে সম্ভব, যা কিছু বাস্তব তার সব কিছু তিনি করতে পারেন। কিন্তু কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে, তাহলে কি স্রষ্টা কোন যৌক্তিক নিয়মে আবদ্ধ? আসলে, স্রষ্টা কোনো যৌক্তিক নিয়মের পরিসরে সীমাবদ্ধ নন। যুক্তি স্রষ্টার উর্ধ্বে কিছু নয়। বরং, স্রষ্টা হলেন সর্বোচ্চ যৌক্তিক সত্তা এবং যুক্তি হচ্ছে তার প্রতিফলনের মতো। তাই স্রষ্টা যৌক্তিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি সমস্ত যুক্তির ভিত্তি। যুক্তি তার থেকেই আসে, তিনি যুক্তির নিয়মে আবদ্ধ নয়।

---

[১১৪] An atheist saying 'Can Allaah create a god like Himself?' - Islam Question & Answer (islamqa.info)

শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, তাই মহাবিশ্বের আদি কারণ শক্তি?

মুক্তমনা নাস্তিকদের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনায় ইদানীং একটি ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা প্রায়ই বলেন, ''শক্তির কোনো শুরু বা শেষ নেই, শক্তির ধ্বংস নেই।" তাদের মতে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি কেবল শক্তি থেকেই ঘটেছে, এবং এর পেছনে কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। আসলেই কি আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুধুমাত্র শক্তির মাধ্যমে ঘটেছে? বিজ্ঞান কী আমাদের সত্যিই এই দিকটি বুঝিয়েছে, বা এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সত্তার যোগসূত্র নেই?

নাস্তিকদের এই দাবিটির উৎস হলো শক্তির সংরক্ষণর আইন, যা তাপগতিবিদ্যার প্রথম আইন হিসাবেও পরিচিত (The law of conservation of energy, also known as the first law of thermodznamics). এই আইন অনুযায়ী, একটি বদ্ধ সিস্টেমের (Closed System) শক্তি অবশ্যই স্থির থাকতে হবে এটি বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া বাড়তে বা হ্রাস করতে পারে না। মহাবিশ্ব নিজেই একটি বদ্ধ ব্যবস্থা, তাই অস্তিত্বের মোট শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই ছিল। শক্তি যে ফর্মগুলি গ্রহণ করে, তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না; বরং, এটি শুধু মাত্র একটি ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত হতে পারে।[১১৫]

নাস্তিকদের দাবি হলো, 'শক্তির সংরক্ষণ আইন' অনুসারে, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, অর্থাৎ শক্তি শাশ্বত (Eternal)। তাদের মতে, তাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা স্রষ্টার প্রয়োজন নেই; শক্তিই একমাত্র আদি কারণ। তবে, এই ধারণাটি প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে নাস্তিকরা যে একপেশে মনোভাব অবলম্বন করে, সেটি ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তারা প্রায়ই কোনো বক্তৃতার এমন অংশ তুলে ধরে, যা তাদের নিজেদের পক্ষে কাজ করে, আর বাকী অংশটি সযত্নে উপেক্ষা করে। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই তাদের এই হটকারী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। শক্তির সংরক্ষণের আইন এর ক্ষেত্রেও একই কাজ তারা করেছে।

এটা সত্য যে, শক্তির সংরক্ষণের আইন অনুযায়ী, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়; বরং, শক্তি শুধু একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। তবে, এটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য; বদ্ধ সিস্টেমের (Closed System) মধ্যে। এই নিয়মটি সর্বব্যাপী নয়। শক্তি শুধুমাত্র একটি সিস্টেমের মধ্যে থাকে, এটি সিস্টেমের অভ্যন্তরে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সেই সিস্টেমের বাইরে এর ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। নাস্তিকরা বদ্ধ সিস্টেমের একটি ধারণাকে সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য বলে উপস্থাপন করে, এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নে তা নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে। তারা এভাবে এড়িয়ে চলে সেই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক, যেখানে শক্তির সংরক্ষণ আইন একটি 'বন্ধ সিস্টেমের' মধ্যে কার্যকর, কিন্তু মহাবিশ্বের সূচনা কিংবা তার আদি কারণের প্রশ্নে এ শক্তির সংরক্ষণ আইন প্রযোজ্য নয়। এক বৃহত্তর, অবারিত সিস্টেমের মাঝে শক্তি চিরকাল শাশ্বত নয়; বরং, কোনো আদি স্রষ্টার

---

[১১৫] https://www.scientificamerican.com/article/energy-can-neither-be-created-nor-destroyed/

উপস্থিতি ছাড়া এই অসীম বিশালতাকে বুঝে ওঠা ও তার নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য মডেল হলো বিগব্যাং তত্ত্ব। এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই 'মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা চাইলেও Grand Unification Epoch, বা $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড এর আগের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী সিংগুলারিটি থেকেই সব কিছুর শুরু হয়েছে। আর এই সিংগুলারিটি কেবল হাইপোথেটিক্যাল, এর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমাদের এই পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কোনো আইন সেখানে কাজ করে না। তাই গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর আগে শক্তির নিত্যতার নিয়মের কার্যকারিতা ছিল এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদেও নিকট নেয়।

সাধারণভাবে যে কারোই এখানে মনে হতে পারে বিগ ব্যাং তত্ত্ব ও শক্তির সংরক্ষণের আইন তাহলে একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। কিন্তু এখানে আসলে কোনো ধরনের সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ, গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর আগে আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের যে আইন রয়েছে তা কাজ করে না। তাই মহাবিশ্ব একটি বদ্ধ সিস্টেম (Closed System). আর শক্তির সংরক্ষণের আইন, বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম আইন এই বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য, সর্বাবস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়।

যেহেতু, গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর আগের অবস্থায় পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের আইনগুলো বা পদার্থের সূত্রগুলো কাজ করে না, তাই একথা বলার সুযোগ নেই যে, শক্তির সংরক্ষণ আইন ' মহাবিশ্বের সূচনা কিংবা তার আদি কারণের ক্ষেত্রেও কাজ করবে। বা, গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর আগেও কাজ করবে। বরং, এই আইনগুলো বিগ ব্যাং এর পর গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর পর থেকেই কার্যকারিতা লাভ করে। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের শুরু আগে শক্তির নিত্যতার সূত্র বা শক্তির সংরক্ষণ নীতিগুলো কার্যকর নয়।

তাই মূল কথা হলো, শক্তির নিত্যতার সূত্র বা শক্তির সংরক্ষণ নীতি গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর পর থেকে কার্যকারিতা লাভ করে একটি বদ্ধ সিস্টেম এর জন্য। কাজেই, 'শক্তি সর্বদা অস্তিত্বশীল বা শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না' একথাটি কেবলমাত্র তখনই সত্য যদি এবং কেবল বলা হয় এটি গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর পর থেকে কার্যকারিতা লাভ করে একটি বদ্ধ সিস্টেমের জন্য। গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন এপোক এর আগেও শক্তির নিত্যতার সূত্রের কার্যকারিতা ছিল এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

স্রষ্টা কী ইচ্ছা শক্তিহীন জড় পদার্থ নাকি বুদ্ধিমান সত্তা?

ইতোমধ্যেই আমরা নির্ভরশীলতার যুক্তি, কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, বা এমন এক কারণের যা অনাদিকাল ধরেই অস্তিত্বশীল। তবে, এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ হয়তো বলবে, সেই কারণ বা স্রষ্টা কি শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তিহীন, জড় পদার্থ, নাকি সে একটি বুদ্ধিমান সত্তা?

ইতোমধ্যে স্রষ্টার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে, স্রষ্টাকে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান হতে হবে। এখন, এই বিষয়টি আরও একধাপ গভীরে পৌঁছাতে, আমরা স্রষ্টার বুদ্ধিমত্তার স্বপক্ষে আরো একটি দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করতে চাই। প্রথমত, স্রষ্টা চেয়েছেন যে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসুক। তার ইচ্ছা ছাড়া এটি কোনোভাবেই বাস্তবায়িত হতে পারতো না। এই মহাবিশ্বের এমন অনেক সত্তা বিরাজমান যাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তাই এদের সৃষ্টিকর্তারও ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। কেননা, একটা বুদ্ধিহীন সত্তা কখনোই বুদ্ধিমান সত্তা তৈরি করতে পারবে না। একটি অজ্ঞ বা জড় পদার্থের পক্ষে কোনো জ্ঞানী, সুস্পষ্ট পরিকল্পনাসম্পন্ন সত্তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এছাড়া, আমরা যদি মানবসভ্যতার দিকে তাকাই, দেখি যে সৃষ্টির পেছনে যে বুদ্ধিমান পরিকল্পনা ও লক্ষ্য থাকে, তা কখনোই কোনো অজ্ঞ বা জড় সত্তার মাধ্যমে সম্ভব হয় না। স্রষ্টার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞাই মহাবিশ্বের সুন্দরতম সৃষ্টির ভিত্তি, এবং এটি স্পষ্ট যে স্রষ্টা কোনো জড় পদার্থ নয়, বরং তিনি সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান সত্তা, যিনি মহাবিশ্বের প্রতিটি নুড়ি-ধূলিকে নিজের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন।

দ্বিতীয়, স্রষ্টাকে কেন বুদ্ধিমান সত্তাই হতে হবে তা বুঝতে হলে জানতে হবে, কীভাবে একটা পার্মানেন্ট (চিরন্তন) কজ বা কারণ (গড) থেকে আমরা টেম্পোরাল ইফেক্ট (ইউনিভার্স) পেতে পারি। সাধারণত আমরা দেখতে পাই, একটি ইচ্ছাশক্তিহীন, বিবেকবুদ্ধি বিবর্জিত, পরনির্ভরশীল কার্যকারণ, কখনোই তার ইফেক্ট ছাড়া অস্তিত্বে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফাঁকা ঘরে কিছু বল রাখা আছে। সেখানে কোনো অভিকর্ষ বল বা গ্রাভিটি নেই। এই পরিস্থিতিতে বলগুলো শূন্যে ভাসতে থাকবে, কারণ অভিকর্ষ বলের কোনো প্রভাব নেই। তবে, যদি কখনো এই ঘরে অভিকর্ষ বল ফিরে আসে, তখনই বলগুলো মাটিতে পড়ে যাবে। অর্থাৎ, বলগুলোর মাটিতে পড়ার কারণ হলো অভিকর্ষ বলের উপস্থিতি। যখন অভিকর্ষ বল ঘরটিতে অস্তিত্ব লাভ করবে, তখনই তার প্রভাব কাজ করা শুরু করবে, এবং বলগুলো মাটিতে পড়তে থাকবে।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। আমরা জানি, পানি বরফে পরিণত হয় বা জমে যায় যখন তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। এর মানে হলো, ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে পানির বরফ হওয়ার জন্য। এখন, যদি কোথাও ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়, তাহলে সেখানে থাকা যেকোনো পানি তৎক্ষণাৎ জমাট হয়ে যাবে। এটি এক সেকেন্ড আগেও নয়, এক সেকেন্ড পরেও নয়। তবে, যদি কোনো স্থানে তাপমাত্রা অসীম সময় ধরে ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তাহলে সেখানে সসীম সময় আগে পানি জমাট বাঁধতে শুরু করা অসম্ভব। এটা principle of sufficient reason'কে সংক্ষেপে ভঙ্গ করে।

তাই সেখানে পানি অসীম সময় ধরেই বরফ থাকবে।

উদাহরণগুলো থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ইচ্ছাশক্তিহীন এবং বুদ্ধিহীন কোনো কার্যকারণ এবং তার প্রভাব বা ইফেক্ট একই সাথে অস্তিত্বশীল হয় এবং একটির অস্তিত্ব থাকলে অপরটির অস্তিত্বও থাকে। এর মানে হলো, কোন নির্দিষ্ট কার্যকারণ এবং তার প্রভাব একসাথে একই সাথে ঘটে, এবং যে কোনো পরিণতি বা ঘটনা কেবল তখনই ঘটবে যখন তার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট কারণ উপস্থিত থাকবে। কিন্তু যখন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন কোনো সত্তা প্রবেশ করে, তখন সেই সত্তা তার ইচ্ছা অনুযায়ী, পূর্বে কোনো কার্যকারণের প্রেক্ষিত ছাড়াই, নতুন কোনো ইফেক্ট বা ঘটনা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ধরা যাক, একজন ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ সময় ধরে বসে আছেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী, তিনি এক সসীম সময় আগে উঠে দাঁড়াতে পারেন। তার উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যমে একটি টেম্পোরাল (কালগত) পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ সময়ের মধ্যে একটি নতুন ঘটনা সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে, ইচ্ছাশক্তির উপস্থিতি এবং তার দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তনকে ফিলসফির ভাষায় 'এজেন্ট কজেশন' বলা হয়। অর্থাৎ, একটি বুদ্ধিমান সত্তার ইচ্ছা একটি কার্যকারণ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন ঘটনা সৃষ্টি হয়।

আমরা আগেই জানি যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বা কারণ অবশ্যই এটারনাল বা চিরন্তন হতে হবে। সুতরাং, যদি স্রষ্টা ইচ্ছাশক্তিহীন বা বুদ্ধিহীন হন, তবে মহাবিশ্বের অস্তিত্বকেও চিরন্তন বা অসীম হতে হবে। কারণ, কোনো বুদ্ধিহীন বা ইচ্ছাশক্তিহীন সত্তার ক্ষেত্রে, তার কার্যকারণ এবং তার প্রভাব (Cause and Effect) একসাথে সমকালীনভাবে অস্তিত্বশীল হয়। ইতোমধ্যে আমরা প্রমাণ করেছি যে মহাবিশ্ব চিরন্তন বা অসীম নয়। তাই, মহাবিশ্বও কখনোই এরকম ইচ্ছাশক্তিহীন বা বুদ্ধিহীন সত্তার মাধ্যমে সৃষ্ট হতে পারে না। সুতরাং, মহাবিশ্বের স্রষ্টার সত্তা বুদ্ধিমান ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হতে হবে, যাতে তিনি নিজের ইচ্ছার মাধ্যমে সময়ের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তি ও পরিকল্পনার ফলস্বরূপ হতে পারে।

স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকার পরেও পৃথিবীতে এতো দুঃখ দুর্দশা কেন?

পৃথিবীতে মানুষ নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করার একাধিক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে 'প্রবলেম অব ইভল' বা মন্দের সমস্যা। এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে আসে: যদি মহাশক্তিধর, দয়াময় আল্লাহ বা স্রষ্টা থেকে থাকেন, তবে পৃথিবীতে এত দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট, অন্যায় ও অরাজকতা কেন? যদি তিনি আমাদের স্রষ্টা হন, তাহলে কেন তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন না?

ইসলামী দৃষ্টিকোণে আল্লাহকে বলা হয় একক সত্তা, যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, তিনি স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং অনিবার্য অস্তিত্ব। এরকম একজন সত্তা যদি থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, তিনি তো জানেন আমাদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে। তিনি তো চাইলেই এই সকল দুঃখ দূর করতে পারেন, তাহলে কেন পৃথিবী এত দুঃখ-দুর্দশা, অন্যায় ও অরাজকতার সম্মুখীন?

এমন প্রশ্ন আসা একদম স্বাভাবিক, এবং এটি বহু নাস্তিকদের অন্যতম যুক্তি, যেহেতু তারা মনে করে যে, যদি একটি পরম দয়াময় সত্তা থাকে, তাহলে কেন দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানো হচ্ছে না? তবে, এই ধারণাটির গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। সম্ভবত আমরা, সাধারণত, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা দেখতে, অনুভব করতে এবং বুঝতে শুধু আমাদের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের চিন্তা অনেক সময় এতটুকু সীমাবদ্ধ থাকে যে, স্রষ্টার অভিপ্রায় ও তার পরিকল্পনাকে পুরোপুরি ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, স্রষ্টার ইচ্ছা এবং তার উদ্দেশ্য কখনোই আমাদের পূর্ণ বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে না, কারণ তিনি এক সীমাহীন সত্তা। পৃথিবীতে যেসব দুঃখ-দুর্দশা বা কষ্ট ঘটছে, তা শুধুমাত্র কোনো এক সত্তার কর্তৃত্বের অভাব বা নিষ্ঠুরতা নয়। বরং, এসবের মধ্যে এক গভীর উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আল্লাহ এই দুঃখ ও দুর্দশাকে কেবল আমাদের পরীক্ষা হিসেবে নাও দেখতে পারেন, বরং আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি এই চ্যালেঞ্জগুলি দিয়েছেন।

তবে, নাস্তিকরা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া এসব দুঃখ, দুর্দশা, অন্যায়, ও অরাজকতাকে কেন্দ্র করে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে! তাদের যুক্তির সংক্ষিপ্ত রূপ;

- যদি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং নৈতিকভাবে নিখুঁত।
- সৃষ্টিকর্তা যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে সৃষ্টিকর্তার সমস্ত মন্দ দূর করার ক্ষমতা রয়েছে।
- সৃষ্টিকর্তা যদি সর্বজ্ঞ হন, তাহলে সৃষ্টিকর্তা জানেন কখন মন্দ থাকে।
- সৃষ্টিকর্তা যদি নৈতিকভাবে নিখুঁত হন, তবে সৃষ্টিকর্তার সমস্ত মন্দ দূর করার ইচ্ছা আছে।
- কিন্তু মন্দ বিদ্যমান।
- যদি মন্দ বিদ্যমান থাকে এবং সৃষ্টিকর্তা অস্তিত্ব থাকে, তাহলে হয় সৃষ্টিকর্তার সমস্ত মন্দ দূর করার ক্ষমতা নেই, বা কখন মন্দ আছে তা জানেন না, বা সমস্ত মন্দকে দূর করার ইচ্ছা নেই।
- অতএব, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই।

সাবেক নাস্তিক দার্শনিক এনটনি ফ্লিউ, জিম আল খলিলি, স্টিফেন ফ্রাই, মাইকেল রুজ, বার্ট ডি.আরমেন সহ প্রায় সকল নাস্তিকের ঘাঁটিতে এই 'মন্দ সমস্যা' যুক্তির স্থান সবার উপরে।

নাস্তিকদের মতে, যদি সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতে ঘটে চলা এতো দুঃখ, দুর্দশা, অন্যায় ও অরাজকতা কীভাবে সম্ভব? যদি এক স্রষ্টা থাকেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সবচেয়ে দয়ালু, কীভাবে তার ইচ্ছাতে পৃথিবীতে এত কিছু যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে? নাস্তিকরা এমন প্রশ্ন তুলে দাবি করে যে, আল্লাহ যদি সত্যিই মহাশক্তিধর ও দয়াময় হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ঘটে চলা এসব অন্যায়-অরাজকতা প্রতিহত করতেন এবং আমাদের সকল দুঃখ-দুর্দশা এক নিমিষেই দূর করে দিতেন। নতাদের যুক্তি আরো গভীরে চলে যায়; যদি পৃথিবীতে এত দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার ও অন্যায় অব্যাহত থাকে, তাহলে কি স্রষ্টা তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সত্যিই মহাশক্তিধর ও দয়ালু হতে পারেন? যদি তিনি সর্বশক্তিমান হতেন, তাহলে তিনি পৃথিবীতে ঘটে চলা অরাজকতা প্রতিরোধ করতেন। যদি তিনি দয়াময় হতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকল কষ্ট দূর করে দিতেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পৃথিবীতে এসব চলছেই, এবং এই পরিস্থিতি নাস্তিকদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

নাস্তিকরা এই সমস্যা দিয়ে নিজেদের যুক্তি খাড়া করতে চায়, যা 'মন্দ সমস্যা' বা 'প্রবলেম অব ইভল' হিসেবে পরিচিত। তাদের মতে, এই যুক্তির মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকে, তবে তিনি হয়তো সর্বশক্তিমান নন, কিংবা দয়াময় নন–অথবা, এইসব বৈশিষ্ট্য কোনোটিই সৃষ্টিকর্তার মধ্যে উপস্থিত নয়। তাহলে, নাস্তিকরা এই প্রশ্নের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার বৈশিষ্ট্যকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন একটি দৃশ্যপট তৈরি করে যেখানে সৃষ্টিকর্তার সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়, এবং তারা এই যুক্তি দিয়ে আসলে দুইটি পথ খোলেন; এক, স্রষ্টার বর্ণিত গুণাবলি ভুল। দুই, স্রষ্টা বলতে আসলে কিছু নেই। তবে, এই বিতর্কের মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা রয়েছে যা স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তার রহস্য এবং আমাদের মুক্ত ইচ্ছা নিয়ে নতুন করে ভাবনার আহ্বান জানায়। আসুন তবে নাস্তিকদের এই যুক্তিটি খোলাসা করি।

মন্দ সমস্যার সমাধান

এই লিখাতে আমরা দুটি উপায়ে প্রমাণ করবো যে কেন মন্দ সমস্যা যুক্তিটি সঠিক নয়। যুক্তি দুটি হলো ১. মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা। ২. ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডার।

মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা

ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমাদের থাকলেও সেই ক্ষমতা কি আদৌ পরম বা এবসোলিউট? না, তা নয়। কেন নয়? কারণ, মানুষের সীমাবদ্ধতার পরিধি অসীম নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা। মানুষ স্বভাবতই সসীম সত্তা। জ্ঞান কিংবা শক্তির ক্ষেত্রে কোনো কিছুতেই সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। আমরা যখন কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি কিংবা বিচার-বিশ্লেষণ করি, তখন তা আমাদের সীমিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই করি। কোনো মানুষই কখনো দাবি করতে পারে না যে তার কাছে অসীম জ্ঞান বিদ্যমান।

এটি শুধু বাস্তবতার পরিপন্থি নয়, যুক্তিতেও তা অসম্ভব। সুতরাং, আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

অন্যদিকে, সৃষ্টিকর্তা বলতে বোঝায় এমন এক পরম সত্তাকে যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার অধিকারী। স্রষ্টার জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, তাই তিনি যখন কোনো ঘটনার অনুমোদন দেন, সেখানে কোনো না কোনো প্রজ্ঞা বা কল্যাণ লুকিয়ে থাকে–যা আমাদের সসীম মানসিকতার সীমার মধ্যে পড়ে না। আমরা স্রষ্টার তুলনায় সীমিত সত্তা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার ঐশী পরিকল্পনার পরিপূর্ণ অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারি না। ফলে, যেটিকে আমরা দুঃখ বা দুর্দশা মনে করি, সেটিও হয়তো তার কোনো গভীর প্রজ্ঞার অংশ। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রজ্ঞার রহস্য আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়। সুতরাং, যদি কেউ দুঃখ, দুর্দশা, অন্যায় বা বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তবে তা হবে নিজের সসীম প্রকৃতিকে অসীম সত্তার সঙ্গে তুলনা করার মতো ভুল। এটি একটি 'ক্যাটাগরি মিস্টেক ফ্যালাসি বা শ্রেণিগত বিভ্রান্তি,' যা চিন্তার একটি গুরুতর ভ্রান্তি হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডার

নাস্তিকরা 'মন্দ সমস্যা' যুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে কেবল দুটি বিশেষত্বের মধ্যেই চিন্তা করে। যেমন, সর্বশক্তিমান এবং সবচেয়ে দয়ালু। যা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু ইসলামী বিশ্বাস মতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তালা শুধু মাত্র আল-কাদীর (মহাশক্তিধর), আর-রহমান (সবচেয়ে দয়াবান) নন। আল্লাহর অরো অনেক বিশেষত্ব আছে। যেমন; আল্লাহর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে 'আল-হাকিম' মানে সবচেয়ে জ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ। মহাজ্ঞানী আল্লাহ যা কিছুই করেন না কেন, তার পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো বিজ্ঞতার ছাপ থাকবে। কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।"[১১৬]

উপরে আমরা স্পষ্ট করেছি যে, স্রষ্টার জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, তাই তিনি যখন কোনো ঘটনার অনুমোদন দেন, সেখানে কোনো না কোনো প্রজ্ঞা বা কল্যাণ লুকিয়ে থাকে–যা আমাদের সসীম মানসিকতার সীমার মধ্যে পড়ে না। আমরা স্রষ্টার তুলনায় সীমিত সত্তা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার ঐশী পরিকল্পনার পরিপূর্ণ অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারি না আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য। ফলে, যদি কেউ দুঃখ, দুর্দশা, অন্যায় বা বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তবে তা হবে নিজের সসীম প্রকৃতিকে অসীম সত্তার সঙ্গে তুলনা করার মতো ভুল। এটি একটি 'ক্যাটাগরি মিস্টেক ফ্যালাসি।' যারা অসীম সত্তাকে সসীম সত্তার সাথে মিলিয়ে ফেলে তারা এক ধরনের কগনেটিভ বায়াসে আক্রান্ত। যাকে বলে ইগো সেন্ট্রিজম। আমরা কোনো কিছুকে যেভাবে চিন্তা করি ঠিক একইভাবে কি আল্লাহকেও চিন্তা করতে হবে? এটা একেবারেই অযৌক্তিক এবং অসম্ভব। যদি তাই

[১১৬] সূরা আল-বাকারা: ২:২১৬

হতো তাহলে, সসীম মানুষ ও অসীম সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্য হতো কোথায়? আমরা যখন কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করি সেখানে আমাদের বুদ্ধিভিত্তিক সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু অতিপ্রাকৃতিক সত্তা যিনি সব চেয়ে মহাজ্ঞানী, যার কাছে রয়েছে সমস্ত জ্ঞানের আঁধার তিনি তো আমাদের মতো চিন্তা করতে বাধ্য নয়! তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

পবিত্র কুরআনে নবি মূসা (আঃ) ও খিজিরের ঘটনাগুলোতে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, খিজির এমন কিছু কাজ করেছিলো যেগুলো বাহিরে থেকে দেখে নবি মূসা (আঃ) এর কাছে অযৌক্তিক মনে হলেও যখন এসব ঘটনার পিছনের কারণ জানতে পারলেন তখন বুঝতে পারলেন যে বুদ্ধিভিত্তিক সীমাবদ্ধতার জন্যই তার কাছে ঘটনাগুলো অনৈতিক মনে হয়েছিল। নবি মূসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর ঘটনা;

"অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের যাকে আমি আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাকে বললঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন - এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? সে বললঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেনা। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে? মূসা বললঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবনা। সে বললঃ আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করনা, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল; মূসা বললঃ আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। সে বলল, আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না? মূসা বললঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেননা এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেননা।[১১৭] ....নৌকাটির বিষয় হল, তা ছিল কিছু দরিদ্র লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করত। আমি নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে চেয়েছি কারণ তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল"।[১১৮]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত খিজির (আঃ) ও নবী মূসা (আঃ)-এর ঘটনাটি আমাদের জন্য এক অনন্য শিক্ষা বহন করে। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করি, আল্লাহর অপার প্রজ্ঞার তুলনায় আমাদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি কতই না সীমাবদ্ধ। নবী মূসা (আঃ)-এর কাছে খিজির (আঃ)-এর কিছু কার্যকলাপ প্রথমে অন্যায় ও মন্দ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেগুলো ছিল আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সেই জ্ঞান মূসা (আঃ)-এর সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থাকায়, তিনি তখনকার প্রেক্ষাপটে সেগুলোর প্রকৃত কল্যাণ বুঝতে পারেননি। খিজির (আঃ) আল্লাহর নির্দেশনাতেই প্রতিটি কাজ করেছিলেন এবং তার প্রত্যেকটি কর্ম ছিল একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ, যা সামগ্রিকভাবে ছিল কল্যাণময় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত। এই ঘটনাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের মানবিক

---

[১১৭] সূরা আল-কাহাফ; ১৮:৭৩
[১১৮] সূরা আল-কাহাফ; ১৮:৭৯

সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় আমরা আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্নিহিত মঙ্গলের অর্থ বুঝতে অক্ষম হই। খিজিরের কাজগুলো নবি মূসা (আঃ) এর কাছে বুদ্ধিভিত্তিক সীমাবদ্ধতার কারণেই মন্দ মনে হচ্ছিল।[১১৯] কিন্তু, পরে যখন তিনি ঘটনার পিছনের কারণ জানতে পেরেছিলেন তখন বুঝতে পেরেছেন যে খিজিরের কাজগুলো ছিল মূলত প্রজ্ঞাময়। অতএব, কুরআনের এই ঘটনাবলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের উচিত সবসময় আল্লাহর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা এবং তার পরিকল্পনার প্রতি বিনম্রভাবে সমর্পিত থাকা। কারণ তিনি যা করেন, তা সর্বদাই কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য।

অনেক সময় আমরা কোনো কিছু পাওয়ার আশায় অগাধ প্রত্যাশায় বুক বেঁধে থাকি। কিন্তু দিনশেষে যখন সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে যায়, তখন হতাশায় ডুবে গিয়ে ভাবি, আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো কিছু রাখেননি। সেই ক্ষণিকের ব্যর্থতা আমাদের মনে বেদনার মেঘ জমায়। কিন্তু সময়ের প্রবাহে যখন আমরা সেই প্রত্যাশার তুলনায় আরও বড়ো কিছু পেয়ে যাই, তখন বুঝি; সেই না পাওয়া ছিল আমাদের জন্য পরম উপকার। আমরা উপলব্ধি করি, যদি সেই সময়েই যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে যেতাম, তবে হয়তো আজকের এই আশীর্বাদ আমাদের কপালে জুটত না। তাহলে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের ক্ষতি বা দুঃখ বলে মনে হওয়া ঘটনাগুলো আসলে সাময়িক ও আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ? এই দুঃখের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে আল্লাহর প্রজ্ঞাময় কোনো মহান উদ্দেশ্য। যা শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্যই কল্যাণকর হয়ে ওঠে। আল্লাহর পরিকল্পনা আমাদের মানবীয় বোঝার ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে। তিনি যেটুকু আমাদের দেন বা দেন না, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে গভীর মঙ্গল। সুতরাং, সাময়িক ব্যর্থতার ভারে ভেঙে না পড়ে আমাদের উচিত এই সত্যটি স্মরণ রাখা যে, আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে তিনি সর্বদা আমাদের কল্যাণের জন্যই কাজ করেন।

ভালো খারাপের বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন, "আল্লাহ নিছক মন্দকার করেন না। আমার তিনি যা কিছু করেন, তার মধ্যে এমন এশটি প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য যা কল্যাণকর। তবে এর মধ্যে কিছু মানুষের জন্য মন্দ পারে, আর এটি আংশিক বা আপেক্ষিক মন্দ। কিন্তু সামগ্রিক বা পরিপূর্ণ মন্দ থেকে আল্লাহ মুক্ত।"[১২০]

সৃষ্টিকর্তা দুঃখ-দুর্দশার পরিবর্তনে কি সবকিছু কল্যাণকর করতে পারতো না?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে পারি; দার্শনিক ও ধর্মীয়।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি; একটি পুরোপুরি কল্যাণময় পৃথিবী তখনই সম্ভব যখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কিংবা কামনা থাকবে না। অর্থাৎ, মানুষ যদি যান্ত্রিক রোবট হতো, তবে হয়তো এমন একটি পৃথিবী কল্পনা করা যেত যেখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো দুর্দশা নেই। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। আমরা কোনো যান্ত্রিক রোবট নই; আমাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা আছে। তাই একটি নিখুঁত মঙ্গলময় পৃথিবী বাস্তবে অসম্ভব। তবে যদি তর্কের

---

[১১৯] মুসা আ:-এর ইলম ছিল ওহি ভিত্তিক। আর নি:সন্দেহে ওহির এলেম শ্রেষ্ঠ-এটাই আমাদের বিশ্বাস। তবে খিজির আ:কে আল্লাহ তত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছিল। এজন্য মুসা আ: শরীয়তের আলোকে প্রশ্ন করেছিলেন যা তার দায়িত্ব। তাই খিজির আ: অধিক জ্ঞানী হলেও শ্রেষ্ঠ এলেম আল্লাহ মুসা আ:-কে দিয়েছিলেন।

[১২০] Hamza Tzortzis;The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; Page: 169

খাতিরে ধরে নিই যে আমাদের পৃথিবী একটি নিখুঁত, সর্বমঙ্গলময় স্থান যেখানে কোনো অন্যায়-অবিচার নেই, দুঃখ-বেদনা নেই; তাহলে কী আমরা এই মঙ্গল অনুভব করতে পারতাম? না, কখনোই পারতাম না। কারণ মন্দ না থাকলে ভালোকে বোঝা যায় না। সুখের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে হলে দুঃখের উপস্থিতি প্রয়োজন। ভালো-মন্দের এই পার্থক্য আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অংশ।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং প্রজ্ঞাময়। তিনি জানেন কোন জিনিসে প্রকৃত কল্যাণ নিহিত, আর কোনটি মানুষের জন্য মঙ্গলকর নয়। তাঁর প্রজ্ঞা অসীম, যা মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অসীম প্রজ্ঞার গভীরতা বিচার করতে পারি না। তাই 'কেন আল্লাহ এটি করেছেন বা ওভাবে করেননি?' –এই প্রশ্ন করা বাস্তবে অযৌক্তিক।

পাশাপাশি, আমাদের জানতে হবে আল্লাহ কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এই পৃথিবী হলো একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। এই জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের সিদ্ধান্ত দেবেন। যদি পরীক্ষা ছাড়াই সবাইকে একসঙ্গে জান্নাতে বা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তবে তা সুবিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না। কারণ, সেক্ষেত্রে একজন জালেম হিটলার ও একজন মহৎ হাজী মুহাম্মদ মহসিনকে একই পাল্লায় মাপা হতো। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরীক্ষা অপরিহার্য। এই জীবন হলো সেই পরীক্ষার মঞ্চ, যেখানে আমাদের কর্ম ও সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আমাদের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আর জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।"[১২১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উদ্দেশ্য পূরণ করলেই আমরা অর্জন করতে পারবো অনন্তকালের সুখময় স্থান, জান্নাত। এ উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই কষ্টের বিনিময়ে আমরা আখিরাতে পেতে পারি জান্নাতের অমলিন শান্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে, যে ব্যক্তি জীবনে কখনো দুঃখ-কষ্টের স্বাদ পায়নি, বিলাসী জীবনে মগ্ন থেকে যার অন্তর আল্লাহর স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে ব্যক্তির তুলনায় সেই মানুষই শ্রেয়তর, যার দুঃখ-যন্ত্রণা তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছে। কষ্টে পুড়ে যে হৃদয় আরও আল্লাহমুখী হয়েছে, সেই হৃদয়ই প্রকৃত সফল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু মানুষ রয়েছেন, যারা বিনা অপরাধে দিনের পর দিন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তখন প্রশ্ন জাগতে পারে–এই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কি কেবলই চিরস্থায়ী? এর উত্তর হলো, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সাময়িক হলেও, এর প্রতিদান শুধুমাত্র এই জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রতিটি দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে কল্যাণ প্রদান করেন, আর আখিরাতে এর পূর্ণ প্রতিদান দেন। সুতরাং, দুনিয়ার যন্ত্রণা ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের মাধ্যমে মেনে নিলে, তা হয়ে ওঠে আখিরাতের সাফল্যের সোপান।

---

[১২১] সূরা আয-যারিয়াত; ৫১:৫৬

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট-ভোগ করা এক জান্নাত যাত্রী কে এক পলক জান্নাত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা "হে আদম সন্তান, কখনো কষ্ট দেখেছ কি? জীবনে কখনো দুঃখ দুর্দশায় ছিলে? সে বলবে, "প্রভু কক্ষনো না! আল্লাহর কসম, আমি জীবনে কখনো কষ্ট পাইনি। কখনো দুর্দশা দেখিনি।[১২২]

এছাড়াও, আমাদের পরীক্ষা করা, যাচাই করাও সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালা বলেন, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।[১২৩]

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।[১২৪]

দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা জানায়- অধিকাংশ চিন্তাবিদ এই প্রবলেম অব ইভল আর্গুমেন্টকে বুদ্ধিহীনতার ফল মনে করেন। নাস্তিক দার্শনিক জে.এল.ম্যাকি স্বীকার করেছেন, "ভালো/মন্দ অর্থাৎ মূল্যবোধের অস্তিত্ব নেই।"[১২৫]

ডারউইনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালো মন্দ বলে কিছুই নেই। ভালো মন্দ বলতে যদি কিছু না থাকে তাহলে 'মন্দ সমস্যা' যুক্তিতে নাস্তিকরা মূলত মন্দের জন্যই সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে। তাই 'মন্দ সমস্যা' যুক্তিটির শুরুতেই স্ববিরোধী অবস্থান বিদ্যমান।[১২৬]

নাস্তিক পণ্ডিত Chad Meister এর মতে, "প্রবলেম অব ইভল আস্তিকতার বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত যুক্তি নয়, বরং আবেগি যুক্তি।" [১২৭]

নাস্তিক দার্শনিক জে.এল. ম্যাকি স্বীকার করেছেন, "মন্দ সমস্যা যুক্তি আস্তিক্যবাদের কেন্দ্রীয় মতবাদগুলো যৌক্তিকভাবে অবান্তর এমনটা প্রমাণে ব্যর্থ।"[১২৮]

[১২২] সহিহ মুসলিম; ৬৯৮১
[১২৩] সূরা আল-মুলক; ৬৭:২
[১২৪] সূরা দাহর (ইনসান); ৭৬:২
[১২৫] Patrick sherry, problem of evil
[১২৬] J.L Inventing Ethics Right and Rather. Page-15
[১২৭] Mr. Chad; Introducing Philosophy of Religion; Page-144
[১২৮] J. L Makiye; t Miracle of Theism. Page-154

স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের বোঝা কার উপর?

নাস্তিকদের অন্যতম প্রধান যুক্তি হলো 'বার্ডেন অব প্রুফ' বা 'প্রমাণের বোঝা'। তাদের মতে, যে কোনো দাবি যিনি করবেন, প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্ব তার। তাই তারা বলে, যেহেতু আস্তিকরা দাবি করেন যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার দায়ও আস্তিকদের। আপাতদৃষ্টিতে এই দাবি যুক্তিসংগত মনে হতে পারে।

যদি কেউ বলে, "তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে স্রষ্টা নেই," এবং অন্যজন তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি প্রমাণিত হয় না যে স্রষ্টা আছেন। কারণ এটি 'অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তি'। কোনো কিছুর অভাব প্রমাণ করাই যে তার বিপরীত সত্য, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসংগত নয়। একইভাবে, যদি নাস্তিকরা দাবি করেন, "তুমি প্রমাণ করতে পারো না যে স্রষ্টা আছেন, তাই স্রষ্টা নেই," এ ক্ষেত্রেও এটি অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তি। কারণ কোনো কিছুর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হওয়া মানে সেই বস্তু বা সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যৌক্তিক হবে না।

তাই 'দাবি যার, প্রমাণের বোঝাও তার' যুক্তিটি নাস্তিকদের দিকেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা দাবি করেন যে, "স্রষ্টা নেই," তাই এই দাবির পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্ব তাদেরও। যাই হোক, 'দাবি যার প্রমাণের বোঝাও তার' এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে কেউই আমাদের কাছে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ চাইতেই পারে। কারণ আমরা দাবি করি স্রষ্টা অস্তিত্বশীল। আমরা ইতোমধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি প্রমাণনির্ভর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট, নির্ভরশীলতার যুক্তি। তাই, আস্তিকদের জন্য স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটি দার্শনিক বা যৌক্তিক দায় হলেও, এই যুক্তি ইতোমধ্যেই সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা হয়েছে।

কিন্তু 'দাবি যার প্রমাণের বোঝাও তার' এই যুক্তিটিকে রিভার্স করে আমরা প্রমাণের বোঝা নাস্তিকদের দিকেও ঘুরিয়ে দিতে পারি। আমরা এখানে তাই করবো।

বার্ট্রান্ড রাসেলের চায়না চা-পাত্রের যুক্তি

'দাবি যার প্রমাণ তার' এই বিষয়টি বুঝার জন্য আমাদের দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের Teapot Argument সম্পর্কে জানতে হবে। নাস্তিশরা প্রায়শই বার্ট্রান্ড রাসেলের টিপট যুক্তি ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিশ্বাসের পক্ষে। দার্শনিক রাসেল মূলত যুক্তিটিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন;

যদি আমি প্রস্তাব করি যে পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের মধ্যে, একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান একটি চায়না চা-পাত্র রয়েছে এবং চা-পাত্রটি এতোটাই ছোট যে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়েও দেখা যাবে না। তাই কেউই এই দাবিকে অস্বীকার করতে সক্ষম হবে না। এই কারণে দার্শনিক রাসেল বলেন, যেহেতু তার এই বক্তব্যকে অপ্রমাণিত করা যায় না, তাই এটাকে সন্দেহ করাটা একটি অসহনীয় অনুমান। কাজেই আমি সঠিক কথা (উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান একটি চায়না চা-পাত্র রয়েছে) বলেছি এটাই মনে করা উচিত।

এই যুক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে একটি যুক্তিসংগত উপসংহারের দিকে নির্দেশ করে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকলে কাউকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে বাধ্য করা উচিত নয়। যাইহোক, কিছু নাস্তিক টিপট আর্গুমেন্টকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে। তারা এই যুক্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করে যে, যদি ঈশ্বরের পক্ষে প্রমাণের অভাব থাকে তবে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত যে ঈশ্বর নেই। অর্থাৎ, যেহেতু কেউ স্রষ্টার প্রমাণ দিতে পারেনি তাই স্রষ্টা নেই এমনটা বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু এটি অজ্ঞতা ভ্রান্ত যুক্তির শামিল তা উপরে আলোচনা করে এসেছি।

রাসেলের টিপট আর্গুমেন্ট থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো কিছু বিশ্বাস করতে হলে বিশ্বাসের স্বপক্ষে অবশ্যই প্রমাণ লাগবে। কিন্তু 'কোনো কিছু বিশ্বাস করতে হলে তার পক্ষে প্রমাণ লাগবে' এই দাবির পক্ষে কি নাস্তিকরা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে? প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে কি আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, কোন কিছু বিশ্বাস করতে হলে বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই? যুক্তিপ্রবণ মানুষ হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা কোনো কিছু বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ চাই কারণ প্রমাণ চাওয়াটা আমাদের কাছে বোধগম্য মনে হয়। একইভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটাই আমাদের কাছে বোধগম্য মনে হয়। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি আমাদের এটাই জানান দেয় যে এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। কারণ আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধ (Cause & Effect) সম্পর্কে জানি। কেউ কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারবে না! আবার স্রষ্টার বিশ্বাস মানব মনের স্বাভাবিক এবং সহজাত বিশ্বাস।

যাইহোক, রাসেলের টিপট আর্গুমেন্টটি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে ব্যর্থ। এটি আমাদের বুঝায় যে, কোন কিছুর স্বপক্ষে প্রমাণ থাকলে বিশ্বাস করা উচিত এবং প্রমাণ না থাকলে বিশ্বাস করা উচিত না। তবে প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা হলে তা অজ্ঞতা ভ্রান্তি বলে বিবেচিত হবে।

রাসেলের যুক্তিটিতে একটি চায়না চা-পাত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যেটি পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের মধ্যে, একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু একটি চা-পাত্র স্বাভাবিকভাবে এমন একটি বস্তু যা মহাকাশে থাকার কথা নয়। সুতরাং, রাসেলের টিপট আর্গুমেন্টটির চিন্তাটি মহাকাশে ঘটতে পারে না, যদিনা কোন মানুষ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে চা-পাত্রটিকে সেখানে না রেখে আসে। অথবা, কোন প্রাকৃতিক কারণ পৃথিবী থেকে চা-পাত্রটিকে সেখেনে ফেলে না আসে।

এই পর্যায়ে আমরা রাসেলের যুক্তিটির অসারতা নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমরা এই Teapot Argument কে রিভার্স করে প্রমাণের বোঝা নাস্তিকদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি এবং আমরা তাই করবো। এক্ষেত্রে আমরা একটি কাল্পনিক গল্পের সহযোগিতা নিতে পারি।

মিসবাহ এবং উদয় কোন এক কফিশপে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের আড্ডার টপিক হলো স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণের বোঝা কার উপর?

উদয়, মিসবাহকে উদ্দেশ্য করে রাসেলের টিপট আর্গুমেন্টটি শুনিয়ে বলেন, "যেহেতু তুই দাবি করেছিস স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, তাই তোকেই প্রমাণ করতে হবে যে স্রষ্টা আছে।"

মিসবাহ রাসেলের চা-পাত্র আর্গুমেন্টটিকে রিভার্স করলেন। সে তার বন্ধু উদয়কে বললো, "ওই যে কফিশপের বাহিরে মাঠের শেষ প্রান্তে একটা বড় বাড়ি দেখতে পাচ্ছিস?"

উদয়ঃ "হুম দেখতে পাচ্ছি। বাড়িটি খুব সুন্দর করে ডিজাইন করা, এমন বাড়ি এই শহরে খুব একটা দেখা যায় না।"

মিসবাহঃ "আচ্ছা, এই জায়গায় বাড়িটি কীভাবে তৈরি হলো?"

উদয়ঃ "অবশ্যই কোন বাড়ি প্রস্তুতকারী মিস্ত্রি, ইঞ্জিনিয়ারসহ বাড়িটি তৈরি করেছেন।"

মিসবাহঃ "কিন্তু এখানে কোন মিস্ত্রি বা ইঞ্জিনিয়ার কখনোই আসেনি। কোন বুদ্ধিমান সচেতন সত্তা এই বাড়িটি তৈরি করেনি। বাড়িটি শূন্য থেকে নিছক দুর্ঘটনাক্রমে তৈরি হয়েছে।"

উদয়ঃ "তুই যে দাবিটি করেছিস তা একজন যৌক্তিক মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে নিশ্চয়ই বোধগম্য নয়। একজন বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে আমি কখনোই এই দাবি মেনে নিতে পারি না।"

মিসবাহঃ "কিন্তু কেন এই দাবিটি বোধগম্য নয়? দাবিটিকে বোধগম্য বলার পূর্বে তোর উচিত আমাকে প্রমাণ দেওয়া যে এই বাড়িটি শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসেনি।"

উদয়ঃ "হা হা হা... তুই তো বার্ডেন অব প্রুফ ফ্যালাসি করছিস! যেহেতু বাড়িটি শূন্য থেকে অস্তিত্বে এসেছে এই দাবি তুই করেছিস তাই তোকেই প্রমাণ করতে হবে যে এই বাড়িটি শূন্য থেকেই এসেছে। আমি কেন প্রমাণ করবো এই বাড়িটি শূন্য থেকে আসেনি!"

মিসবাহঃ "আচ্ছা, তুই তোর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এর মাধ্যমে বুঝতে পারলি যে এই বাড়িটি শূন্য থেকে অস্তিত্ব আসতে পারে না। এই দাবিটি একদমই বোধগম্য নয়। কারণ তুই জানিস Cause & Effect সম্পর্কে। কার্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়া কোন কিছুই নিছক দুর্ঘটনাক্রমে শূন্য থেকে সুনিপুণভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের কাছে এটাই বোধগম্য। তাই আমি যখন বললাম ঐ বাড়িটি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে তখনই তুই বললি এটা বোধগম্য নয়, আমার উচিত প্রমাণ করা যে কীভাবে বাড়িটি শূন্য থেকে অস্তিত্বে এসেছে! তাহলে একজন নাস্তিক যখন দাবি করে বাড়িটির মতো মহাবিশ্ব শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে তখন সেই দাবিটিও নিশ্চয়ই বোধগম্য নয়! কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং মানুষের সহজাত মৌলিক বিশ্বাস অনুযায়ী মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। কাজেই, এখানে 'বার্ডেন অফ প্রুফ' অর্থাৎ, মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রমাণ করার বোঝা নাস্তিকদের উপর! নাস্তিকদের প্রমাণ করতে হবে যে, কীভাবে এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

কাল্পনিক এই গল্পটির মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, শুধু স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেই যে প্রমাণের বোঝা আস্তিকের উপর আসে তা নয়! বরং, যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদের উপরও প্রমাণের বোঝা আছে। আমরা 'স্রষ্টা; সঠিক মৌলিক বিশ্বাস বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য' অংশে ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি যে স্রষ্টার বিশ্বাস মানব মনের মৌলিক বা সহজাত বিশ্বাস। মৌলিক বা সহজাত বিশ্বাসগুলো 'ওয়ারেন্টেড' এবং তা স্বতঃসিদ্ধ বা নিশ্চিত বিশ্বাস, তা ইতোমধ্যেই

আমরা 'স্রষ্টা; স্বতঃসিদ্ধ' অংশে প্রমাণ করেছি। সহজাত, স্বতঃসিদ্ধ, বা মৌলিক নিশ্চিত বিশ্বাসগুলো জ্ঞান হওয়ার জন্য কোনো প্রমাণ বা যুক্তির উপর নির্ভর করে না। এগুলো প্রমাণ নিরপেক্ষ যা স্বাধীন ভাবে জ্ঞানে পরিণত হয়।

যেহেতু, সহজাত, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক নিশ্চিত বিশ্বাস বা ওয়ারেন্টেড বিষয়গুলো প্রমাণ করার জন্য কোন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। সেহেতু, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষেও কোন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। তাই বার্ডেন অফ প্রুফ বা প্রমাণের বোঝা আস্তিকদের উপর এ কথা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, সহজাত, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক নিশ্চিত বিশ্বাসগুলো যদি কেউ অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে তাহলে কেন সে এই বিষয়গুলো অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে তার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। কাজেই, কেউ যখন দাবি করবে 'সৃষ্টিকর্তা নেই' বা 'সৃষ্টিকর্তার প্রমাণের অভাব রয়েছে', তাকেই তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। নাস্তিক্যবাদ যেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাই নাস্তিকদের প্রমাণ করতে হবে কেন স্রষ্টা নেই।

গড অফ দ্যা গ্যাপাস নাকি সায়েন্স অফ দ্যা গ্যাপস?

সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন– এই দাবির বিপরীতে একটি পরিচিত আপত্তি হলো 'গড অফ দ্য গ্যাপস'। এ ধারণাটি এমন একটি যুক্তিকে বোঝায়, যেখানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে, সেখানে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের ধারণা প্রবেশ করানো হয়। অর্থাৎ, বিজ্ঞান যদি কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হয়, তখন তা স্রষ্টার হস্তক্ষেপ বলে মেনে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান আমাদের বলে, এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে–এই বিস্ফোরণটি কেন ঘটল? মহাবিস্ফোরণের আগের সিঙ্গুলারিটি বা সেই একবিন্দু অস্তিত্ব এল কোথা থেকে? এসব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। এই শূন্যস্থান পূরণে আস্তিকরা দাবি করেন যে, স্রষ্টাই এই সিঙ্গুলারিটি সৃষ্টি করেছেন এবং মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তাদের মতে, এসব বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের পেছনে ঐশ্বরিক কারণ বিদ্যমান। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞান যেহেতু স্রষ্টা নেই এমন দাবি করেনি তাই আস্তিকরা দাবি করে স্রষ্টা আছে। এই হচ্ছে মূলত 'গড অফ দ্যা গ্যাপস'। তবে এই যুক্তিকে নাস্তিকরা ভুল এবং অজ্ঞতাপ্রসূত বলে দাবি করেন। তাদের মতে, বিজ্ঞান একদিন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবে। সুতরাং, এখানে স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নেই।

নাস্তিকদের এই যুক্তিটি দুর্বল এবং স্ববিরোধী। প্রথমত, 'গড অফ দ্য গ্যাপস' এর ধারণাটি পূর্বনির্ধারিতভাবে ধরে নেয় যে, জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এমন ধারণা নিজেই সংকীর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে। নাস্তিকদের মতে, যেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু এটি আসলে একটি ভুল ধারণা। জ্ঞানের পরিধি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গণ্ডির বাইরে বিস্তৃত হতে পারে, এবং স্রষ্টার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া কেবল বিজ্ঞানের শূন্যতার ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি গভীর দার্শনিক ও অস্তিত্ববাদী বিষয়, যা বিজ্ঞানের গণ্ডি অতিক্রম করে। যারা দাবি করে যে জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ, তারা মূলত নিজেদের চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রকেই সংকুচিত করে ফেলে। কারণ 'জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ,' এই দাবির জন্যই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

বিজ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। বরং বিজ্ঞান এমন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি, যেগুলোর সমাধান বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাইরে। তাই আস্তিকদের বিশ্বাসকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল বলে অভিহিত করা ভুল। 'গড অফ দ্য গ্যাপস' ধারণা প্রয়োগ করে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করার চেষ্টা করলেও, এই অবস্থান আসলে নিজেদের যুক্তির দুর্বলতাই প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ধরা না পড়া মানেই তা নেই, এমন চিন্তাধারা আসলে বিজ্ঞানের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং এ ধরনের ধারণা লালন করে কেবল তারা, যারা বিজ্ঞানকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সীমাবদ্ধতাকে বোঝে না। বিজ্ঞান কখনোই কোনো বিষয়ের অনস্তিত্ব ঘোষণা করে না; বরং এটি অনুসন্ধান ও প্রমাণের পথিক।

নাস্তিক নিউরো সাইন্টিস্ট রেমন্ড ট্যালিস এর মতে, "যেহেতু বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়েনি, তাই এর কোন অস্তিত্ব নেই এমন মানসিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোন

সম্পর্ক নেই। বরং, এমন কথা তারাই বলে যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান মনে করে। এটা বিজ্ঞানবাদী আচরণ"।[১২৯]

পূর্ব থেকে কোন কিছু অনুমান করে নেওয়াটা এক ধরনের কুযুক্তি যা লোডেড কোশ্চেন ফ্যালাসি নামে পরিচিত। সুতরাং, 'গড অফ দ্যা গ্যাপ' যুক্তিটির সূচনা হয়েছে ভ্রান্তি বা কু-যুক্তি দিয়ে।

'জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা সম্ভব'–এই দাবিটিকে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা সম্ভব? কখনোই না। এই দাবি নিজেই বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে। এটি পরস্পরবিরোধী একটি অনুমান, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। ফলে, নাস্তিকরা যখন এ ধরনের দাবি করে, তারা আসলে এমন কিছু অনুমান গ্রহণ করছে যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আওতায় পড়ে না। এটি তাদের স্ববিরোধী একটি অবস্থান।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যুক্তি বা রিজনিংও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। লক্ষণীয় যে, 'জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা সম্ভব'–এই দাবিটিই যুক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিজ্ঞান নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যুক্তিবিদ্যার একটি শাখা, 'ইন্ডাক্টিভ মেথড,' ব্যবহার করে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানও যুক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই যুক্তি ছাড়া বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে গণিতকে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু গণিতের সিদ্ধান্তগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, '২+২=৪'–এই সত্যটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তাই, 'জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব' এই ধারণা নিজেই ভুল।

সুতরাং, 'জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক হতে হবে' বা 'জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'–এই দাবিটি একটি ভ্রান্তি। জ্ঞান অর্জনের পথ বহুবিধ, এবং বিজ্ঞান তার মধ্যে একটি মাত্র। যুক্তি, অভিজ্ঞতা, এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে নাকি নেই; এই বিষয়ে বিজ্ঞান কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না। কারণ এটি বিজ্ঞানের আওতাধীন বিষয় নয়। বিজ্ঞান কেবলমাত্র বস্তুজগৎ বা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরীক্ষণযোগ্য, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নটি এই সীমারেখার বাইরে। এটি অধিবিদ্যার (মেটাফিজিক্স) একটি আলোচ্য বিষয়।

নাস্তিকরা প্রায়ই 'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তি তুলে ধরে বলে থাকে, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তাদের মতে, যেহেতু বিজ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করেনি, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যৌক্তিক নয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রভুক্ত নয়, তার অস্তিত্বের প্রমাণ বিজ্ঞান থেকে চাওয়াটাই একধরনের হাস্যকর ভুল। এটি এমন যেন কেউ জ্যামিতির সূত্র দিয়ে প্রেমের গভীরতা মাপার চেষ্টা করছে। উপরন্তু, মানব মনের অনেক সহজাত ধারণা আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি না। যেমন–সুন্দরতা, ন্যায়বিচার, ভালোবাসা কিংবা নৈতিকতার ধারণাগুলো। তবু এগুলো মানুষের চেতনাজগতে গভীরভাবে প্রোথিত। একইভাবে, স্রষ্টার অস্তিত্বও মানব মনের একটি সহজাত এবং

---

[১২৯] ড. রাফান আহমেদ, হোমো স্যাপিয়েন্স, পৃ ১৪৩

স্বাভাবিক বিশ্বাস। যুগে যুগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। এটি এমন এক বিশ্বাস, যা আমাদের অভ্যন্তরীণ বোধের সাথে মিলে যায় এবং মানবিক অভিজ্ঞতার গভীরতর স্তরগুলোতে আলো ফেলে।

তৃতীয়ত, নাস্তিকদের 'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তি একটি নির্দিষ্ট পূর্বধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, 'বিজ্ঞান একদিন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।' কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ধারণার পক্ষে তাদের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি? নাস্তিকরা কি এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র বা পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পেরেছে যে, বিজ্ঞান একদিন জগতের প্রতিটি রহস্যের পর্দা উন্মোচন করবে? বাস্তবে, এই ধারণাটি নিজেই একটি অযৌক্তিক বিশ্বাসের মতো। এটি এমন একটি প্রত্যাশা যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বরং এটি একটি অনুমান মাত্র, যা তাদের বিশ্বদর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তারা যখন বলে, "বিজ্ঞান একদিন সবকিছুকে ব্যাখ্যা করবে," তখন তারা আসলে বিজ্ঞানকেই একটি সর্বজ্ঞ সত্তা হিসেবে কল্পনা করছে। কিন্তু বিজ্ঞান নিজেই একটি সীমাবদ্ধ পদ্ধতি, যা কেবল বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরীক্ষণযোগ্য দিকগুলো নিয়ে কাজ করে। এমনকি বিজ্ঞানও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

সুতরাং, "বিজ্ঞান একদিন সব কিছু ব্যাখ্যা করবে"–এই ধারণা একটি কাল্পনিক প্রত্যাশার বেশি কিছু নয়। এটি এমন একটি বিশ্বাস যা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিজ্ঞানের সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, অথচ তা প্রমাণের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তাই, এই দাবি এক অর্থে 'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তিরই আরেক রূপ, যেখানে প্রমাণের অভাব একটি অনুমানের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়।

চতুর্থত, 'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তিতে নাস্তিকরা দাবি করেন, আস্তিকরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফাঁকা জায়গাগুলোতে বা বিজ্ঞানের অজানা বিষয়গুলোতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দেয়। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? আসলে, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আমরা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে ব্যবহার করি না। বরং আমরা যুক্তির বিভিন্ন শাখা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করি। এই বইয়েও স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আমরা একাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। তাই এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে আস্তিকরা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার শূন্যস্থান পূরণ করতে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থাপন করে।

স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস মানব মনের সহজাত এবং প্রাকৃতিক একটি অনুভূতি। এটি কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফাঁকা জায়গা পূরণের প্রচেষ্টা নয়, বরং এটি একটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও যৌক্তিক বিশ্বাস, যা দর্শন, অধিবিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কখনোই বলি না যে, "বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারেনি, তাই স্রষ্টা আছেন।" বরং, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আমাদের বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচক প্রমাণ, যৌক্তিক প্রমাণ আছে।

'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তির ভিত্তিতে নাস্তিকরা বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করে–

১. জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা সম্ভব; কিন্তু এই দাবি নিজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণযোগ্য নয়।

২. স্রষ্টার অস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয়; অথচ স্রষ্টার অস্তিত্ব বিজ্ঞানের আওতার বাইরে।

৩. বিজ্ঞান একদিন সব কিছু ব্যাখ্যা করবে; কিন্তু এটি কেবল একটি অনুমান, যা বাস্তবিক অর্থে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।

৪. আস্তিকরা বৈজ্ঞানিক ফাঁকা জায়গা পূরণে ঈশ্বরকে ব্যবহার করে; কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ, কারণ স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে আমরা বিভিন্ন যৌক্তিক ও প্রমাণনির্ভর তর্ক উপস্থাপন করি।

তাই, 'গড অফ দ্য গ্যাপস' যুক্তিটি একটি ভ্রান্তি। এটি এমন একটি কু-যুক্তি যা নাস্তিকরা তাদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি এতটাই বিস্তৃত যে এটি কোনো 'ফাঁকা জায়গা' পূরণ করার প্রয়াস নয়; বরং এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্বাস।

স্রষ্টা একজন আছে তবে প্রচলিত ধর্মগুলো মিথ্যা?

কিছু মানুষের বিশ্বাস, স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রাকৃতিক নিয়মকানুন স্থির করে দিয়েছেন, যার ফলে এই বিশ্ব এক সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। তবে, এই ধারণা অনুসারে স্রষ্টা জগৎ সৃষ্টি করার পর নিজেকে এর থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। তিনি আর এই জগতে কোনো হস্তক্ষেপ করেন না, এবং এটি এখন একটি ঘড়ির মতো নিজস্ব নিয়মে চলমান।

ঘড়ি মেকারের উদাহরণ দিয়ে এই ধারণাটি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন ঘড়ি মেকার যেমন ঘড়ি তৈরি করে তার ভেতর সমস্ত যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে বসিয়ে দেন এবং নিশ্চিত করেন যে ঘড়ি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সচল থাকবে, এরপর আর ঘড়ির কার্যক্রমে তার কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না; তেমনই স্রষ্টাকে কল্পনা করা হয়। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, স্রষ্টা শুধু মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এরপর তিনি নিজেকে জগতের কার্যক্রম থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাই এই ধারণার স্রষ্টাকে চিত্রায়িত করা হয় 'অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ বা ডিইজম' (Desim) হিসেবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যে মতবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে বলা হয় অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ বা ডিইজম। এই মতবাদে, স্রষ্টা ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে কোনো আন্তঃসম্পর্ক নেই বলে মনে করা হয়। স্রষ্টা এবং মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। তারা বিশ্বাস করেন, মহাবিশ্ব একটি স্বতন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় সত্তা, যা তার নিজের নিয়মে চলছে। এই মতবাদ প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসেরও বিরোধিতা করে। প্রচলিত ধর্মগুলো যেমন শেখায় যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রাখেন, ঐশ্বরিক বাণীর মাধ্যমে মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন, এবং পরকালে বিচার করবেন; ডিইজম এই সমস্ত ধারণাকে অস্বীকার করে। এই ধারণা অনুসারে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন না, কোনো ঐশ্বরিক বার্তা পাঠান না, এবং মানবজাতির কোনো কল্যাণ বা পরীক্ষার জন্য জগতে হস্তক্ষেপ করেন না। স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনো পরকালীন বিচার বা পুরস্কার-শাস্তির ধারণাও অবাস্তব।

Cambridge Dictionary মতে, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ হলো, একক ঈশ্বরে বিশ্বাস যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কিন্তু ঘটনাকে (মহাবিশ্বের) প্রভাবিত করার জন্য কাজ করেন না।[১৩০]

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সমালোচনা

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ; যেখানে স্রষ্টাকে সৃষ্টিজগতের বাইরে এবং জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদের অসংগতিগুলো গভীর এবং তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো; ১) স্রষ্টার জ্ঞানের ভিত্তিতে দেবতাবাদ অসংগত ২) স্রষ্টার নৈতিক চরিত্রের কারণে দেবতাবাদ অসংগত ৩) ঐশ্বরিক বানী সম্ভব এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

---

[১৩০] DEISM | English meaning - Cambridge Dictionary

স্রষ্টার জ্ঞানের ভিত্তিতে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অসংগত

'স্রষ্টার প্রকৃতি' এবং 'স্রষ্টা কি ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থ নাকি বুদ্ধিমান সত্তা'—এই বিষয়গুলোতে আমরা ইতিমধ্যে স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীর আলোচনায় প্রবেশ করেছি। এ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যুক্তিসিদ্ধভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, স্রষ্টা নিখুঁত প্রজ্ঞা এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী। এই উপলব্ধি আমাদের একটি সুসংগঠিত ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট নির্মাণে সহায়তা করে, যা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের অসারতা প্রমাণে কার্যকর। যুক্তিটি নিম্নরূপ;

- P1: যে কোন অর্থপূর্ণ জিনিসকে সৃষ্টি বা চালিত করতে প্রজ্ঞার প্রয়োজন এবং তা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয়।
- P2: স্রষ্টা হচ্ছে নিখুঁতভাবে বা সবচেয়ে জ্ঞানী।
- P3: অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ পৃথিবীতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপকে বাতিল করে।
- P4: স্রষ্টার জ্ঞান জগতে তাঁর অ-হস্তক্ষেপের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।
- Conclusion: সুতরাং, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক।

ব্যাখ্যা;

- **P1: যে কোন অর্থপূর্ণ জিনিসকে সৃষ্টি বা চালিত করতে প্রজ্ঞার প্রয়োজন এবং তা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয়।**

আমরা সহজাতভাবেই উপলব্ধি করি যে, কোনো কিছু সৃষ্টি করতে হলে কিংবা সৃষ্ট জিনিসকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রজ্ঞার উপস্থিতি অপরিহার্য। সৃষ্টির পেছনে জ্ঞান, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।

আমরা একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম—যেখানে আপনি একটি খেলনার গাড়ি তৈরি করেছেন। এবার সেই উদাহরণটি আবার স্মরণ করুন। আপনি যখন খেলনার গাড়িটি নির্মাণ করলেন এবং তা পরিচালনার ব্যবস্থা করলেন, তখন এ কাজগুলো সম্পন্ন করতে আপনার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গাড়িটি আপনি এমন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তৈরি করেছিলেন, যা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। প্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা প্রতিটি সৃষ্টিতে একই সত্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। এখানে এমন কিছুই নেই যা কোনো প্রজ্ঞা ছাড়াই তৈরি হয়েছে কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে বিদ্যমান। প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, গভীর জ্ঞান, এবং লক্ষ্য। অতএব, সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম এবং উদ্দেশ্যবোধ স্রষ্টার প্রজ্ঞার অপরিহার্যতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এটি প্রমাণ করে, সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব কতটা গভীর।

- **P2: স্রষ্টা হচ্ছে নিখুঁতভাবে বা সবচেয়ে জ্ঞানী।**

আমরা ইতোমধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, স্রষ্টার প্রজ্ঞা তাঁর সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমন একজন স্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান, সুনিপুণ স্রষ্টা, তিনি কখনোই প্রজ্ঞাহীন হতে পারেন না। তাঁর প্রজ্ঞা এতটাই নিখুঁত যে, তাতে কোনো সীমাবদ্ধতার অবকাশ নেই। যদি এমন কোনো সীমাবদ্ধতা থাকত, তবে তিনি স্রষ্টা হিসেবে বিবেচিত হতেন না। তাই, স্রষ্টার প্রকৃতি আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, তিনি নিখুঁত এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

- **P3: অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ পৃথিবীতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপকে বাতিল করে।**

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্রষ্টা পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করে না।

- **P4: অতিবর্তী ঈশ্বরের জ্ঞান জগতে তাঁর অ-হস্তক্ষেপের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।**

P4 হচ্ছে আমাদের এই যুক্তির মূল পয়েন্ট। এই যুক্তির মূল ভিত্তি হলো, স্রষ্টার প্রজ্ঞা জগতের প্রতি তাঁর অ-হস্তক্ষেপের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, যদি স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে তাতে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে তা তাঁর প্রজ্ঞার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে; কোন কারণ বা উদ্দেশ্যে স্রষ্টা এই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন? যদি স্রষ্টা কোনো কারণ ছাড়াই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন, তবে তা নিছক উদ্দেশ্যহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কি করে একজন বুদ্ধিমান সত্তা অনর্থক, অকারণে, কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন? ধরা যাক, স্রষ্টা মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম এবং প্রাকৃতিক আইন স্থাপন করলেন, তারপর তিনি মহাবিশ্বের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়লেন। তাহলে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা এবং তারপর তা উপেক্ষা করা কি প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে পারে? যদি স্রষ্টা জগতে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব এবং মানুষের পৃথিবীতে প্রেরণ—দুটোই উদ্দেশ্যহীন হয়ে দাঁড়ায়।

যেহেতু স্রষ্টা সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর জ্ঞানের অসীমতা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীরা অনস্বীকার্যভাবে মানতে বাধ্য, তাই বলা যায়, স্রষ্টা অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। তাঁর অসীম প্রজ্ঞা কখনোই সৃষ্টিকে উপেক্ষা করার মতো বৈপরীত্যে জড়াবে না। তাই যদি তিনি জগতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে তা কি তাঁর প্রজ্ঞার পরিপন্থি নয়? এই যুক্তি স্পষ্ট করে যে, স্রষ্টার প্রজ্ঞা এবং জগতের প্রতি তাঁর দায়িত্ব—দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা স্রষ্টার প্রকৃতির ভুল ব্যাখ্যার নামান্তর।

অনেক ঈশ্বরবাদী হয়তো বলবেন, "স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্যেই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি এই জগতের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।" তবে এই দাবি আদৌ আমাদের যুক্তি,'স্রষ্টার জ্ঞান জগতে তাঁর অ-হস্তক্ষেপের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ'কে খণ্ডন করতে পারে না।

স্রষ্টা যদি প্রকৃতপক্ষে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে; তিনি কীভাবে তাঁর সৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবেন? একজন প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা কি এমন হতে পারেন, যিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন? মহাবিশ্ব সম্পর্কে তিনি যদি সর্বজ্ঞ হন এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য যথাযথ কারণ বা উদ্দেশ্যও থাকে, তবে তাঁর হস্তক্ষেপের অভাব কি একরকম দ্বন্দ্ব তৈরি করে না? এমনকি প্রশ্ন জাগে, স্রষ্টা কি কেবল আত্মবিনোদনের জন্য, নিছক একঘেয়েমি কাটানোর উদ্দেশ্যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন?

"স্রষ্টা একটি কারণ বা উদ্দেশ্য নিয়ে মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন, তবুও তিনি এই জগতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না"—এই বক্তব্যকে নৈতিক ভিত্তিতেও গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। স্রষ্টার কাজের পেছনে কেবল একটি উদ্দেশ্য থাকার দাবি তাঁকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রশ্ন থেকে যায়, যদি স্রষ্টা এই মহাবিশ্বের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে কেন তিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষের প্রতি আগ্রহী হবেন না? এই সমস্ত প্রশ্ন স্রষ্টার প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করার দাবি জানায় এবং দেখায় যে, অ-হস্তক্ষেপের ধারণা স্রষ্টার প্রজ্ঞার সঙ্গে গভীরভাবে অসংগত।

- **Conclusion: সুতরাং, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক।**

যেহেতু, স্রষ্টার জগতের অ-হস্তক্ষেপের বিষয়টি স্রষ্টার প্রজ্ঞার গভীরভাবে অসংগত তাই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ একটি অযৌক্তিক মতবাদ।

স্রষ্টার নৈতিক চরিত্রের সাথে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সংঘাত

স্রষ্টার প্রকৃতি অর্ধায়ে ইতিমধ্যে আমরা প্রমাণ করেছি যে, স্রষ্টা (আল্লাহ) সর্বোচ্চ ভালো। তাই আমাদের যুক্তি হলো,

- P1: নৈতিকতায় পরোপকারিতা এবং ন্যায়বিচারের প্রয়োজন।
- P2: অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ স্রষ্টার নৈতিকগুন স্বীকার করে কিন্তু জগতে স্রষ্টার হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে।
- P3: স্রষ্টা যদি জগতে হস্তক্ষেপ না করে তবে তার নৈতিকতা স্রষ্টার নৈতিকগুণ তার জগতে অ-সম্পৃক্ততার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।
- Conclusion: সুতরাং, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক।

ব্যাখ্যা;

- **P1: নৈতিকতায় পরোপকারিতা এবং ন্যায়বিচারের প্রয়োজন।**

কারণ পরোপকারিতা অবশ্যই নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য এবং ন্যায়বিচার না থাকলে নৈতিকতার কোনো অর্থ থাকে না। সুতরাং, P1 সত্য।

- **P2: অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ স্রষ্টার নৈতিক গুণ স্বীকার করে কিন্তু জগতে স্রষ্টার হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে।**

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী P2 সত্য।

- **P3: স্রষ্টা যদি জগতে হস্তক্ষেপ না করে তবে তার নৈতিকতা স্রষ্টার নৈতিক গুণ তার জগতে অ-সম্পৃক্ততার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।**

P3 এই আর্গুমেন্টের মূল পয়েন্ট। আমাদের যুক্তি হলো, যদি একজন সর্বোচ্চ নৈতিক স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জগতে হস্তক্ষেপ না করেন,বা তাতে সম্পৃক্ত না থাকেন, তবে তা তাঁর নৈতিক গুণাবলির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে অসংগত। এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে আমরা বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে পারি।

মনে করুন, আপনার বন্ধু সামিন পাঁচ বছর আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে। এখন যদি সামিন কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই হঠাৎ তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেন, তাহলে কি আমরা তাঁকে একজন আদর্শ স্বামী বা দায়িত্ববান পিতা বলতে পারি? একইভাবে, এক মেষপালকের কথা ভাবুন। প্রতিদিন তিনি তাঁর মেষপাল নিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী ঘাসভরা মাঠে যান। তিনি জানেন, মাঠের পাশের জঙ্গলে ভয়ানক নেকড়ের দল ওত পেতে রয়েছে। যদি তিনি এমন পরিস্থিতিতে মেষগুলো ফেলে চলে যান, তাহলে কি তাঁকে আমরা একজন দায়িত্বশীল ও বুদ্ধিমান মেষপালক বলবো?

আরেকটি উদাহরণ ধরুন, একজন পুলিশ অফিসার রাস্তার মাঝখানে একজন অসহায় ব্যক্তিকে ছিনতাইয়ের শিকার হতে দেখছেন, কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ করছেন না। এমন আচরণের জন্য আমরা কি তাঁকে একজন আদর্শ, দায়িত্বশীল বা নৈতিক পুলিশ অফিসার বলতে পারি? এমনকি, একজন শিক্ষকও যদি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের

শিক্ষাদান করার পরিবর্তে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তাঁকে কি আমরা একজন দায়িত্ববান, নৈতিক বা আদর্শ শিক্ষক বলতে পারি?

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি উদাহরণে, আমরা দেখতে পাই যে, দায়িত্ব এবং নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক। যদি এই দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা দেখা দেয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাহলে, একজন স্রষ্টা যিনি তাঁর সৃষ্ট সংবেদনশীল প্রাণীদের প্রতি উদাসীন এবং বেখেয়াল, তাঁকে কি নৈতিক, দায়িত্ববান বা সর্বজ্ঞ বলা যায়? একজন পিতা বা স্বামী, যিনি তার পরিবারের সদস্যদের পরিত্যাগ করে অহেতুক কষ্ট দিচ্ছেন, কিংবা এক মেষপালক, যিনি তার মেষপালকে নেকড়ের মুখে ফেলে রেখে চলে যান, অথবা একজন পুলিশ অফিসার, যিনি অন্যায় দেখতে পেয়েও নীরব থাকেন, এবং এমন একজন শিক্ষক, যিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না; তাদের এসব কাজকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক, অনৈতিক, নির্বুদ্ধিতা এবং দায়িত্বহীনতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করি।

যদি আমরা একজন পিতাকে আদর্শ পিতা, একজন মেষপালককে দায়িত্বশীল মেষপালক বা একজন শিক্ষককে নৈতিক শিক্ষক বলতে অস্বীকৃতি জানাই, তবে একজন উদাসীন স্রষ্টার নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে কি? এ ধরনের আচরণ যদি আমরা একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও মেনে নিতে না পারি, তাহলে এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো যদি স্রষ্টার ওপর আরোপ করা হয়, তবে সেই স্রষ্টাকে আমরা আর নিখুঁত, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান বা নৈতিক বলতে পারি না। একজন স্রষ্টার ধারণা এমন হওয়া উচিত যিনি নিখুঁত, প্রজ্ঞাবান এবং সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলির অধিকারী। কিন্তু এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো কোনোভাবেই একজন স্রষ্টার প্রকৃতি বা গুণাবলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না। স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সেই উচ্চতায়ই থাকতে হবে, যা তাঁকে প্রকৃত অর্থে নিখুঁত এবং সর্বোৎকৃষ্ট সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

এটি স্পষ্ট যে, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে স্রষ্টা শুধু মানবজাতিকে উপেক্ষা করেন না, বরং মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক–নীতি-নৈতিকতা, আশার বাণী এবং ন্যায়বিচারের প্রতিও উদাসীন। এমন একটি স্রষ্টার ধারণা, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেও এর প্রতি আর কোনো নজর দেন না, মানবজাতির প্রতি উদাসীন এবং বেখেয়াল থাকেন, একেবারেই যুক্তিসংগত নয়।

পৃথিবীর বাস্তবতায় প্রতিনিয়ত এমন অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে মানুষ অন্যায়, অত্যাচার এবং শোষণের শিকার হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, অনেক মানুষ তার পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ড নিজ চোখে দেখেছে, অথচ প্রতিবাদ করার সামর্থ্য তার ছিল না। ক্ষমতার জোরে এসব হত্যাকারী পৃথিবীতে শাস্তি এড়িয়েছে। অত্যাচারী শাসকেরা, যারা জনগণের ওপর নিষ্ঠুর শাসনের স্টিম রোলার চালিয়েছেন, ক্ষমতার জোরে দুনিয়ার আদালতে বিচারহীন থেকে গেছেন। এমনকি অপরাধী গ্যাংস্টাররা অর্থের বিনিময়ে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে এবং মৃত্যুর আগে তাদের বিচার প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের মতে, স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার পর আর এখানে হস্তক্ষেপ করেন না, এমনকি কোনো নৈতিক দিকনির্দেশনাও দেননি। এই মতবাদে পরকাল বলে কিছু থাকে না। কারণ, কোনো নৈতিক নিয়ম বা দিকনির্দেশনা যদি না

থাকে, তবে কীসের ভিত্তিতে পরকালে বিচার হবে? পরকাল বলতে কিছু না থাকলে, এই পৃথিবীতে যারা অন্যায় ও অত্যাচার করেও পার পেয়ে গেছে, তাদের বিচার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার, যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তারা যে পরকালে সুবিচার পাবে, সে আশা-ভরসারও কোনো বাস্তবতা নেই।

ফলে, এই মতবাদ অনুযায়ী, পৃথিবীর জীবনের ন্যায়বিচারের আশা আসলে শূন্য। এটি স্রষ্টার নিখুঁত নৈতিক গুণাবলির বিপরীত। একজন নিখুঁত ও ন্যায্য স্রষ্টার সৃষ্টিতে এমন অসমতা ও ন্যায্যতার অভাব কোনোভাবেই সংগতিপূর্ণ হতে পারে না। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, প্রকৃতপক্ষে, একটি বৈপরীত্যপূর্ণ ধারণা, যা স্রষ্টার পূর্ণতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক।

- **Conclusion: সুতরাং, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক।**

সুতরাং, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ যে স্রষ্টার ধারণা উপস্থাপন করে, তা স্রষ্টার নিখুঁত বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিকতার সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। এই মতবাদ স্রষ্টার প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার এবং নৈতিক গুণাবলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ একটি অযৌক্তিক এবং অসংগত মতবাদ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

স্রষ্টা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা

নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নটি গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা কি সত্যিই অস্তিত্বশীল? এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর ৯৯% মানুষ হয়তো দৃঢ়ভাবে বলবে, "হ্যাঁ, আমরা অস্তিত্বে আছি।" কিন্তু বাকি ১% হয়তো বলবে, "না, যেটিকে আমরা বাস্তব মনে করি, তা নিছক স্বপ্নের মায়াজাল ছাড়া আর কিছুই নয়।" যদি ধরে নিই, আমরা সত্যিই অস্তিত্বশীল, তাহলে আমাদের নৈতিকতার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে, যদি আমরা অস্তিত্বশীল না হই, তবে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এখন যদি মেনে নিই যে, আমাদের অস্তিত্ব আছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে–এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? আমাদের জীবনের কোনো তাৎপর্য রয়েছে, নাকি তা একেবারেই অর্থহীন? যদি এই জীবন নিছক খেলনার পুতুলের মতো হয়–যার কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো অর্থ নেই–তাহলে নৈতিকতারও কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। কিন্তু যদি জীবনের কোনো অর্থ বা লক্ষ্য থাকে, তাহলে নৈতিকতার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমাদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে: নৈতিকতা কী? এবং এর প্রকৃত উৎস কোথায়?

নৈতিকতা হলো, সঠিক, ভুল বা ভাল, এবং খারাপ আচরণের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কিত নীতি।[১৩১] নৈতিকতার উৎস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সামনে আসে; ব্যক্তিনিরপেক্ষ (Objective) নৈতিকতা এবং আপেক্ষিক (Subjective) নৈতিকতা।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা বলতে বোঝানো হয় এমন নৈতিক আদর্শ যা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, বা বোধ-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয়। এটি একটি নিরপেক্ষ মানদণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সর্বজনীন এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। এর ভিত্তি থাকে ব্যক্তিগত মতামত বা সামাজিক প্রভাবের উর্ধ্বে। অন্যদিকে, আপেক্ষিক নৈতিকতা হলো এমন নৈতিক আদর্শ যা ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মতামত, সাংস্কৃতিক রীতি বা সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল। এটি পরিবর্তনশীল এবং প্রেক্ষাপট-নির্ভর, যা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্ন হতে পারে।

নৈতিকতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নাকি আপেক্ষিক?

নাস্তিকতা যেহেতু ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতাকে মেনে নিতে চায় না, তাই অনেক নাস্তিক মনে করে যে নৈতিকতা মূলত আপেক্ষিক। অর্থাৎ, ব্যক্তি বা সমাজের মানুষ নিজেরাই তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করবে।

আমেরিকান নাস্তিকদের প্রেসিডেন্ট ডেভিড সিলভারম্যান বলেন, "ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। নৈতিকতা হলো আপেক্ষিক"।[১৩২] অর্থাৎ, এখানে নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ভর করবে একেবারেই ব্যক্তির উপর। ধর্ষণ, হত্যা, বা যে কোনো কাজ নৈতিকভাবে সঠিক না ভুল–এটি নির্ধারণ করবে শুধু সেই ব্যক্তি নিজে। এ অবস্থায় আপনি কোনো কাজকে নীতি -

---

[১৩১] Definitions from Oxford Languages
[১৩২] Frank Turek; Stealing from God Why Atheists Need God to Make Their Case; Chapter-4

গতভাবে ভুল বলতে পারবেন না। যেমন, ধর্ষণ কারো কাছে ভুল মনে হলেও, যে ব্যক্তি এই কাজটি করেছে, তার কাছে সেটি হয়তো ভুল নয়। কারণ, যখন ভালো-মন্দের মানদণ্ড সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর হয়ে যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন হয়ে যায়। এভাবে নৈতিকতার চূড়ান্ত মানদণ্ড বিলীন হয়ে পড়ে।

নৈতিকতা যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে ভালো-মন্দ, সঠিক-ভুলের ধারণাগুলোর আর কোনো সার্বজনীন ভিত্তি থাকে না। একজনের কাছে যা ভালো, অন্যের কাছে তা খারাপ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে 'চূড়ান্ত ভালো' বা 'চূড়ান্ত মন্দ' বলে আসলে কিছুই থাকবে না। আপেক্ষিক নৈতিকতার ফলে সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলতাও ভেঙে পড়তে পারে। ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, কিংবা হত্যার মতো অপরাধগুলো নৈতিক-অনৈতিকের বিচার ছাড়াই শুধু মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তখন এ সমাজে আর কোনো সার্বজনীন নীতি থাকবে না, আর নৈতিকতার প্রকৃত অর্থও হারিয়ে যাবে।

যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম অনুসারে, কোনো কিছু একসঙ্গে বা একই সময়ে দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থায় থাকতে পারে না। যেমন, 'ক' সর্বদা 'ক'-ই থাকবে; এটি কখনোই 'খ' হবে না এবং 'ক'-এর মধ্যে 'ক' না হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও থাকতে পারে না। একইভাবে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাজ একই সময়ে এবং একই পরিস্থিতিতে ভালো এবং খারাপ–উভয়ই হতে পারে না। আপেক্ষিক নৈতিকতার মূল ধারণা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমাজ তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, বোধ-বিবেচনার ভিত্তিতে নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট কাজ বা ঘটনাকে কেউ ভালো মনে করতে পারে, আবার অন্য কেউ তা খারাপ বলে বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যার আলোকে, কোনো কাজ বা ঘটনা একই সময়ে, একই পরিস্থিতিতে ভালো এবং খারাপ হতে পারে না। তাহলে, কোনো কাজ বা ঘটনাকে ভালো বা খারাপ বলে সিদ্ধান্ত দিতে হলে আমাদের অবশ্যই একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ড প্রয়োজন। এই মানদণ্ড হতে হবে এমন, যা ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তা-চেতনা বা বোধ-বিবেচনার ঊর্ধ্বে। এটি কেবল তখনই কার্যকর হবে, যখন তা সার্বজনীন এবং নিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

একটি কল্পিত দৃশ্যপট বিবেচনা করুন: 'ক' নামক একটি রাষ্ট্র যেখানে নৈতিকতার ভিত্তি আপেক্ষিক। এই সমাজের ৫০% মানুষ বিশ্বাস করে চুরি করা নৈতিক, অন্যদিকে বাকি ৫০% মনে করে এটি অনৈতিক। এখন প্রশ্ন হলো, যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মানদণ্ড অনুপস্থিত থাকে, তবে কীভাবে আমরা নিশ্চিত করব যে, চুরি করা সত্যিই নৈতিক বা অনৈতিক? এই পরিস্থিতি স্পষ্ট করে যে, আপেক্ষিক নৈতিকতা সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, ভালো-খারাপের প্রকৃত এবং চূড়ান্ত নির্ধারণ তখনই সম্ভব, যখন একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই মানদণ্ড হতে হবে এমন, যা ব্যক্তিগত মতামত ও সামাজিক প্রবণতার ঊর্ধ্বে এবং সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য।

অনেক নাস্তিক হয়তো দাবি করবে, "আমরা আমাদের কাজের জন্য সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই আমার কাছে কোনো কাজ নৈতিক মনে হলেও, যদি সমাজ সেটিকে মেনে না নেয়, তাহলে আমি সেই কাজ করতে পারি না।" এই অবস্থানকে

গভীরভাবে বিবেচনা করলে কিছু মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে। প্রথমত, যদি আমরা নাস্তিকের কাছে প্রশ্ন করি, "কোন সমাজের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ?"–তাদের উত্তর সম্ভবত হবে, "যে সমাজে আমরা বসবাস করি।" এখন ধরে নিই, আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি, যেখানে হত্যা এবং ধর্ষণকে নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আপেক্ষিক নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যদি কোন সমাজের মানুষের কাছে হত্যা এবং ধর্ষণকে অনৈতিক বলতে পারি না। এখানে ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করবে কোনটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক। উদাহরণস্বরূপ, হিটলারের জার্মানিতে, ৬ মিলিয়ন ইহুদি হত্যাকে সেখানকার সমাজের একটি বড় অংশ নৈতিক বলে মেনে নিয়েছিল। তাহলে, আপেক্ষিক নৈতিকতার ভিত্তিতে, সেই গণহত্যাকে আপনি কখনোই অনৈতিক বলতে পারবেন না।

এখানেই আপেক্ষিক নৈতিকতার গুরুতর সমস্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপেক্ষিক নৈতিকতা অনুযায়ী, একই কাজ একই সময়ে এবং একই সাথে নৈতিক এবং অনৈতিক হতে পারে। অথচ যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম হলো; কোনো বিষয় একই সময়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থাকতে পারে না। অর্থাৎ, হত্যা বা ধর্ষণ–এই কাজগুলো হয় সম্পূর্ণ ভালো হবে, নয়তো সম্পূর্ণ খারাপ। কিন্তু আপেক্ষিক নৈতিকতার ভিত্তিতে এ ধরনের একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এর ফলে নৈতিকতার ধারণা বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এটি দেখায় যে, প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মানদণ্ডের অভাবেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা নৈতিকতার একটি সুসংহত এবং সর্বজনীন কাঠামো গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

আমরা তখনই হিটলার বা যে কারো কাজকে অনৈতিক বলতে পারবো যখন নৈতিকতা হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। যদি একটা সমাজের মানুষ মনে করে শিশুদের ধর্ষণ করা নৈতিক/অনৈতিক, আপেক্ষিক নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা কোনোভাবেই এই কাজকে নিন্দা/সমর্থন করতে পারি না। তবুও আমরা যদি এর নিন্দা/সমর্থন করি, তবে তা হবে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত মতামত।

কিছু নাস্তিক হয়তো বলবে, "যদি আমরা গণহত্যা, ধর্ষণ, কিংবা অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমরা সমাজে টিকে থাকতে পারবো না। রাষ্ট্র আমাদের শাস্তি দেবে। তাই আমাদের এ কাজগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।" তবে এই যুক্তি বাস্তবতার নিরিখে টিকে থাকে না। কারণ, ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে বহু অপরাধী তাদের কর্মের জন্য জীবদ্দশায় কোনো শাস্তির মুখোমুখি হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, জোসেফ স্টালিন, অ্যাডলফ হিটলার এবং মাও সেতুং–এমন কিছু নাম যারা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। তবুও, এই দুনিয়ায় তাদের কেউই ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হয়নি। এখানেই শেষ নয়। ইতিহাসে আমরা এমন অসংখ্য অত্যাচারী শাসকের গল্প পাই, যারা ক্ষমতার দাপটে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে। তবুও তারা তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পায়নি। কল্পনা করুন এমন একটি দৃশ্য যেখানে একজন ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় এবং তারপর আত্মহত্যা করে। বা এমন কোনো অপরাধী, যে অপরাধ করে আদালতের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই স্বাভাবিকভাবে মারা যায়। এই ধরনের মানুষরা কোনোভাবেই শাস্তির আওতায় আসেনি। তাদের জন্য সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কোনো কার্যকর শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। সুতরাং, যদি কেউ দাবি করে, "অপরাধ করলে রাষ্ট্র আমাদের শাস্তি দেবে এবং সে কারণেই আমাদের অন্যায়

পরিহার করা উচিত," তাহলে সেই দাবি পুরোপুরি সঠিক নয়। ইতিহাসে এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যেখানে অপরাধীরা তাদের দুষ্কর্মের পরও অনায়াসে বেঁচে গেছে। তাই নৈতিকতার প্রশ্নে শাস্তির ভয়ই যদি একমাত্র নির্ধারক হয়, তবে তা যথেষ্ট নয় এবং নৈতিকতার কোনো চূড়ান্ত বা সর্বজনীন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে না।

আইন প্রণয়ন করে মানুষকে নৈতিকতার পথে আনা কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের সমাজে কঠোর আইন এবং দণ্ডবিধি থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত ঘটে হত্যা, লুট, রাহাজানি এবং ব্যভিচারের মতো নৃশংস অপরাধ। মানুষ নানা কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে এই অপকর্মগুলো করে চলেছে। এমনকি অর্থের বিনিময়ে আইনকে কিনে নিয়ে অপরাধীরা আদালতের শিকল থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ফলে, নিপীড়িত ও নির্যাতিতরা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে সমাজে অবাধে চলাফেরা করে। এই বাস্তবতা আমাদেরকে এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তা হলো, নৈতিকতা কখনোই সমাজের মানুষের বোধ-বিবেচনা, আবেগ বা অনুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী, কোনো সমাজের মানুষ কখনো একত্রে বসে তাদের নৈতিকতার ভিত্তি নির্ধারণ করেনি। মানবজাতির ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যেখানে একমত হয়ে সবাই মিলে নৈতিকতার মানদণ্ড স্থাপন করেছে। সুতরাং, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে নৈতিকতা, যদি তা সঠিক ও কার্যকরী হতে হয়, তবে তা অবশ্যই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হতে হবে। এটি হতে হবে এমন এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ব্যক্তির সীমাবদ্ধ চিন্তা বা আবেগের উর্ধ্বে, যা সর্বজনীন এবং চিরস্থায়ী। এই ধরনের নৈতিকতা ছাড়া সমাজে প্রকৃত সুবিচার বা শৃঙ্খলা কখনোই সম্ভব নয়।

আমি বিশ্বাস করি, যদি কোনো নাস্তিকের বিবেক কখনো গভীরভাবে জাগ্রত হয়, এবং তারা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে যে মানুষকে হত্যা করা কিংবা কাউকে ধর্ষণ করা কোনোভাবেই ন্যায্য বা বৈধ হতে পারে না–তাহলে তারা এমন একটি নৈতিক মানদণ্ডের অনুসন্ধান করবে যা হবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন।

একটি নৈতিক মানদণ্ড যা কোনো ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। এটি এমন একটি মানদণ্ড, যা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য নির্ধারণ করে। এই ধরনের নৈতিক মানদণ্ড কেবল এমন একজন সত্তা থেকেই আসতে পারে, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। স্রষ্টার দেয়া নৈতিক বিধানই একমাত্র আমাদের সেই আলোকিত পথ দেখাতে সক্ষম, যেখানে কোনো হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, বা অপকর্ম চিরতরে ন্যায্যতা হারায়। এই বিধানই মানুষের জন্য শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার, এবং প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। তাই, একজন নাস্তিক যদি সত্যের গভীরে পৌঁছাতে চান, তবে তাকে অবশ্যই এমন এক চিরস্থায়ী ও সর্বজনীন নৈতিক ভিত্তি খুঁজে নিতে হবে, যা স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতাকে স্বীকৃতি দেয়।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার জন্য স্রষ্টার অস্তিত্ব এক অপরিহার্য শর্ত। কেননা, নৈতিকতা কোনো বস্তুগত পদার্থ নয়, যা অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত। সততা, ন্যায়বিচার, বা নৈতিক মূল্যবোধের পরিমাপ কোনো রাসায়নিক সূত্রে নির্ধারণ করা যায় না। সততার মধ্যে কতগুলো কার্বন পরমাণু রয়েছে বা ন্যায়বিচারের ওজন কত, এ ধরনের প্রশ্ন অর্থহীন। কারণ, নৈতিকতা পদার্থবিদ্যার প্রাঙ্গণে পড়ে না; এটি মূলত নৈতিক চেতনার এক সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং সঠিক ও ভুলের নির্ভুল পার্থক্য নির্ধারণের জন্য, একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক ভিত্তি প্রয়োজন। আর এ ধরনের নৈতিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে এমন কেউ হতে হবে যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, সার্বভৌম। কারণ, মানুষ স্বভাবত সীমাব এবং একজন মানুষের পক্ষ থেকে অন্য মানুষের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আরোপের ক্ষমতা নেই। স্রষ্টা ব্যতিরেকে নৈতিকতা নেমে যাবে কেবল সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির স্তরে। এর ফলে, নৈতিকতা আর সার্বজনীন বা চিরন্তন থাকবে না; বরং এটি আপেক্ষিক হয়ে যাবে। এটি একটি সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু অন্য সমাজে নয়।

অধ্যাপক ইয়ান মার্খাম এর মতে, "আমাদের জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় কর্তব্যবোধকে ব্যাখ্যা করেন ঈশ্বর। নৈতিক দাবির সর্বজনীন প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা তিনিই করতে পারেন এবং তিনিই কেবল সর্বজনীন আদেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনিই একমাত্র জীবন-জীবিকার ঊর্ধ্বে"।[১৩৩]

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সবচেয়ে ভালো (আল-বার- সকল ভালোর উৎস), সবচেয়ে জ্ঞানী (আল-হাকিম)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালা বলনে, "নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না"।[১৩৪]

কাজেই, কোনো কাজ খারাপ হওয়া কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এটি খারাপ, কারণ তা আল্লাহর নির্ধারিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মানদণ্ডের বিপরীত। এই কাজকে গোটা পৃথিবীর মানুষ নিন্দনীয় বলছে বলেই তা খারাপ হয়ে যায় না। আবার, যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ ভালো মনে করে বা পৃথিবীর সবাই একমত হয় যে এটি ভালো, তবুও তা কখনো ভালো হতে পারে না। মূলত, কোনো কাজের ভালো-মন্দ নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মানদণ্ডের ওপর। সেই সুমহান বিধানই ঠিক করে দেয় শিশুকে ধর্ষণের মতো কাজ কেন জঘন্য ও নিন্দনীয়।

নাস্তিকতায় নৈতিকতার অস্তিত্ব নেই

কর্মব্যস্ত দিনের শেষে, ক্লান্ত শরীরে যখন ঘরে ফিরলেন, এক অসীম শূন্যতা গ্রাস করলো আপনাকে। দিশা, আপনার ছোট্ট দিশা, কোথাও নেই। ডাকলেন, বারবার ডাকলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। দিশেহারা হয়ে খোঁজাখুঁজি চললো, প্রতিটা কোণ তন্নতন্ন করে দেখলেন, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না। অবশেষে, ভারী হৃদয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন। অপহরণের আতঙ্ক, এক হিমশীতল ভয় যেন রক্তে মিশে গিয়েছিল। পুলিশ, প্রতিবেশী, সবাই মিলে দিশাকে খুঁজতে লাগলেন। সময় যেন থমকে গিয়েছিল, প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তকাল মনে হচ্ছিল। কয়েক ঘণ্টা পর, এক দুঃসংবাদ যেন বজ্রপাতের মতো নেমে এলো। আপনার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে, কিছু নরপশুর আবাসস্থলে পাওয়া গেল আপনার কলিজার টুকরা দিশার রক্তাক্ত, নিথর দেহ। পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে এলো এক বীভৎস সত্য, চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর... তারপর যা ঘটেছে,

---

[১৩৩] Hamza Tzortzis;The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; page: 147-148
[১৩৪] সূরাঃ আল-আরাফ; ৭:২৮

তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। পশুর মতো তারা ধর্ষণ করেছে আপনার নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে। তাদের ভয় ছিল, দিশা হয়তো সব বলে দেবে, আর সেই ভয়েই তারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা, এমন যেকোনো ঘটনাই আমাদের প্রত্যেকের কাছেই ঘৃণ্য, অপরাধমূলক। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিবর্তনবাদী নাস্তিকদের দৃষ্টিতে এমন ঘটনা নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ দিশাকে ধর্ষণের পর হত্যার ব্যাপারটি নাস্তিক্যবাদী দর্শনে কেবলই একটি প্রাকৃতিক কারণ বা মস্তিষ্কে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। একটু ভাবুন, দিশার হত্যাকারীরা যদি কোনো শাস্তি না পেয়েই মারা যায়? এই পৃথিবীতে এমন অসংখ্য ধর্ষক, হত্যাকারী আছে যারা তাদের কৃতকর্মের কোনো প্রায়শ্চিত্ত না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। যদি সত্যিই কোনো স্রষ্টা না থাকেন, যদি পরকাল বলে কিছু না থাকে, তাহলে এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত ন্যায়বিচার বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ন্যায়বিচার না থাকলে, অন্যায় বলেও কিছু থাকে না। ভালো যদি না থাকে, তাহলে খারাপের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। স্রষ্টা যদি না থাকেন, তাহলে ভালো-খারাপের সংজ্ঞা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হবে, কারণ স্রষ্টা ব্যতিরেকে কোনো নিরপেক্ষ নৈতিকতা থাকতে পারে না।

বর্তমানে আলোচিত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমাদের নৈতিকতাবোধ একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলাফল"।[১৩৫] সুতরাং, নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্সের মতে, ধর্ষণ করা খারাপ কিছু না, এবং এটা নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার উপরে। আপনি যদি মনে করেন ধর্ষণ করা খারাপ তাহলেই ধর্ষণ খারাপ, আপনি যদি মনে করেন ধর্ষণ করা ভালো তাহলে ধর্ষণ ভালো।

নাস্তিক্যবাদ অনুযায়ী আমাদের সকল চিন্তা এবং আচরণ হচ্ছে অন্ধকার শক্তির ফলাফল। এগুলোতে আমাদের কোনো হাত নেই। এগুলো যেভাবে হওয়ার সেভাবেই হচ্ছে। ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার কোনো অস্তিত্ব নেই। নাস্তিক প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স বলেন, "অন্ধশক্তি এবং জেনেটিক প্রতিলিপির এই মহাবিশ্বে কিছু মানুষ আঘাত পাচ্ছে আবার কিছু মানুষ ভাগ্যবান হচ্ছে। এবং এটির কোন ছন্দ বা কারণ নেই, কোন ন্যায়বিচারও নেই।..... ডিএনএ জানে না বা পরোয়া করে না। ডিএনএ শুধু আছে, এবং আমরা তার সঙ্গীতে নাচি"।[১৩৬]

অর্থাৎ, বিবর্তনবাদ বা নাস্তিক্যবাদ অনুযায়ী, আমাদের প্রতিটি কাজই প্রাকৃতিক কারণ এবং ডিএনএ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহলে এর অর্থ হলো আমরা সবাই কেবল জৈবিক রোবট। আমাদের কর্মগুলো, হোক তা ভালো বা মন্দ, কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলাফল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্ষণ, হত্যা কিংবা কোনো ধরনের অপরাধকে 'ভুল' বা 'সঠিক' বলার কোনো ভিত্তি থাকে না। আপনার মেয়ে দিশার মর্মান্তিক পরিণতি বিবেচনা করুন। যদি নাস্তিক্যবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্যি হয়, তাহলে ধর্ষক ও হত্যাকারীর কাজকে নৈতিকভাবে অন্যায় বলে নিন্দা করার অধিকারও আপনি হারাবেন। কারণ তাদের কাজ সম্পূর্ণরূপে ডিএনএ এবং পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত। এই দৃষ্টিকোণে, নৈতিকতা বলতে কোনো সার্বজনীন ধারণা নেই; সবই ব্যক্তিগত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। তাই, স্রষ্টার অনুপস্থিতিতে নৈতিকতারও কোনো সার্বজনীন ভিত্তি থাকতে পারে না।

---

[১৩৫] Frank Turek; Stealing from God Why Atheists Need God to Make Their Case; Chapter-4

[১৩৬] Frank Turek; Stealing from God Why Atheists Need God to Make Their Case; Chapter-4

বিজ্ঞান কী নৈতিকতা নির্ধারণ করতে পারে?

স্রোতের বিপরীতে গা ভাসিয়ে কিছু নাস্তিক আবার ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতাকে স্বীকার করে নেয়। বর্তমানে সবচাইতে জনপ্রিয় নাস্তিকদের একজন হলো স্যাম হ্যারিস। তিনি তার লিখিত; 'দ্যা মোরাল ল্যান্ডস্কেপ' বইতে উল্লেখ করেন,"ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা সচেতন প্রাণীদের মঙ্গলের সাথে সম্পর্কিত এবং বিজ্ঞান আমাদের সহযোগিতা করতে পারে কি সচেতন প্রাণীদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসে[১৩৭]

স্যাম হ্যারিসের অবস্থানের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো আমরা কোন পদ্ধতি দিয়ে নৈতিকতা আবিষ্কার করবো উৎস হিসেবে তিনি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আমরা যে পদ্ধতিতেই নৈতিকতার ধারণা আবিষ্কার করি না কেন, সেই পদ্ধতি কি নৈতিকতার উৎপত্তি বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে? এর উত্তর হলো–না। আমাদের প্রশ্ন হলো, প্রশ্ন হলো, কেন নৈতিকতা বিদ্যমান? এর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান মূলত একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের মহাবিশ্বের ঘটনা, প্রক্রিয়া এবং কাঠামো বিশ্লেষণ করি, পর্যবেক্ষণ করি এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্ব প্রণয়ন করি। বিজ্ঞান ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু তা কখনোই কোনো ঘটনা বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, বিজ্ঞান আমাদের নৈতিকতার রূপ উন্মোচনে সহায়তা করতে পারে, তবু এটি নৈতিকতার চূড়ান্ত উৎস হতে পারে না। কারণ এটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। বিজ্ঞান 'কেন' নয়, 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম।

ধরা যাক, একটি ছেলে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। বিজ্ঞান আমাদের জানাবে ছুরিটি কত গভীর প্রবেশ করেছে, কতখানি রক্তক্ষরণ হয়েছে, শরীরের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান কখনোই বলবে না, এই হত্যাকাণ্ড নৈতিকভাবে সঠিক নাকি ভুল। এখানেই প্রশ্ন উঠে–স্রষ্টা না থাকলে নৈতিকতা কেন বিদ্যমান?

অনেক নাস্তিক যুক্তি দেন, "আমরা নাস্তিক হয়েও নৈতিক কাজ করি। তাহলে কি 'নাস্তিকতায় নৈতিকতা নেই' এই দাবি ভুল হয়ে যায় না?" উত্তর হলো, নাস্তিকরা নৈতিক কাজ করলেও, তাদের নৈতিকতার উৎস নাস্তিকতা নয়। এটি ঠিক তেমন, যেমন এই বইটি আমি লিখেছি তা অস্বীকার করেও বইতে আমি কি লিখেছি তা আপনি জানতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি আমার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন তাহলে এই বইটি সম্পর্কে কখনোই জানতে পারতেন না। ঠিক তেমনই, নৈতিকতার উৎস স্রষ্টা, এটি অস্বীকার করেও নাস্তিকরা নৈতিক কাজ করতে পারে। তবে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে তারা কখনোই নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে না। যদি তা করার চেষ্টা করে, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা থেকে নৈতিকতা চুরি করছে। ঠিক যেভাবে আপনিও আমার লিখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারেন।

বিবর্তনবাদ দিয়ে কী নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

ধরুন, আমাদের এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। পরকাল, স্রষ্টা, এ সবই যদি কেবল মানুষের কল্পনার সৃষ্টি হয়, বাস্তব কোনো অস্তিত্ব না থাকে, এবং সবকিছু যদি নিছক বিবর্তনের ফসল হয়–তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমরা এত আয়োজন, এত কার্যাবলি কেন করছি? এর সরল উত্তর হতে পারে: টিকে থাকার জন্য। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা

[১৩৭] Frank Turek, Stealing from God Why Atheists Need God to Make Their Case, Chapter-4

এবং স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য। বিবর্তনের ভাষায়, এটিকে 'Survival of the Fittest' বলা হয় । যদি এই জীবন শুধুই টিকে থাকার লড়াই হয়, তবে যা কিছু আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সহায়ক, সেটাই ভালো; আর যা আমাদের টিকে থাকার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেটাই খারাপ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, চুরি, ছিনতাই, কিংবা ধর্ষণের মতো কাজগুলোও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যার পেটে ভাত নেই, তার জন্য চুরি করে খাওয়াই টিকে থাকার উপায়। যার হাতে অর্থ নেই, তার বেঁচে থাকার জন্য ছিনতাই করা প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য কেউ ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজও করতে পারে। এগুলো তখন খারাপ নয়, বরং টিকে থাকার তাগিদে 'প্রয়োজনীয়' বলে বিবেচিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদি টিকে থাকাই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ভালো-মন্দের সীমারেখা একেবারেই ব্যক্তির প্রয়োজনে নির্ধারিত হয়। নৈতিকতা এখানে আর কোনো সর্বজনীন আদর্শ নয়; এটি হয়ে দাঁড়ায় প্রয়োজনের অনুগামী, প্রয়োজনের দাস। এ কারণেই হয়তো দার্শনিক ফ্রেড্রিক নিৎসে বলেছেন, "প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা ও বাঁচার সংগ্রাম চলছে। এই বাঁচার সংগ্রামের পরিমাণ হচ্ছে- ক্ষমতা বিস্তারের অদম্য ইচ্ছা। তাই শোষক, শোষিত বা দাস, প্রভু এগুলো প্রকৃতিগত ব্যাপার। শোষণ করা প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আর দাস হওয়াটাও বাঁচার সংগ্রামে পরাজিত পক্ষের অনিবার্য ভাগ্য। পরাজিত পক্ষের দাসত্ব বরণ করা হলো- বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি।"[১৩৮]

আরেকটু ভাবুন! যদি এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন হয়, মৃত্যুর পর কোনো অস্তিত্ব না থাকে, কোনো জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে কেন আমি অন্যের সম্পদ লুট করে বিত্তশালী হবো না? মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে সুখান্বেষী! যদি এই জীবনটাই সব, তবে কেন আমি সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো? ধরা যাক, এই জীবন একটা সরল অঙ্কের মতো, যার শেষ ফলাফল কেবল শূন্য। তাহলে কেন আমি নিজের সম্পদ বিলিয়ে অন্যকে খুশি করবো? কেন আমি এই জীবনকে ত্যাগের মাধ্যমে পার করবো? বরং, কেন আমি নিজের আনন্দের জন্য যা ইচ্ছে তাই করবো না? কেন আমি ক্ষমতা অর্জন করে দুর্বলদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবো না? বিবর্তনবাদী দর্শন কি এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে? বরং, এই দর্শন আমাদের শেখায়–শক্তিমানেরাই টিকে থাকে, দুর্বলরা পরাজিত হয়। এখানে নৈতিকতা বলে কিছু নেই; আছে শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন। শক্তি আর ক্ষমতা যেখানে মুখ্য, সেখানে ভালো-মন্দের ধারণা কেবলই কল্পনা।

তাহলে কি দেখা যাচ্ছে না, এই জীবন যদি কেবল শূন্যে মিলে যায়, তবে ত্যাগ বা নৈতিকতার কোনো যুক্তি থাকে না? বরং, এই দর্শন আমাদের কানে ফিসফিস করে বলে, "নিজেকে টিকিয়ে রাখো, নিজের সুখের জন্য যা খুশি করো।" কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর কি সত্যিই আমাদের বিবেকের শূন্যতা পূরণ করতে পারে?

নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স ও স্যাম হ্যারিস হয়ত এই কারণে নৈতিকতার ক্ষেত্রে ডারউইনিজমের বিপক্ষে অবস্থান করে। ডকিন্স *ABC Radio National* এর একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "অতীতে বিবর্তনের উপর নৈতিকতার ভিত্তি করার চেষ্টা করেছে। আমি এমনটা করতে চাইনা। একজন বিবর্তনবাদীর নিকট যে ধরনের বিশ্ব তা 'survival of the fittest' (যোগ্যতমের বেঁচে থাকা) এর দিকে ফিরে যাচ্ছে

---

[১৩৮] মুক্তচিন্তা ও ইসলাম: মুজাক্কাজ নাঈম, পৃষ্ঠা নং-৯৬

এবং প্রকৃতি এখন দাঁত ও নখের আঘাতে রক্তে রঞ্জিত। ....ডারউইনবাদের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি তা আমার জন্য খারাপ রাজনীতি হবে, তা হবে অনৈতিক। এটিকে অন্যভাবে বললে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি একজন অনুরাগী ডারউইনিয়ান, যখন এটি বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আসে, তবে নৈতিকতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি একজন উৎসাহী ডারউইন বিরোধী।"[১৩৯]

নৈতিকতা এবং জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিসর। এই দুটি ধারণাকে এক করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে তা হবে ক্যাটাগরি মিস্টেক ফ্যালাসি। যারা নৈতিকতাকে জীববিজ্ঞানের বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান, তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখি; নৈতিকতার রাসায়নিক গঠন কেমন? নৈতিকতার স্বাদ বা গন্ধ কেমন? এগুলো কি আমরা অনুভব করতে পারি? নিশ্চয়ই না। কারণ, নৈতিকতা এমন এক বিমূর্ত ধারণা যা জৈবিক বাস্তবতার গণ্ডিতে ধরা পড়ে না। নৈতিকতা এবং জীববিজ্ঞান আলাদা ক্ষেত্র। আপনি কখনোই অবস্তুগত নৈতিকতাকে বস্তুগত জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। জেনেটিক কোড কি আদৌ আমাদের বলে দিতে পারে কী করা উচিত? অবশ্যই পারে না। তবুও, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে জীববিজ্ঞান দিয়ে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাহলে বড় এক সমস্যার মুখোমুখি হই, বিষয়টি আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ থাকে না।

যদি আমাদের নৈতিক আচরণ কেবল বিবর্তন প্রক্রিয়া, বা জৈবিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অথবা মস্তিষ্কে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল হয়, তবে আমাদের কর্মে আমাদের নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমাদের প্রতিটি আচরণ কেবল প্রাকৃতিক কারণের ফল। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, আমাদের প্রতিটি নৈতিক সিদ্ধান্তই মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল, তাহলে প্রশ্ন আসে; কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা 'সঠিক' বলব? কোনটিকে বলব 'ভুল'?

কেবল রাসায়নিক ক্রিয়া দিয়ে কি নৈতিকতার মান নির্ধারণ করা তবে একজন অপরাধী এবং একজন মহৎ ব্যক্তির কাজের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের কাজই কেবল তাদের মস্তিষ্কে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফসল। একজন ধর্ষক যখন ধর্ষণ করে, বা একজন দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে, উভয়টাই কেবল প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা আর কাউকে কোনো কাজের জন্য কৃতিত্ব দিতে পারি না, তেমনই দোষারোপও করতে পারি না। কারণ, তাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ তাদের নিজের হাতে নেই। সবকিছুই প্রাকৃতিক নির্বাচন রাসায়নিক বিক্রিয়ার নিয়মে ঘটে। তাহলে, যদি নৈতিকতা সত্যিই বিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ভালো-মন্দ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। স্রেফ প্রাকৃতিক নির্বাচনই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। কিন্তু আমরা কি সত্যিই এমন শূন্য, নিরাশ্রয় নৈতিকতায় নিজেরা বিশ্বাস রাখতে পারি?

ইউথিফ্রোর উভয় সংকট

নাস্তিক্যবাদের অনুসারীরা প্রায়ই ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার উৎস স্রষ্টা থেকে আসতে হবে, এই ধারণাকে খণ্ডনের জন্য একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি উত্থাপন করেন, যা 'ইউথিফ্রোর উভয় সংকট' নামে পরিচিত। এই আপত্তি দুটি বিকল্প সামনে তুলে ধরে: (ক) স্রষ্টার আদেশের কারণে কিছু ভালো হয়: এক্ষেত্রে বলা হয়, যদি স্রষ্টার

[১৩৯] The Descent of Man - The Moral Animal (full transcript) (abc.net.au)

আদেশই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে, তবে তা স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ, স্রষ্টা যেকোনো কিছু ভালো বা নৈতিক বলে ঘোষণা করতে পারেন, এমনকি তা যদি স্পষ্টতই খারাপও হয়। (খ) কোনো কাজ ভালো বলেই স্রষ্টা তা আদেশ করেন: এখানে প্রশ্ন তোলা হয়, যদি কোনো কাজ নৈতিক বলেই স্রষ্টা তা আদেশ করেন, তবে স্রষ্টা নিজেই একটি স্বাধীন নৈতিক নিয়মের অধীন হয়ে পড়েন। এর ফলে, তিনি আর সর্বোচ্চ এবং সর্বশক্তিমান সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না।

এই আপত্তিকে আসলে 'ইউথিফ্রোর সংকট' বলা যায় না। তবে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'একনায়কসুলভ বা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত' ধারণাটি নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। স্রষ্টা প্রকৃতিগতভাবে এমন এক সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বময় কর্তৃত্ববান, এবং নিখুঁত ন্যায়পরায়ণ। তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা তিনি জানেন কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। এমন একজন সত্তা যদি কোনো আদেশ প্রদান করেন, তবে তা 'স্বৈরাচারী' বা 'স্বেচ্ছাচারী' বলে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ, ভালো-মন্দ নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে, যিনি সৃষ্টির সত্তার ওপর পরম কর্তৃত্বের অধিকারী। স্রষ্টার প্রতিটি আদেশ ও নির্দেশে রয়েছে অপরিমেয় প্রজ্ঞা যা তাঁর ন্যায়পরায়ণ সত্তারই প্রতিফলন। কারণ তিনি কোনো ভুল করেন না, কোনো জুলুম করেন না। তাঁর নির্দেশনাগুলো স্রেফ ক্ষমতার অপব্যবহার নয়, বরং সর্বমঙ্গলের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, সীমিত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে এমন এক সর্বোচ্চ ও নিখুঁত সত্তার নির্দেশনাকে 'স্বেচ্ছাচারিতা' বলে খারিজ করা যে চরম অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, তা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার প্রয়োজন হয় না।

ইউথিফ্রোর উভয় সংকটে ফিরে আসা যাক। এই সংকটটি মূলত দুটি বিপরীতমুখী বিকল্প রয়েছে বলে দাবি করে। (ক) স্রষ্টা আদেশ করেছেন বলেই কিছু নৈতিক, বা (খ) কোনো কিছু নৈতিক বলেই স্রষ্টা তা আদেশ করেছেন। তবে এ দুই বিকল্পই প্রকৃত বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরে না, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় বিকল্পকে উপেক্ষা করে। নাস্তিকরা এখানে আগে থেকেই কোন প্রকার যুক্তি ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, কেবল মাত্র দুটি বিকল্পই রয়েছে। তৃতীয় বিকল্পটি হলো; আল্লাহ তা'আলা স্বভাবগতভাবে নৈতিক। তিনি নৈতিকতার কোনো বাহ্যিক মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল নন, কারণ আল্লাহ তা'আলা যদি অন্য কোনো মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল হন, তবে তিনি আর স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, এবং স্ব-নির্ভর থাকেন না। নৈতিকতা আল্লাহ'র গুণাবলির (সত্তার) বহিঃস্থ কিছু নয়। বরং নৈতিকতার শিকড় নিহিত রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত প্রকৃতিতে। আমরা যাকে নৈতিক আইন বলে জানি, তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ তা'আলা স্বভাবগতভাবে নৈতিক বলার অর্থ হচ্ছে, তিনি অনিবার্যভাবে এবং নির্ভুলভাবে কল্যাণময়, সহানুভূতিশীল, ন্যায়পরায়ণ। তাঁর প্রকৃতি এমন যে তিনি কখনো মন্দ করতে পারেন না। তাঁর আদেশ ও কর্ম সবসময়ই পরম কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং, ইউথিফ্রোর সংকটের এই তৃতীয় বিকল্পটি দেখায় যে নৈতিকতা ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং নৈতিকতার প্রকৃত উৎসই স্রষ্টার সত্তাগত প্রকৃতি। ইবনে তাইমিয়া বলেন, "যদি আমরা নিশ্চিত করি যে আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং স্বাধীন, তাহলে আমরা যৌক্তিকভাবে আল্লাহ তা'আলার

মঙ্গলকে অনুমান করতে পারি। মানুষ তার জ্ঞানের ঘাটতি ব্যতীত যা মন্দ তা কামনা করে না। সে হয়ত অজ্ঞতার কারণে মন্দ কামনা করতে পারে অথবা ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণে মন্দ কামনা করতে পারে। তিনি ভুলবশতও করতে পারেন, কারণ তিনি মনে করেন যে কাজটি ভাল, যদিও তা নয়। এইভাবে, সে তার সরল বা যৌগিক অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করে। আর আল্লাহ তা'আলা তা থেকে অনেক দূরে। এটা অসম্ভব যে সে কখনও খারাপ কাজ করে"।[১৪০]

আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা অসীম জ্ঞান ও নিখুঁত প্রজ্ঞার অধিকারী। তাঁর সত্তা এমন যে, কোনো কিছুতেই তিনি অজ্ঞ বা মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি কখনো অনৈতিক বা অযৌক্তিক কিছু করেন না, কারণ তা তাঁর সত্তার সাথে অসংগত। আল্লাহর নৈতিকতা বা যৌক্তিকতার মূল উৎস তাঁর নিজস্ব সত্তাগত প্রকৃতি। নৈতিকতার যে নিয়ম বা মানদণ্ড আমরা চিনি, তা তাঁর সত্তা থেকেই প্রবাহিত। এগুলো কোনো বাহ্যিক শর্ত বা মানদণ্ড নয়, বরং তাঁর সত্তাগত প্রকৃতির প্রতিফলন। ফলে, তিনি নৈতিক বা যৌক্তিক নিয়ম লঙ্ঘন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, কারণ তা তাঁর প্রকৃতির বিরোধিতা করবে। তাঁর সর্বশক্তিমত্তা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাঁকে সব ধরনের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত রাখে। স্রষ্টার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সর্বোচ্চ নৈতিকতার প্রতীক এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না"।[১৪১]

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র গঠন

একজন নৈতিক মানুষ হতে হলে অপরাধ দমনের চেয়ে অপরাধের মূলোৎপাটনই কাম্য হওয়া উচিত। মানুষের মধ্যে অপরাধের প্রবণতা প্রথমে জন্মায় তার মনের গহিন কোনে। আশপাশের কুরুচিপূর্ণ পরিবেশ, পাপাচারীদের সাহচর্য, অশ্লীল নাটক-সিনেমা, লোভ-লালসা, হিংসা ইত্যাদি মানুষের নৈতিকতা ধ্বংসের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত মনের মধ্যেই এই প্রবণতাগুলোর অংকুরে বিনষ্ট করে দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন খোদাভীতি এবং পরকালের প্রতি অবিচল বিশ্বাস।

খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলা ও তার মেয়ে বসবাস করতো। একদিন রাতে মহিলা দুধে কিছু পানি মিশিয়ে দেয়, বেশি দাম পাওয়ার জন্য। এটা দেখে মেয়েটা তার মাকে বললো- খলিফা দূর্নীতিকারীদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছেন! জবাবে মহিলাটি বললো, রাত্রী বেলায় কেউ দেখবেনা। মেয়েটা বললো- তারা আমাদের দুষ্কর্ম না দেখতে পারে, কিন্তু আল্লাহর চক্ষুকে কি তুমি ফাঁকি দিতে পারবে? কিয়ামতের মাঠে আমরা ধরা পড়ে যাবো। এ কথা শুনে মহিলা তার নিজের ভুল বুঝতে পারে।[১৪২]

এই দৃষ্টান্তে আমরা দেখতে পাই যে, যতক্ষণ মনে আল্লাহর ভয় ছিল না, ততক্ষণ মহিলাটি অপরাধ করেও অনুতপ্ত হয় নি। উল্টো, রাষ্ট্রীয় আইন ফাঁকি দিয়ে অপরাধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ই সেই মহিলাকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

---

[১৪০] Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page. 19

[১৪১] সূরা: আল-আরাফ; ৭:২৮

[১৪২] কানজুল উম্মাল; ১৪/২৫-২৬, তারিখে মাদিনাতুল দিমাশক; ৭০/২৫৩

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদ

আমাদের প্রজন্মের একটি বড় অংশ বিজ্ঞানবাদ বা সায়েন্টিজমে আক্রান্ত। এটি এমন একটি মানসিকতা যেখানে বিজ্ঞানকেই সর্বোচ্চ সত্য ও সমস্ত জ্ঞানের চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। নিঃসন্দেহে, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও সমাজকে আমূল পরিবর্তন করেছে, বদলে দিয়েছে পুরো দুনিয়াকে। মানুষের জীবন যাত্রায় বিজ্ঞান যে পরিবর্তন সাধন করেছ তা আর জ্ঞানের অন্য কোনো শাখা করতে পারেনি। তাই বিজ্ঞানের অসামান্য অবদান নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটি আমাদের জীবনযাত্রা, কাজ করার পদ্ধতি, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গিকেও বদলে দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সাফল্য অনেকের মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে। অনিচ্ছায় বা সচেতনভাবেই তারা বিজ্ঞানকে এক ধরনের 'ঈশ্বরের আসনে' বসিয়ে ফেলেছে। বিজ্ঞানকে মনে করা হচ্ছে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড, নির্ভুল এবং পবিত্র। এর প্রতিটি ফলাফলকে 'পুতঃপবিত্র মহান' হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানবাদী লেখক জাফর ইকবাল তার 'আরো একটু খানি বিজ্ঞান' বইয়ে এমনটাই দাবি করেছেন।[১৪৩] এটি এমন এক বিভ্রান্তি যা বিজ্ঞানের প্রকৃত সীমাবদ্ধতা এবং এর প্রেক্ষাপটকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

শুধু জাফর ইকবালের মতো লোকেরা নয়, বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "যা যা জ্ঞান অর্জন সম্ভব তা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারবে না তা কখনোই আমরা জানতে পারবো না।"[১৪৪]

বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা তারিফ করায় কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এটি পরম সত্যের একমাত্র মাধ্যম নয়। বিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি এবং কাঠামোর মধ্যেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সো-কল্ড নাস্তিকদের একটি বড় অংশ এসব সীমাবদ্ধতা গোপন করে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার বানিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের দাবি অনুযায়ী, স্রষ্টা, পরকাল, ফেরেশতা বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো কিছুতে আস্থা রাখা অযৌক্তিক। বরং, বিজ্ঞানকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই নাকি ঢের যৌক্তিক। এই জায়গাতেই প্রশ্ন ওঠে—তারা কি সত্যিই বিজ্ঞানকে যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করে, নাকি এটি নিছক অন্ধ বিশ্বাস?

আমার 'অন্ধ অনুসরণ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ রয়েছে। কথিত এই বিজ্ঞানপূজারিরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো যাচাই না করেই এগুলোকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বিশ্বাস করি আর্সেনিক মানুষের জন্য বিষাক্ত। কিন্তু আমাদের কয়জন এই বিষাক্ততা নিজ চোখে দেখেছি বা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেছি? আমরা প্রায় সবাই বিশ্বাস করি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। আবার, বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে যে মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণী থেকে উদ্ভূত। আমরা বিশ্বাস করি পানি অক্সিজেনের দ্বিগুণ হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে তৈরি। অথচ এ বিশ্বাসের ভিত্তি কতটুকু আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে?

---

[১৪৩] জাফর ইকবাল; আরো একটুখানি বিজ্ঞান; পৃষ্ঠাঃ ১৭

[১৪৪] Philosophy of Science: A very short introduction (Oxford University press,2nd edition) Page; 115

বাস্তবিক অর্থে আমরা বেশিরভাগই বিজ্ঞানীদের দাবিগুলো সরাসরি যাচাই না করেই মেনে নিয়েছি। এই অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে সায়েন্টিজম বা বিজ্ঞানবাদে আক্রান্ত লোকদের জন্য যারা মনে করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানেই সত্য হতে বাধ্য বা বিজ্ঞান মানেই পুতঃপবিত্র মহান!

বিজ্ঞান কী?

Scientia থেকে ইংরেজি Science শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ হলো জ্ঞান। সাধারণ মানুষের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বিজ্ঞান কী? তাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ বলে মনে হতে পারে। সে হয়ত বলবে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এবং জীববিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত হয় বিজ্ঞান। কিন্তু একজন দার্শনিকের কাছে যখন প্রশ্ন রাখা হবে যে, বিজ্ঞান কি? সে কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের মতো উত্তর দিবে না। তিনি হয়ত বলতে পারেন, ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য এবং তার গবেষণা ও তার ফলাফল দেওয়ার মানবীয় চেষ্টাই হলো বিজ্ঞান। অথবা বলতে পারে বিজ্ঞান হলো, যে জগতে আমরা বসবাস করি তা বুঝার, ব্যাখ্যা করার এবং বোঝানোর প্রচেষ্টা। অন্যদিকে, বিভিন্ন ধর্মও এই জগতকে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মকে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে গণ্য করা হয় না। একইভাবে ইতিহাসবিদরাও জগতে অতীতে কি ঘটেছে তা বুঝার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিহাসকে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বিজ্ঞানকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। ১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২.সামাজিক বিজ্ঞান। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং জীববিদ্যা, এগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং অর্থনীতির মতো বিষয়গুলো সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যদিও, সমাজবিজ্ঞানের মতো একটি বিষয় বৈজ্ঞানিক হতে পারে বা হওয়া উচিত কিনা তা সামাজিক বিজ্ঞানের দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

Cambridge dictionary তে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ভৌত জগতের গঠন এবং আচরণের যত্ন সহকারে অধ্যয়ন, বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, এবং এই ক্রিয়াকলাপের ফলাফলগুলি বর্ণনা করার জন্য তত্ত্বগুলির বিকাশ।[১৪৫]

বিজ্ঞান কি? এ সম্পর্কে ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস এর বিজ্ঞানীরা আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানে এটি সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছেন নাকি নেই- এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নিরপেক্ষ।[১৪৬]

গণিতবিদ ও বিজ্ঞান দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কারের চেষ্টা এবং এর ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানো.....পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়ম সম্বন্ধে"।[১৪৭]

নিউ মেক্সিকো ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ম্যানুয়েল মোলস বলেন,

---

[১৪৫] SCIENCE | English meaning - Cambridge Dictionary
[১৪৬] Teaching About Evolution and the Nature of Science. Page; 58.
[১৪৭] রাসেল, বি. (১৯৩৫) রিলিজিয়ন অ্যান্ড সায়েন্স। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা: ৮

"ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞান হল কিছু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়" ।[১৪৮]

তবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কও রয়েছে। ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জেমস লেডিম্যান বলেন, "আমাদের সামনে বিজ্ঞানের অজস্র উদাহরণ থাকলেও বিজ্ঞানকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় কিংবা কোন ধরনের বিতর্কমূলক কার্যক্রম বা বিশ্বাস কে বৈজ্ঞানিক বলা হবে তা আমরা জানি না।"[১৪৯]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বিজ্ঞান একটি পদ্ধতিগত অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মহাবিশ্বের গঠন এবং এর অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

বিজ্ঞানের দর্শন

বর্তমান যুগে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, পরিবহণ, এবং এমনকি পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। তবে, অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানকে প্রায়শই যৌক্তিক অনুসন্ধানের চূড়ান্ত মাধ্যম বা সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই আমাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে জানা, বোঝা, এবং চিন্তা করা প্রয়োজন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, 'কীভাবে আমরা কেবল বিশ্বাস বা মতামতের বিপরীতে জ্ঞান পেতে পারি?' এবং এর একটি খুব সাধারণ উত্তর হল, 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করুন'। উদাহরণস্বরূপ, খাবারে ফরমালিনের উপস্থিতি সম্পর্কে ধরা যাক। মানুষের মধ্যে কেউ হয়তো মনে করেন, সামান্য পরিমাণ ফরমালিন ক্ষতিকর নয়, আবার কেউ ভাবেন এটি মারাত্মক বিপজ্জনক। তবে, একটি দেশের সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কেবল সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণ করবে না। তারা পদক্ষেপ নেবে তখনই, যখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত হবে যে, কত পরিমাণ ফরমালিন মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ঠিক একইভাবে বৈজ্ঞানিক সকল মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়।

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো জ্ঞানতত্ত্ব যা জ্ঞান ও ন্যায্যতা (knowledge and justification) সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো; নিছক বিশ্বাসের বিপরীতে কীভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব? আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের কোনো জ্ঞান আছে? আমরা আসলে কতটুকু জানি এবং কী জানি?

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নানা রকম বিশ্বাস ধারণ করে। কিছু বিশ্বাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার কিছু মিথ্যার উপর। তবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন কিছু বিশ্বাস করেন যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা, তাহলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাকে জ্ঞানী বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ; কেউ বিশ্বাস করলেন যে বাংলাদেশের রাজধানী চট্টগ্রাম। এমন বিশ্বাস রাখা মানে স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের রাজধানী সম্পর্কে

---

[১৪৮] Ecology: Concepts and Applications. Page; 511.

[১৪৯] James Ladzman; Understanding Philosophy Of Science. Page: 4

তার সঠিক জ্ঞান নেই। এটি শুধু তার ভুল ধারণা বা মিথ্যা বিশ্বাস। যদি আমরা কোনো দাবি করি বা কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করি, তাহলে সেই দাবি বা প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের নির্ভুল জ্ঞান থাকা জরুরি। কেবল তখনই সেই দাবি সত্য বলে বিবেচিত হবে এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; জ্ঞান অর্জনের জন্য কি কেবল সত্য ও বিশ্বাস যথেষ্ট?

'জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ' অনুযায়ী, কোনো প্রস্তাবকে জ্ঞানে পরিণত করতে হলে চারটি বিষয় অপরিহার্য। ১. বিশ্বাস ২. ন্যায়সংগত ৩. সত্য। কিন্তু কেবল মাত্র ন্যায্য, সত্য, বিশ্বাস হলেই জ্ঞানে পরিণত হয় এই দাবিটি সমস্যা যুক্ত। তাই আমরা এর সাথে আরো একটি উপাদান যুক্ত করে নিয়েছি তা হলো 'ওয়ারেন্ট'। দর্শনের একটি শাখা, যা বিজ্ঞানের দর্শনের সাথে গভীরভাবে জড়িত, সেটিই হলো জ্ঞানতত্ত্ব। এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে আমরা জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎস, এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করি।

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির মধ্যে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? কীভাবে কোনো প্রমাণ একটি তত্ত্বকে সমর্থন করে? বিজ্ঞান কি চূড়ান্ত সত্যের ধারক? বিজ্ঞানে তত্ত্বের পরিবর্তন কী একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া? ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বিজ্ঞানের দর্শন আমাদের শেখায় যে, বিজ্ঞান কেবল একটি জ্ঞানচর্চার মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি অনবরত বিশ্লেষণ, সংশোধন, এবং নতুনতর সত্যের সন্ধানের ধারা। সুতরাং, বিজ্ঞানের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো; বিজ্ঞানের প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত ধারণাগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, ইত্যাদি। এভাবে বিজ্ঞানের দর্শন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত যুক্তি ও অনুমানের গভীরে প্রবেশ করে সত্য ও জ্ঞানের একটি সুগঠিত কাঠামো নির্মাণ করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিজ্ঞান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি প্রশ্নের জবাবই আরেকটি নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একটি সহজ দৃশ্যপট কল্পনা করুন। আতিকুর রহমান নামের এক বিজ্ঞানী আকাশের দিকে একটি বল ছুঁড়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন, ছোড়ার পর বলটি তার দিকে ফিরে আসে নাকি আকাশের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এভাবে তিনি বারবার বল ছুড়লেন এবং প্রতিবারই দেখলেন, বলটি তার দিকেই ফিরে আসছে। বারংবার একই ফলাফল পাওয়ার পর তিনি পরীক্ষা বন্ধ করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, যতবারই আকাশের দিকে বল ছোড়া হবে, ততবারই তা ফিরে আসবে। এই সিদ্ধান্ত হয়তো আপনার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু দর্শন ঠিক এখানেই প্রশ্ন তোলে, কেন আতিকুর রহমান এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন? ভবিষ্যতেও কি প্রতিবার একই ফলাফল পাওয়া যাবে? আমরা কীভাবে নিশ্চিত হবো যে, এই সিদ্ধান্ত সর্বদা সত্য? বিজ্ঞানের দর্শনের আসল কাজই হলো এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা। আতিকুর রহমান তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা বিশ্লেষণ করা। সেই পদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে তিনি যে অনুমানগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন, তাদের সঠিকতা ও যুক্তিসংগততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। এভাবেই বিজ্ঞানের দর্শন আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং যাচাইয়ের আওতায় আসে, তার গবেষণা ও ফলাফলই হলো বিজ্ঞান। যা কিছু ভৌত নয় বা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য নয়, তা নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মানবদেহ একটি ভৌত বস্তু। তাই বিজ্ঞান মানবদেহ নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে পারে। কিন্তু দেহের সৌন্দর্য–যা একেবারেই ভৌত নয় এবং পরিমাপের সীমার বাইরে, তা নিয়ে বিজ্ঞান কোনো কথা বলে না। সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য রয়েছে আলাদা শাস্ত্র, যার নাম নন্দনতত্ত্ব। একইভাবে, আমাদের মন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, স্রষ্টার অস্তিত্ব, আত্মা বা পরকাল এসব বিষয় বিষয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে না। কারণ, এগুলো পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের আওতার বাইরে। বিজ্ঞান প্রথমে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি হাইপোথিসিস (অনুমান) তৈরি করে। এরপর সেই হাইপোথিসিসকে নানা ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি তত্ত্ব বা থিওরিতে রূপান্তরিত করে। এই তত্ত্ব সর্বদা পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত থাকে, এবং যেকোনো সময় তা যাচাই কিংবা সংশোধন করা সম্ভব।

বিজ্ঞান বনাম ছদ্ম বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক থিওরির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এমন (Falsifiable) হতে হবে। বিংশ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী অস্ট্রিয়ান দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী কার্ল পপার এর মতে, একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এটি মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এমন (Falsifiable) হতে হবে।[১৫০]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মিথ্যাচারযোগ্যতাকে (মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এমন) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিথ্যাচারযোগ্যতার নিয়ম অনুসারে, একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান শুধু মাত্র তখনই বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যদি এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। এর মানে বৈজ্ঞানিক হাইপোথেসিস বা অনুমানকে অবশ্যই পরীক্ষা করা এবং ভুল প্রমাণ করতে সক্ষম হতে হবে।

একটি দৃশ্যপট কল্পনা করুন; নাদিয়া তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে যত রাজহাঁস দেখেছেন, প্রত্যেকটিই ছিল শুভ্র সাদা। তাই তিনি একটি অনুমান দাঁড় করালেন যে পৃথিবীর সমস্ত রাজহাঁসই সাদা রঙের। এই অনুমান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হলেও, তা নিঃসন্দেহে ভুল প্রমাণিত হতে পারে। নাদিয়ার এই অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য শুধুমাত্র একটি অ-সাদা রঙের রাজহাঁসই যথেষ্ট। একবার কোনো কালো, ধূসর, বা অন্য রঙের রাজহাঁস আবিষ্কৃত হলে তার অনুমানের ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এখানেই কার্ল পপারের দর্শন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পপারের মতে, কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সত্যিকারের বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে তা অবশ্যই মিথ্যাচারযোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ, তত্ত্বটি এমন হতে হবে যা প্রমাণ করার পাশাপাশি মিথ্যা প্রমাণ করাও সম্ভব। যদি একটি তত্ত্ব এমন হয়, যা কোনোভাবেই খণ্ডনযোগ্য নয়, তাহলে তা বিজ্ঞান নয়; বরং নিছক ছদ্মবিজ্ঞান।

---

[১৫০] Samin Okasha; Philosophy of Science: A Very Short Introduction; Page; 11

বৈজ্ঞানিক অনুমানের প্রকৃতি

কসমোলজিস্টরা আমাদের বলেন আমাদের মহাবিশ্ব সিংগুলারিটি থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বায়োলজিস্টরা আমাদের বলেন শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কখনোই সিঙ্গুলারিটিকে পর্যবেক্ষণ করেনি, মহাবিশ্ব দিন দিন বড় হচ্ছে এটাও কেউ দেখেনি, কেউ কখনও একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হতে দেখেনি। তাহলে বিজ্ঞানীরা কীভাবে এই সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছেছেন? উত্তর হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যুক্তি (Reasoning) বা অনুমান (Inference) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে বৈজ্ঞানিক অনুমানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে

ডিডাকশন এবং ইনডাকশন

ডিডাকশন অনুমান বা ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট বলতে বুঝানো হয়, যে অনুমানে আশ্রয়বাক্য গুলো সিদ্ধান্তের সত্যতার চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে যদি প্রেমিস গুলো সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য। যেমন,

- P: সকল মানুষ হয় মরণশীল।
- P: মিস্টার নাদরুন একজন মানুষ।
- C: সুতরাং, মিস্টার নাদরুন মরণশীল।

এখানে যদি প্রেমিসগুলো সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য।

অন্যদিকে, ইনডাক্টিভ আর্গুমেন্ট বলতে বুঝানো হয়, যে অনুমানে প্রেমিস গুলো সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে এক ধরনের সমর্থন দেয় তাকে ইন্ডাকক্টিভ আর্গুমেন্ট বলে। সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে প্রেমিস গুলো যে সমর্থন যোগায় তার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ইনডাক্টিভ অনুমান ভালো অনুমান বা মন্দ অনুমান হিসেবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রেমিসগুলো সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে যত বেশি সমর্থন দিবে ইনডাক্টিভ অনুমানের মূল্যও তত বেড়ে যাবে; সমর্থনের মাত্রা যত কমবে মূল্যও তত কমবে। এক্ষেত্রে ইনডাক্টিভ অনুমান ডিডাক্টিভ অনুমানের মতো নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। ইনডাক্টিভ অনুমানে সমসময় সম্ভাবতার দিকটাই নির্দেশ করে। যেমন,

- P: প্রেমা বাজার থেকে ১০টি পাউরুটি কিনেছে।
- P: প্রেমা বাসায় এসে ৮টা পাউরুটি খুলে দেখেছে সেগুলো খুব ভালো।
- P: সবগুলো পাউরুটিতে একই মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেওয়া।
- C: সুতরাং, বাকি পাউরুটি গুলোও ভালো।

এখানে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবগুলো পাউরুটি ভালো নাকি খারাপ তা দেখা হয়নি। অধিকাংশ পাউরুটি যেহেতু ভালো এবং সবগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এক থাকার কারণে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, বাকি পাউরুটিগুলো সম্ভবত ভালো। যদিও প্রথম ৮টি পাউরুটি ভালো ছিল এবং সবগুলো পাউরুটির মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ একই, তবুও এটা সম্ভব যে বাকি দুটো পাউরুটি আসলে ভালো নাও হতে পারে। সুতরাং, যৌক্তিকভাবে ইন্ডাক্টিভ অনুমানে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে। তবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইন্ডাক্টিভ অনুমানে অনেকাংশেই নির্ভর করি।

একটি দৃশ্যপট কল্পনা করুন। মিছবাউল হক প্রতিদিন বিকেলে তাদের স্কুলের মাঠে গিয়ে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলে। প্রতিদিন মাঠে যাওয়ার সময় তার মনে সন্দেহ থাকে–আজ তার বন্ধুরা আসবে তো? কিন্তু যেহেতু প্রতিদিনই তার বন্ধুরা উপস্থিত থাকে, তাই সে ধরে নেয় যে আজও তারা আসবে। এই অনুমান তার আগের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে করা। তবে যৌক্তিকভাবে এটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়, কারণ কোনো একদিন এমনও হতে পারে যে তার বন্ধুরা খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নেয়। মিছবাউল হকের এই অনুমান ইন্ডাক্টিভ, ডিডাক্টিভ নয়। ইন্ডাক্টিভ অনুমান অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তা চূড়ান্তভাবে অবশ্যম্ভাবী বা নির্ভুল নয়।

বিজ্ঞান কী ইন্ডাক্টিভ অনুমানের উপর নির্ভর করে?

উত্তর হলো, হ্যাঁ, বিজ্ঞান ইন্ডাক্টিভ অনুমানের উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল স্তম্ভ হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, এবং এই পরীক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তত্ত্ব। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রথম শর্ত হলো এটি পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণেরও তো কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। ধরা যাক, আপনি সকালের নাস্তা শেষে একটি পত্রিকা পড়ছেন। সেখানে একটি প্রতিবেদন বলছে–"বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে আনারস এবং দুধ একই সঙ্গে খাওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।" এখন প্রশ্ন হলো, "বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন" বলতে কি বোঝায়? এটা কি এমন যে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে আনারস এবং দুধ একসাথে খাওয়ার পর কারো কোনো ক্ষতি হয়নি?

প্রকৃতপক্ষে, এমন কিছুই হয়নি। বিজ্ঞানীরা কেবল তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের উপর এই পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং দেখেছেন যে তাদের মধ্যে এই খাদ্য সংমিশ্রণের কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। এখান থেকেই তারা অনুমান করেছেন যে, আনারস এবং দুধ একসঙ্গে খাওয়া নিরাপদ। তবে এই অনুমান যে চূড়ান্ত সত্য, তা নয়। কারণ, কিছুদিন পর যদি অন্য কোনো স্থানে নতুন পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় যে আনারস ও দুধ একসঙ্গে খাওয়ার পর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাহলে 'আনারস এবং দুধ একসঙ্গে খাওয়া নিরাপদ'–এই তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হবে। এখানেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো ইন্ডাক্টিভ যুক্তির উপর নির্ভরশীল, যেখানে পর্যবেক্ষণের বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের সাথে সাথে সিদ্ধান্তও পরিবর্তনশীল হতে পারে।

প্রবলেম অব ইন্ডাকশন

একটি দৃশ্যপট কল্পনা করুন। একদল বিজ্ঞানী এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলেন। ভ্রমণের সময় তারা লক্ষ্য করলেন, সেখানকার প্রতিটি রাজহাঁসের রং সাদা। এরপর তারা ইউরোপ মহাদেশে পাড়ি জমালেন এবং সেখানে গিয়েও একই ফল পেলেন, সব রাজহাঁস সাদা। অবশেষে, তারা অ্যামেরিকা মহাদেশে ভ্রমণ করলেন এবং সেখানেও প্রত্যেকটি রাজহাঁস সাদা দেখতে পেলেন। এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পৃথিবীর সকল রাজহাঁস সাদা। এই উদাহরণটি যদি আমরা প্রেমিস আকারে উপস্থাপন করি, তাহলে সেটি নিম্নরূপ হবে;

- P: এশিয়ার সকল রাজহাঁসের রং সাদা।
- P: ইউরোপের সকল রাজহাঁসের রং সাদা।
- P: অ্যামেরিকার সকল রাজহাঁসের রং সাদা।
- C: সুতরাং, পৃথিবীর সকল রাজহাঁসের রং সাদা।

বিজ্ঞানীরা এখানে কিছু নির্দিষ্ট দেশের রাজহাঁস পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখতে পেয়েছেন, রাজহাঁসগুলোর রং সাদা। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তারা একটি সার্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর সকল রাজহাঁস সাদা। তবে, এই সিদ্ধান্তটি নির্ভুল নয়। যেমনটি অবরোহ বা ডিডাক্টিভ যুক্তির ক্ষেত্রে হয়। কেননা, যদি ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা সাদা ছাড়া অন্য কোনো রঙের রাজহাঁস খুঁজে পান, তবে তাদের এই সিদ্ধান্ত মুহূর্তেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ পরিবর্তন হলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে। এটাই হলো ইন্ডাক্টিভ পদ্ধতির স্বরূপ।

রাজহাসের এই উদাহারণটি কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তব। ১৬৬৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত ধারণা ছিল যে পৃথিবীর সমস্ত রাজহাঁস সাদা। কারণ, সেই সময় পর্যন্ত আমাদের পর্যবেক্ষণে পাওয়া সব রাজহাঁসের রং সাদা ছিল। কিন্তু ১৬৯৭ সালে উইলিয়াম দ্য ব্লামিং অস্ট্রেলিয়ায় কালো রাজহাঁস আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার 'All swans are white and have always been white' তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পর্যবেক্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর যা ভুল হতে পারে বা যা কোনো সময় ভুল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়, সেটি কখনোই চূড়ান্ত বা পরম সত্য হতে পারে না। চূড়ান্ত সত্য এমন একটি বিষয়, যা সর্বদা এবং সর্বত্র সত্য থাকে। সত্যের প্রকৃতির মধ্যে কখনো মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তত্ত্ব মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্টের জন্য আমরা প্রেমার বাজার থেকে পাউরুটি কেনা এবং মিছবাউল হকের মাঠে খেলতে যাওয়ার উদাহরণগুলোও স্মরণ করতে পারি। এই উদাহরণগুলোতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্ট বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এর মাধ্যমে ধরে নেওয়া হয় যে, যে-সব দৃষ্টান্ত এখনো পরীক্ষা করা হয়নি, সেগুলোর আচরণও একই রকম হবে। এ ধরনের অনুমানকে দার্শনিক ডেভিড হিউম প্রকৃতির অভিন্নতা বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতির অভিন্নতা বলতে বোঝানো হয়, যে বিষয়গুলো আমরা পরীক্ষা করে দেখিনি, সেগুলোও পরীক্ষিত বিষয়গুলোর মতোই আচরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ; ১০টি পাউরুটির মধ্যে ৮টি ভালো, সেহেতু বাকি দুটিও ভালো হবে। বিগত দিনগুলোতে মিছবাউল হকের বন্ধুরা মাঠে খেলেছে, তাই আজও তারা খেলবে। এশিয়া, ইউরোপ, এবং আমেরিকার সব রাজহাঁস সাদা, সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত রাজহাঁস সাদা। এক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রকৃতি যেন অভিন্ন আচরণ করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে প্রকৃতির অভিন্নতা অনুমান সত্য? আমরা কি কোনোভাবে এটি প্রমাণ করতে পারি? ডেভিড হিউম এই প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সরলভাবে বলেন, "না, আমরা পারি না।"

যৌক্তিকভাবে এটা সম্ভব যে, ১০টি পাউরুটির মধ্যে ৮টি ভালো হলেও বাকি দুটোর একটি বা উভয়ই খারাপ হতে পারে, যদিও সবগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ একই। তেমনই, মেসবাহ উল হক প্রতিদিন মাঠে গিয়ে তার বন্ধুদের খেলতে

দেখতে পেলেও এমন দিন আসতেই পারে, যেদিন তার বন্ধুরা মাঠে আসবে না। এই উদাহরণগুলো আমাদের শেখায় যে প্রকৃতি সবসময় অভিন্ন আচরণ করে না, বরং, ভিন্ন আচরণও করে। সুতরাং, প্রকৃতির অভিন্নতার উপর ভিত্তি করে করা ইন্ডাক্টিভ অনুমান চূড়ান্ত নয়, বরং সম্ভাবনামূলক।

এ কথার প্রেক্ষিতে আরও কিছু বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, নিউটনের তত্ত্ব বিজ্ঞান মহলে পুরো দুইশত বছর টিকে ছিল। এই দুইশত বছর বিজ্ঞান পূজারি থেকে সাধারণ মানুষও এই তত্ত্বকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন নিউটনের তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়।

একটা সময় বিজ্ঞানীরা মনে করতো পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং চন্দ্র, সূর্য, ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক তার চারদিকে ঘুরছে। এই মতবাদ ভূকেন্দ্রিক মতবাদ (Geo-centric theory) হিসেবে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি মূলত এই মতবাদের প্রবর্তক। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস দেখালেন যে, টলেমির এই সিদ্ধান্ত ভুল। তিনি প্রচার করলেন, সূর্য স্থির, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তার এই মতবাদকে সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ (Helio-centric theory) বলে। বর্তমানে বিজ্ঞান আবার আমাদের জানায় সবকিছুই নিজ নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান।

মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এই বিষয়ে একটা সময় বিজ্ঞানীরা মনে করতো মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই। যাকে বলে Steady State Theory (অটল মহাবিশ্ব মডেল)। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানতে পারি মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল কোনো কিছু কখনোই চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

ভৌত বিষয়ের গভীরতা ও প্রকৃতি অনুধাবনে বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ জ্ঞান হয়তো অন্য কোনো শাখা দিতে সক্ষম নয়। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রয়েছে কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা। এর অন্যতম হলো; এটি পর্যবেক্ষণের গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং তার পরিসীমা অতিক্রম করতে অক্ষম। বিজ্ঞান পরম বা অবধারিত সত্য জানাতে অপারগ, নৈতিকতা কিংবা ভালো-মন্দের মানদণ্ড নির্ধারণেও এটি নীরব। এছাড়া, 'কেন ঘটে?'–এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। অধিবিদ্যার গভীর রহস্য কিংবা স্বতঃসিদ্ধ ধারণার আলোচনাতেও বিজ্ঞান অক্ষম।

পর্যবেক্ষণের মাঝে সীমাবদ্ধ

পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা বুঝতে আমরা একটি বাস্তব উদাহরণ বিবেচনা করতে পারি। ধরুন, একজন বিজ্ঞানী ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে কোন ধরনের খেলাধুলার প্রতি বেশি আগ্রহ রয়েছে, তা নির্ধারণ করতে চান। এই লক্ষ্যে তিনি একটি ফাঁকা ঘর বা খেলার মাঠে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী–যেমন ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখলেন। এরপর, তিনি একদল ৫ বছর বয়সী শিশুকে সেই ঘর বা মাঠে প্রবেশ করতে দিলেন এবং তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। এখানে বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে শিশুরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে না, তাদের পছন্দ-অপছন্দ বা আচরণ এই গবেষণার বাইরে থেকে যাবে।

বিজ্ঞান দার্শনিক এলিয়েট সোবার তার এম্পিরিজম প্রবন্ধে লিখেন, "যে-কোনো মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা তাদের নাগালের মাঝে থাকা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সীমাবদ্ধ।.........এই সীমাবদ্ধতা হলো বিজ্ঞানকে এমন সমস্যাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করা, যেগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।[১৫১]

বিজ্ঞান কী পরম সত্য বা নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়?

বিজ্ঞান নিয়ে অনেক বড় বড় দার্শনিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ভুল ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে নাস্তিক বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের মাঝে। তারা বিজ্ঞানের থিওরিকে বা বিজ্ঞান কোনো কিছু দাবি করলে সেটাকে পরম সত্য হিসেবে মেনে নেয়। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "যা যা জ্ঞান অর্জন সম্ভব তা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারবে না তা কখনোই আমরা জানতে পারবো না।"[১৫২]

বিজ্ঞান কখনোই আমাদের চূড়ান্ত বা পরম সত্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আরও মজার ব্যাপার হলো, এই দাবিটিও–'বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম'–বিজ্ঞান নিজেই তা প্রমাণ করতে অক্ষম। কারণ এই বক্তব্য নিজেই একটি অধিবিদ্যাগত (মেটাফিজিক্যাল) বিবৃতি, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং, বিজ্ঞান পরম সত্য জানার মাধ্যম বা বিজ্ঞান নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়, এটা এহেন আত্মঘাতী কথা যে, 'বাংলা বাক্যে তিন শব্দের চেয়ে বড় কোনো বাক্য নেই'। এই বাক্যেই তিন শব্দের চেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে।

অনেক দার্শনিক মনে করেন যে দার্শনিক অনুসন্ধানের নিজস্ব পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন যেটা বিজ্ঞান পারে না। দার্শনিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তি, চিন্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবহার, এবং ধারণাগত বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক থিওরি বেশ কিছু কারণে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেনা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 1. The problem of induction 2. Scatter graph problem. Problem of induction নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা হয়েছে।

Scatter graph problem

Scatter graph problem হলো একই পর্যবেক্ষণ বা তথ্য থেকে একাধিক ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সামনে ১০০টি বিন্দু রয়েছে, এগুলো হলো তথ্য। আমাদেরকে যদি এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলা হয় তাহলে দেখা যাবে, কেউ সেই বিন্দুগুলো সংযুক্ত করে একটি সরলরেখা তৈরি করবে। কেউ সেগুলো দিয়ে একটি বক্ররেখা আঁকবে। আবার কেউ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বর্গক্ষেত্র তৈরি করবে। এটি বোঝায়, একই পর্যবেক্ষণ বা তথ্য থেকে একাধিক তত্ত্ব দাঁড় করানো সম্ভব। এই কারণে তত্ত্বগুলো ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় এবং নতুন তথ্য বা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পুরোনো তত্ত্বগুলো সংশোধিত বা প্রতিস্থাপিত হয়।

---

[১৫১] The Routledge Companion to Philosophy of Science; Page: 137-38

[১৫২] Samir Okasha (2016), Philosophy of science: A very short introduction (Oxford university press, 2nd edition) Page: 115

বিশেষজ্ঞদের মত

প্রখ্যাত পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন নিউ ইয়র্ক রিভিউতে এক আর্টিকেলে লিখেন, "বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের একটা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বাচ্চাকাচ্চাদের স্কুলে শেখানো হয় যে, বিজ্ঞান হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের সমাহার! আসলে বিজ্ঞান কোন 'কালেকশন অব ট্রুথ' নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে ক্রমাগত রহস্য উন্মোচন।"[১৫৩]

Stanford Encyclopedia of Philosophy তে বলা হয়েছে, "বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে একটু লক্ষ করলে একসময়ে প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য এমন অনেক তত্ত্ব চোখে পড়বে, যেগুলো আজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে পড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেগুলো আর গ্রহণযোগ্য নয়।"[১৫৪]

ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, কসমোলজিস্ট এবং লেখক, স্টিফেন হকিং তার লিখিত, 'A brief history of time' বইতে বলেন, "যেকোনো ভৌত তত্ত্ব সর্বদা অস্থায়ী হয়, এই অর্থে যে এটি শুধু মাত্র একটি অনুমান; আপনি এটি প্রমাণ করতে পারবেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যতবারই কিছু তত্ত্বের সাথে একমত হোক না কেন, আপনি কখনই নিশ্চিত হতে পারবেন না যে পরের বার ফলাফলটি তত্ত্বের বিরোধিতা করবে না। অন্যদিকে, আপনি তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সাথে একমত নয় এমন একটি একক পর্যবেক্ষণ খুঁজে বের করে একটি তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন"।[১৫৫]

মনোবিজ্ঞানী কিথ স্ট্যানোভিচ বলেন, "বিজ্ঞান ইতঃপূর্বে যা সত্য বলে প্রমাণ করেছিল, তাকেই প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রমাণ করে চলেছে।"[১৫৬]

বিজ্ঞান দার্শনিক কার্ল পোপার বলেন, "বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সৃষ্টি হয় সত্যের সন্ধান করতে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি কোন নিশ্চয়তার সন্ধান নয়... মানুষের সকল জ্ঞান ভুলপ্রবণ, তাই অনিশ্চিত।"[১৫৭]

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ড.সামির ওসাকা তার লিখিত, 'Philosophy of Science: a very short introduction ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ঐতিহাসিকভাবে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা তাদের দিনে অভিজ্ঞতাগতভাবে সফল হয়েছিল কিন্তু পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল।"[১৫৮]

কানাডার দার্শনিক উইলিয়াম নিউটন স্মিথ, তার লিখিত 'The Rationality Of Science' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যদি আমরা এই সত্যের উপর চিন্তা করি যে অতীতের সমস্ত ভৌত তত্ত্বগুলো তাদের উত্তম দিনে ছিল এবং অবশেষে মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একটি হতাশাজনক প্রস্তাবের পক্ষে প্রস্তাবনামূলক সমর্থন রয়েছে যে, যে কোন তত্ত্ব ২০০ বছরের মধ্যে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।"[১৫৯]

---

[১৫৩] Quote by Freeman John Dyson: "The public has a distorted view of science beca..."
[১৫৪] Realism and Theory Change in Science (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
[১৫৫] Stephen Hawking a Brief History of Time; Page:Chapter:1
[১৫৬] How to think straight about Psychology. Boston: Pearson Education. Page-106-107
[১৫৭] মুজাজ্জাজ নাঈম; মুক্তচিন্তা ও ইসলাম; পৃঃ ৫৬
[১৫৮] samir okasha; Philosophy of Science: A Very Short Introduction; Page:60
[১৫৯] W H Newton Smith; The Rationality Of Science; Page: 14

মার্কিন দার্শনিক Larry Laudan তার লিখিত, ' Philosophy of Science: Contemporary Readings ' গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক যে-সব তত্ত্ব কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে ভুল প্রমাণিত হয়েছে এমন কিছু তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ;

- The crystalline spheres of ancient and medieval astronomy. (প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদ্যার স্ফটিক গোলক)
- The humoral theory of medicine. (ঔষধের হাস্যকর তত্ত্ব)
- The effluvial theory of static electricity. (স্ট্যাটিক বিদ্যুতের প্রবাহ তত্ত্ব)
- 'Catastrophist' geology, with its commitment to a universal (Noachian) deluge. ('বিপর্যয়বাদী' ভূতত্ত্ব, একটি সর্বজনীন (নোয়াচিয়ান) প্রতি প্রতিশ্রুতি সহ প্রলয়)
- The phlogiston theory of chemistry. (রসায়নের ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব)
- The caloric theory of heat. (তাপের ক্যালরি তত্ত্ব)
- The vibratory theory of heat. (তাপের কম্পনশীল তত্ত্ব)
- The vital force theories of physiology. (ফিজিওলজির অত্যাবশ্যক শক্তি তত্ত্ব)
- The electromagnetic aether. (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইথার)
- The optical aether. (অপটিক্যাল ইথার)
- The theory of circular inertia. (বৃত্তাকার জড়তা তত্ত্ব)
- Theories of spontaneous generation. (স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মের তত্ত্ব)[১৬০]

বিজ্ঞান পরম সত্য না জানানোর আরো একটি অন্যতম কারণ হলো, প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের পেছনে একজন পর্যবেক্ষক (মানুষ) থাকে। আবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে কোনো-না-কোনো মানুষ। মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, স্মৃতি-বিস্মৃতির বিভ্রাট ও স্বেচ্ছাচারিতা, সামাজিক চাপ বা কোনো গোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। তাই এগুলো সবকিছুই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল ও ইচ্ছাকৃত ভুল দুটোই থাকতে পারে। এছাড়াও বিজ্ঞানীদের বড় একটি অংশ বস্তুবাদের হাতে জিম্মি।[১৬১]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনোই আমাদের চূড়ান্ত বা সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। তত্ত্বগুলো সবসময় পরিবর্তনশীল এবং নতুন তথ্যের আলোকে পুনঃমূল্যায়ন ও সংশোধনযোগ্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এর শক্তি এবং সৌন্দর্য। আজ যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য, কাল তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। বিজ্ঞান তাই এক নিরন্তর অনুসন্ধানের মাধ্যম।

---

[১৬০] Larry Laudan; Philosophy of Science: Contemporary Readings; Page: 224
[১৬১] Lars-Göran Johansson; philosophy of Science for Scientists; Page: 70

চূড়ান্ত সত্য বা পরম সত্য বলে কিছু নেই?

'বিজ্ঞান কখনো চূড়ান্ত সত্য বা পরম সত্য জানাতে পারে না'–এই দাবি করার পর কিছু নাস্তিক প্রায়শই পালটা যুক্তি দেন, "চূড়ান্ত সত্য বলতে আদৌ কিছু নেই।" কিন্তু যদি কেউ সত্যিই মনে করে যে; চূড়ান্ত সত্য বলতে কিছু নেই, এবং যদি এই দাবিই সত্য হয়, তাহলে সেটি নিজেই চূড়ান্ত সত্যে পরিণত হয়। সুতরাং, চূড়ান্ত সত্য নেই এমন দাবিটি আত্মঘাতী এবং সেলফ-ডিফিটিং। এটি এমনই এক কন্ট্রাডিকটরি বক্তব্য, যেমন কেউ বলে, 'বাংলা বাক্যে তিন শব্দের চেয়ে বড় কোনো বাক্য নেই,' অথচ ওই বাক্যেই তিন শব্দের বেশি শব্দ রয়েছে।

মনে করুন, আতিক নামের এক ব্যক্তি দাবি করলো যে, "এই দুনিয়াতে চূড়ান্ত সত্য বলতে আসলেই কিছু নেই"।

এই কথা শুনে তার বন্ধু মিছবাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা তুমি যে দাবিটি করেছে (এই দুনিয়াতে চূড়ান্ত সত্য বলতে আসলে কিছু নেই) তা কি চূড়ান্তভাবে সত্য নাকি মিথ্যা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে?"

আসিফ বললো, "হুম, আমার দাবিটি চূড়ান্তভাবে সত্য"।

তখন মিছবাহ বললো, "যদি এটা চূড়ান্তভাবে সত্য হয় তাহলে চূড়ান্ত সত্যের অস্তিত্ব যে আছে তা এই কথা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল। আর যদি তুমি বলো তোমার দাবিটি (চূড়ান্ত সত্য নেই) মিথ্যা হয় তাহলেও চূড়ান্ত সত্য আছে এটাই সত্য!"

ভালো-মন্দ বা নৈতিকতা নির্ধারণ করতে পারে না

বিজ্ঞান নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। এখন এর মানে এই নয় যে বিজ্ঞানীদের নৈতিকতা নেই। এর অর্থ হল বিজ্ঞান নৈতিকতার ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। 'স্রষ্টা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা' অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি।

'কেন ঘটে'? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না

কুয়াশায় আচ্ছাদিত কোনো এক শীতের সকালে, হঠাৎই আপনার দরজায় কড়া নাড়ে এক প্রতিবেশী। দরজা খুলতেই তিনি আপনাকে কিছু ভাপা পিঠা দিয়ে যান। আপনার মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি হঠাৎ কেন আপনাকে পিঠাগুলো দিয়ে গেলেন? আপনি পিঠাগুলো নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারলেন, কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে পিঠাগুলো রান্না হয়েছে, পিঠাগুলোর উপাদান কী কী, কিংবা সেগুলোর ভেতরে কী ধরনের শস্যের মিশ্রণ রয়েছে। আপনি বুঝতে পারলেন পিঠাগুলোর তৈরির প্রক্রিয়া এবং উপাদানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এত কিছু জানার পরও, মূল প্রশ্ন–'কেন আপনার প্রতিবেশী পিঠাগুলো নিয়ে এসেছেন?'–এর উত্তর আপনি পেলেন না। এই প্রশ্নের উত্তর জানার একমাত্র উপায় হলো সরাসরি আপনার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করা। তার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোনো সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা 'কি' এবং 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

অধিবিদ্যাগত বিষয়ের উত্তর দিতে পারে না

বিজ্ঞান কিছু আধিভৌতিক প্রশ্নের সমাধান করতে পারে যেগুলো এমন যা অভিজ্ঞতামূলকভাবে সমাধান করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বিজ্ঞান মহাবিশ্বের সূচনাকে তার ক্ষেত্রের মাধ্যমে সম্বোধন করতে সক্ষম হয়েছে যা কসমোলজি নামে পরিচিত। তবুও, কিছু বৈধ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে রয়েছে: ডিডাক্টিভ যুক্তিতে উপসংহার কেন পূর্ববর্তী প্রেমিস থেকে অনুসরণ করা আবশ্যক? স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে? আত্মার অস্তিত্ব আছে? কেন কিছুই না থেকে কিছু আছে? (Why is there something rather than nothing?), নৈতিকতা বলতে কিছু আছে? বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলির সমাধান করতে পারে না কারণ বিজ্ঞান এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে যায় যা শারীরিক বা পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের বাইরে।

অনিবার্য সত্যকে প্রমাণ করতে পারেনা

নিচের যুক্তিটি লক্ষ করুন,

- P: মানুষ হয় মরণশীল।
- P: রহিম হয় একজন মানুষ।
- C: সুতরাং রহিম হয় মরণশীল।

এই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে। তাই এটি একটি বৈধ যুক্তি। এখানে আশ্রয় বাক্যের সাথে যেহেতু সিদ্ধান্তের একটা অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে তাই আশ্রয়বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য। আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের এই সম্পর্ক অভিজ্ঞতামূলক কিছুর উপর ভিত্তি করে আসেনি। বরং, এটা আমাদের চিন্তার জগতের উপর ভিত্তি করে এসেছে। সিদ্ধান্ত কেন আশ্রয় বাক্য থেকে আসবে বা যৌক্তিকভাবে কেন এটাই আসতে হবে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বিজ্ঞান আশ্রয় বাক্য আর সিদ্ধান্তের মধ্যে সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা দিতে পারবে না। যুক্তি বস্তু জগতের কোনো বিষয় নয়। বরং, বস্তুজগতের উর্ধ্বে। এছাড়াও, ২+২= ৪ এগুলো অনিবার্য সত্য। এগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কিছু নয়। আমরা যদি বলি, ২টা আপেল + ২টা আপেল সমান কত? তাহলে ফলাফল আসবে ৪টা আপেল। আবার যদি বলি ২টা উল্লাবুল্লা + ২টা উল্লাবুল্লা সমান কত? তাহলেও ফলাফল আসবে ২টা উল্লাবুল্লা। অথচ উল্লাবুল্লা বলতে আসলে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। উল্লাবুল্লা জিনিসটা কি সেটা না বুঝলেও আপনি এদের একটার সাথে আরেকটা যোগ করলে যোগফল দুই-ই হবে।

বিজ্ঞানের বিশ্বাস

বিজ্ঞান পূজারি ও নাস্তিকরা প্রায়ই বলে থাকে যে, "বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই," এবং তারা যুক্তি দেয় যে ধর্মের ভিত্তি যেহেতু বিশ্বাস, তাই বিজ্ঞান ধর্মের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, বিজ্ঞানের ভিত্তি নিজেও মূলত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই দেখেছি যে বিজ্ঞান যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং ইন্ডাক্টিভ অনুমানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। তবে এই সিদ্ধান্তগুলোর সঠিকতা নির্ভর করে একাধিক পূর্বানুমানের (assumptions) উপর, যেগুলোকে বিজ্ঞানীরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করে নেন।

নাস্তিক বিজ্ঞান দার্শনিক গ্লেন বরচার্ড 'The Ten Assumptions of Science Towards a New Scinetific Worldview' গ্রন্থে ১০টি বৈজ্ঞানিক অনুমান নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলো বিজ্ঞান চোখ বন্ধ করে মেনে নেয় প্রমাণ ছাড়াই। অনুমানগুলো হলো, MATERIALISM, CAUSALITY, UNCERTAINTY, INSEPARABILITY, CONSERVATION, COMPLEMENTARITY, IRREVERSIBILITY, INFINITY, RELATIVISM, INTERCONNECTION.[162]

আইনস্টাইন এর মতে, "মহাবিশ্বের যে আসলেই অস্তিত্ব আছে, এমন বিশ্বাস সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি।"[১৬৩]

বিজ্ঞান লেখিকা মারগারেট ভার্থেইম এর মতে, "আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করি এবং বিজ্ঞান নিজেও কিন্তু একগাদা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে।"[১৬৪]

স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক, ডঃ মাইকেল শেরমার (নাস্তিক) তার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে 'What I Believe But Cannot Prove' শিরোনামের লিখাতে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি কিন্তু প্রমাণ করতে পারি না যে বাস্তবতা বিদ্যমান এবং বিজ্ঞান এটি বোঝার সর্বোত্তম পদ্ধতি; কোন ঈশ্বও নেই; মহাবিশ্ব নির্ধারিত কিন্তু আমরা স্বাধীন; নৈতিকতা মানুষ এবং মানব সম্প্রদায়ের একটি অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিকশিত হয়েছে; এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্ব বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যাযোগ্য।"[১৬৫]

দার্শনিক, আর.জি. কলিংউড এর মতে, "বিজ্ঞান অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এটা বলার সমতুল্য যে বিজ্ঞান 'তথ্য' এর পরিবর্তে 'বিশ্বাসের' উপর ভিত্তি করে।[১৬৬]

ব্রিটিশ জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক জিম ব্যাগট এর মতে, "অধিবিদ্যা ছাড়া একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরি করা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়। প্রথমে কিছু জিনিস অনুমান না করে আমরা আসলে প্রমাণ করতে পারি না। যেমন একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার অস্তিত্ব এবং আমরা বিশ্বাস করি অদৃশ্য সত্তা এতে বিদ্যমান।"[১৬৭]

ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী, এবং প্যারাসাইকোলজি গবেষক, এবং লেখক রুপার্ট শেলড্রেক, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এমন ১০টি মূল বিশ্বাসের তালিকা দিয়েছে। তালিকাটি নিম্নরূপ,

- সবকিছুই যান্ত্রিক। এমনকি মানুষও মেশিন।
- সমস্ত বস্তু অচেতন। এর কোনো অভ্যন্তরীণ জীবন বা বিষয়গততা বা দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এমনকি মানুষের চেতনাও মস্তিষ্কের বস্তুগত কার্যকলাপ দ্বারা উৎপাদিত একটি বিভ্রম।
- পদার্থ এবং শক্তির মোট পরিমাণ সবসময় একই থাকে (বিগ ব্যাং বাদে, তখন মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ এবং শক্তি আকস্মিক উদ্ভব হয়েছিল)।
- প্রকৃতির নিয়ম স্থির। তারা শুরুতে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে এবং

---

[১৬২] Glenn Borchardt; The ten assumptions of science: Toward a new scientific worldview.
[১৬৩] Glenn Borchardt; The ten assumptions of science: Toward a new scientific worldview; Chapter;1
[১৬৪] ডা.রাফান আহমেদ; অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়; পৃঃ ৩৪
[১৬৫] What I Believe But Cannot Prove » Michael Shermer
[১৬৬] Glenn Borchardt; The ten assumptions of science: Toward a new scientific worldview; Page: 119
[১৬৭] Post-empirical science is an oxymoron, and it is dangerous | Aeon Essays

বলতে যাচ্ছি না - এইগুলি এমন প্রশ্ন যা বিজ্ঞানীরা সমাধান করতে পারেন না। আমার নিজের বিশ্বাস হল যে একবার আপনার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম থাকলে মহাবিশ্ব তার নিজের মতো চলতে থাকে। এমনকি এমনও হতে পারে যে, মহাবিশ্বকে প্রথম থেকে শুরু করার জন্য আপনার যা দরকার তা হল পদার্থবিদ্যার নিয়ম "বিগ ব্যাং"। RT: তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি কী? অ্যালেক্স ফিলিপ্পেনকো: এটা একটা বড় প্রশ্ন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি কী? আমি জানি না এটি এমন একটি প্রশ্ন যা বিজ্ঞান উত্তর দিতে পারে না"।

জীববিজ্ঞানী স্কট টড বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল Nature-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেন, "এমনকি যদি সমস্ত তথ্য উপাত্ত একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনারকে (স্রষ্টা) নির্দেশ করে, তবে এই ধরনের অনুমান বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয় কারণ এটি প্রাকৃতিক (বিজ্ঞানের বিষয়) নয়। অবশ্যই, বিজ্ঞানী, একজন ব্যক্তি হিসাবে, এমন একটি বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করতে স্বাধীন যা প্রকৃতিবাদকে অতিক্রম করে।"[১৭৪]

সুতরাং, স্রষ্টার অস্তিত্বের আলোচনা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়, বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে, এটি অধিবিদ্যার বিষয়। বিজ্ঞান, যদি স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পায়ও, তবুও তা প্রত্যাখ্যান করবে, কারণ এটি তার পরীক্ষণযোগ্য ক্ষেত্রের বাইরে। তাই, বিজ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব খোঁজা কেবল সময়ের অপচয়। বিজ্ঞানের কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ। এটি শুধুমাত্র বাহ্যিক জগতের পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়। বিজ্ঞান কখনোই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ বা বাতিল করতে পারে না।

---

[১৭৪] A view from Kansas on that evolution debate | Nature

ইনসাইট জোন একটি অলাভজনক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে সারা বিশ্বের মুসলিম লেখকরা ইসলাম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখেন। এই প্ল্যাটফর্মটি মূলত ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন এবং অমুসলিমদের উত্থাপিত অভিযোগের যৌক্তিক ও প্রমাণভিত্তিক জবাব প্রদান করে। পাশাপাশি, ইনসাইট জোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে।

ইনসাইট জোন পাবলিকেশন্স, ইনসাইট জোনের প্রকাশনা শাখা, যা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকে আরো বিস্তৃত ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে।

ইনসাইট জোন

পা ব লি কে শ ন স

CamScanner

বইটি কেন পড়বেন?

মানব মনের কিছু এক্সিস্টেনশিয়াল কুয়েশ্চন রয়েছে। যেমন, আমি কে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই দুনিয়া কিভাবে অস্তিত্বে আসলো? স্রষ্টা কেমন? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা কখনো কখনো সবুজ উপত্যকায় ঝরে পড়া ঘন কালো মেঘের মতো এক সর্বগ্রাসী অন্ধকার দুর্যোগে নিমজ্জিত হই।

সেই অন্ধকার দুর্যোগের ঘনঘটায় আমাদের মনোজগতে সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের মেঘ জমায়। বিশ্বাসের মাটিতে শেকড় গাড়ার বদলে আমাদের অন্তরে জুড়ে স্থান করে নেয় ভ্রান্ত-বিশ্বাস! তখন ধর্ম আর বিজ্ঞানকে ভুল পথে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, নিজেদের সামনে তৈরি করি এক ধোঁয়াশার আবরণ। সেই ভ্রান্তির আবরণকে আমাদের নিকট আলোকিত মনে হয়।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের এই অন্ধকারের গলিতে আলোর মশাল হাতে এগিয়ে এসেছেন সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত। তার রচিত 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' যেন ঘন কালো মেঘের বিপরীতে এক উজ্জ্বল প্রভাতের সূচনা। তিনি বইটির প্রতিটি পাতায় চেষ্টা করেছেন আমাদের সহজাত অবস্থানের বিপরীত ঘন কালো মেঘের জঞ্জাল সরিয়ে সত্যের আলো পৌঁছে দিতে।

বইটিতে মানব অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজা হয়েছে। স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা, প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয়, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের দর্শনের গভীরতম বিশ্লেষণ এই বইয়ের মলাটবদ্ধ পাতাগুলোকে করেছে চমকপ্রদ ও বোধোদয়কর। তাই বইটিকে বলা যায় অন্ধকার জগতে এক দীপ্ত আলোকবর্তিকা। যারা সত্যের সন্ধানী, তাদের জন্য 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' দ্বিধা আর সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে সত্যের উন্মোচন করবে—এমনই আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

www.publications.insightzonebd.com
Email: pub@insightzonebd.com